
ঋষির কথা
সুবোধকুমার চক্রবর্তী



শাশ্বত ভারত

ঋষির কথা

* *

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড

SASWATA BHARAT
RISHIR KATHA
A Story of the Cultural Heritage of India.
By Subodh Kumar Chakravarty
Price Rs. 6.50 (Rupees Six & Fifty Paise) only.

প্রকাশক :
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ়, ১৩৭১

মূল্য : টা. ৬·৫০ (সাড়ে ছয় টাকা) মাত্র

প্রচ্ছদপট :
শ্রীসমর দে

মুদ্রাকর :
শ্রীরণজিৎকুমার দত্ত
নবশক্তি প্রেস
১২৩, আচার্য জগদীশ বোস রোড
কলিকাতা-১৪

উৎসর্গ

শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী
শ্রদ্ধাস্পদেষু

A BHARAT
R KATHA
the Cultural Herita
Kumar C

শাশ্বত ভারত



ঋষির কথা

अहमेव स्वयम् इदं वदामि
जुष्टं देवेभिर् उत मानुषेभिः ।
यं कामये तं तम् उग्रं कृणोमि
तं ब्रह्माणं तम् ऋषिं तं सुमेधाम् ॥   ऋ० १०।१२५।५
अ० ४।३०।४

I, verily, myself say this
Which is welcome to the Shining Ones and to men ;
Him whom I love I make mighty :
I make him a Brahman (wise man),
a Rishi (seer), a man of talent.

(*R, X. 125.5 ; A*)

এই লেখকের লেখা

শাশ্বত ভারত ঃ দেবতার কথা
রূপম্ ?
একটি আশ্বাস
মণিপদ্ম
সেই উজ্জ্বল মুহূর্ত
অয়ি অবন্ধনে
জনম জনম
তুঙ্গভদ্রা
কী মায়া
আয় চাঁদ
আরও আলো
কল্কিরুবাচ
মেঘ

রম্যাণি বীক্ষ্য

১. দক্ষিণ ভারত পর্ব ২. দ্রাবিড় পর্ব ৩. কালিন্দী পর্ব ৪. রাজস্থান পর্ব
৫. সৌরাষ্ট্র পর্ব ৬. মহারাষ্ট্র পর্ব ৭. উৎকল পর্ব ৮. উত্তর ভারত পর্ব

এক

দেবতার কথার পর আমরা ঋষির কথা শুনেছিলাম।

গুরুজী বলতেন : দেবতার দেশ এই ভারতবর্ষ। কিন্তু আজ এই দেশের দিকে তাকিয়ে বেদনায় বুক ভরে ওঠে। দুঃখ দুর্দশার জন্য বেদনা নয়। যুদ্ধ করে দুঃখকে জয় করা যায়। আমার বেদনা হয় নিজেদের বিস্মৃতির কথা ভেবে। আমাদের ঐতিহ্য তো এক বছরের নয়, এক হাজার বছরেরও নয়। এ দেশ জেগেছিল পৃথিবীর জন্মের দিনে। অন্য দেশের মানুষ যখন হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটছে, এ দেশ তখন সভ্যতার শিখরে উঠেছে। এই সত্য কথা আমরা সম্পূর্ণ ভুলে গেছি। কেউ মনে করিয়ে দিলেও শুনতে চাই নে। বিদেশকে আজ আমরা অন্ধ ভাবে অনুকরণ করে আনন্দ পাই।

গুরুজীর আশ্রমে আমরা সবাই মিলে শুনতাম। তিনি বলতেন : দেবতার দেশ এই ভারতবর্ষ। দেবতা যত, দেবতার মতো মানুষও তত। ঋষি মনীষী সাধু মহাত্মা মহাপুরুষ, বীর কবি শিল্পী গায়ক, কত জ্ঞানী গুণী পুরুষ ও নারী। কত ঐশ্বর্যে ভরা এই দেশ। মন্দিরময় তীর্থ জনপদ শৈলাবাস, কত দুর্গ কত ইতিহাস, পুরাণ দর্শন সাহিত্য, সঙ্গীত নৃত্য, শিল্প ও বিজ্ঞান। ক জন এই দেবতার দেশকে জানে, জানে এই দেশের গৌরবের কথা!

মিথ্যা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া আমি শেষ করেছি। কিন্তু এ সব কথা সেখানে শিখি নি। গুরুজীর কথা শুনে আমার রোমাঞ্চ হত। আরও অনেকের হত। গুরুজী গভীর ভাবে বলতেন : আমি এই দেশকে দেবতার দেশ বলি। এ দেশের মানুষ এক দিন সত্যিই দেবতা ছিল। তেত্রিশ কোটি দেবতা।

তাঁদের কথা এক দিনে বলে শেষ হয় না, এক জনে বলেও শেষ করতে পারে না। এ সব কথার শেষ নেই।

হৃষীকেশের অপর পারে গঙ্গার তীরে একটি ছায়াচ্ছন্ন আশ্রম। ছোট ছোট কুটীর আছে অনেকগুলি। এমনি একটি কুটীরের সামনে উপাসনার মন্দিরে আমি গুরুজীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম।

সবাই তাঁকে গুরুজী বলে। বয়স তাঁর অনুমান করতে পারি নি। সৌম্য মুখে জরার চিহ্ন নেই, আছে ঋষিসুলভ প্রসন্নতা। শিষ্যরা তাঁর কাছে অধ্যয়ন করছিল।

আশ্রম সম্বন্ধে আমার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, মহর্ষি রমনের আশ্রম, দাদাজীর আশ্রম, গান্ধীজীর আশ্রম, অনেক আশ্রমের নাম শুনেছি। এ সে রকম আশ্রম নয়। এখানে এসে আমার টোলের কথা মনে পড়েছে। সেকালের সংস্কৃত পণ্ডিতরা টোল খুলতেন। শ্রুতি স্মৃতি ন্যায় শাস্ত্রের পণ্ডিতরা। কত দূর দূর দেশ থেকে ছাত্ররা পড়তে আসত। গরিব ছাত্র, পণ্ডিত মশাইও গরিব। অনেক অসচ্ছলতায় এই সব টোল চলত। কিন্তু সেদিন সেই শিষ্যদের দেখে টোলের ছাত্র বলে মনে হয় নি। বয়সে সবাই নবীন নন। অনেকেই লেখা পড়া সম্পূর্ণ করে এসেছিলেন। দু একজন প্রবীণও ছিলেন। তাঁরাও মনোযোগ দিয়ে গুরুজীর কথা শুনছিলেন।

আমি এই অঞ্চলে এসেছিলাম কেদার-বদরী দর্শনের জন্য। কিন্তু সে সৌভাগ্য এল না। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে গুরুজীকে দেখতে এসে তাঁর আশ্রমে আমি বাঁধা পড়ে গেলাম।

তাউজীর উপরে আশ্রমের পরিচালনার ভার। তাউজী জ্যাঠামশাইকে বলে। কিন্তু এখানে দেখলাম, সবাই তাঁকে তাউজী বলছেন। চোখে রূপোর চশমা এঁটে তিনি তাঁর বাঁধান খাতায় আমার নাম লিখে নিলেন। একখানা খাতা আর পেনসিল দিয়ে বললেন ঃ সকাল বেলায় তোমরা আশ্রমের প্রয়োজনীয়

কাজ করবে, আর দুপুরে লেখা পড়া। গুরুজীর কাছে আমরা পাঠ নেব সন্ধ্যা বেলায়।

একে একে আশ্রমবাসীদের সঙ্গে পরিচয় হল। আর পড়ার ফাঁকে ফাঁকে সেই পরিচয় অন্তরঙ্গও হতে লাগল।

গুরুজী ঠিকই বলেছিলেন যে দেবতার কথা এক দিনে বলে শেষ হয় না। এ কথা শেষ করতে কয়েক দিন সময় লেগেছিল। কিন্তু তিনি একা বলেই শেষ করেছিলেন। তার পরে বলেছিলেন যে সেখানে শেষ নয়, সেইখান থেকেই জানার শুরু। দেবতার সম্বন্ধে সে একেবারে গোড়ার কথা। তার পরে তপস্যায় জানতে হবে। পুরাকালের ঋষিদের মতো তপস্যা।

একটু থেমে বলেছিলেনঃ দেবতার সঙ্গে ঋষির আর প্রভেদ কতটুকু!

যস্য বাক্যঃ স ঋষিঃ,
যা তেনোচ্যতে সা দেবতা।

যাঁর কথা, তিনি ঋষি। যাঁর বিষয় কথা, তিনি দেবতা।

দেবতার পরেই ঋষির কথা।

দুই

গুরুজী বললেন : দেবতার পরে ঋষির কথা বলছি বলে ঋষিরা দেবতার পরে নন। তাঁরা সমসাময়িক, এবং দীর্ঘ জীবনের অধিকারী বলে তাঁদের বয়সের কোন হিসাব করা সম্ভব নয়। ব্রহ্মাকে আমরা সৃষ্টিকর্তা বলে স্বীকার করি, এবং সৃষ্টি কার্যে তাঁকে সহায়তার জন্য প্রথমেই তিনি দশ জন প্রজাপতির সৃষ্টি করেন।

তাউজীর দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন : আহ্নিক তত্ত্বের শ্লোকটি মনে পড়ছে তো ?

মরীচিমত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্।
প্রচেতসং বশিষ্ঠঞ্চ ভৃগুং নারদমেবচ ॥

মরীচি অত্রি অঙ্গিরা পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু প্রচেতা বশিষ্ঠ ভৃগু ও নারদ। এই প্রজাপতির সংখ্যা নিয়ে নানা মত আছে। মহাভারতে একুশ জন প্রজাপতি, পুরাণে এই একুশ জন ছাড়াও আরও নাম পাওয়া যায়।

তা যাক। সাধারণ ভাবে এই দশজন প্রজাপতিই সর্বজনস্বীকৃত। এঁরা ব্রহ্মার মানস পুত্র। এঁরাই সৃষ্টির কার্য শুরু করেছিলেন বলে ব্রহ্মা পিতামহ নামে খ্যাত।

একটু হেসে বললেন : কিন্তু দেবতাদের তিনি প্রপিতামহ। ইন্দ্র সূর্য বরুণ প্রভৃতি দেবতারা তাঁর পৌত্র কশ্যপের পুত্র। কশ্যপ তাঁর জ্যেষ্ঠ মানসপুত্র মরীচির পুত্র। এঁরা ঋষি।

এ কথা আমাদের জানা। কিন্তু এই মুহূর্তে এই জানা কথাটি নতুন বলে মনে হল। দেবতারা তাহলে ঋষির সন্তান !

গুরুজী বললেন : ব্রহ্মার মানস পুত্রদের সাতজন সপ্তর্ষি নামে

পরিচিত। তাঁদের নাম মরীচি অত্রি অঙ্গিরা পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু ও বশিষ্ঠ। তার মানে প্রচেতা ভৃগু ও নারদ সপ্তর্ষির অন্তর্গত নন।

কিন্তু প্রথম ঋষি মরীচির সম্বন্ধে আলোচনা করবার পূর্বে মনুর সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। মনু ব্রহ্মার পুত্র, মানুষের আদি পুরুষ, তিনি প্রজাপতি ও ধর্মশাস্ত্রবক্তা। এই প্রজাপতি শব্দটি বড় বিভ্রম ঘটিয়েছে। প্রজা মানে সন্তান। আদিকালে অনেকেই প্রজাপতি নামে পরিচিত হয়েছেন। বেদে অনেক দেবতাও প্রজাপতি নামে চিহ্নিত। তাঁদের মধ্যে হিরণ্যগর্ভ সোম ইন্দ্র ও সাবিত্রীও অন্যতম। মনুসংহিতায় ব্রহ্মাকেই প্রজাপতি রূপে দেখি। কেননা সৃষ্টির প্রেরণায় তিনিই সৃষ্টিকার্য শুরু করেন।

আমাদের শাস্ত্রে চতুর্দশ মনু, তাঁদের মধ্যে প্রথম স্বায়ম্ভুব মনু। তাঁর জন্মবৃত্তান্ত আমরা ভাগবতে পাই। ব্রহ্মা যখন দেখলেন যে তাঁর মানস পুত্র ঋষিরা সৃষ্টির বিস্তারে অক্ষম, তখন তাঁর দুর্ভাবনা হল। কেন এমন হচ্ছে, এই কথা তিনি গভীর অভিনিবেশে ভাবতে লাগলেন। সহসা তাঁর দেহ দ্বিধা বিভক্ত হল, এক অংশ পুরুষ অন্য অংশ নারী, মনু ও শতরূপা। মনু শতরূপাকে বিবাহ করলেন। তাঁদের দুই পুত্র ও তিন কন্যা হল। প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ, আকূতি দেবহূতি ও প্রসূতি। রুচির সঙ্গে আকূতির, কর্দমের সঙ্গে দেবহূতির ও দক্ষের সঙ্গে প্রসূতির বিবাহ হয়। ধ্রুব উত্তানপাদের পুত্র।

স্বায়ম্ভুব মনুর মতো চতুর্দশ মনুর জন্মবৃত্তান্ত আছে, স্ত্রীপুত্র কন্যার সুবিস্তৃত পরিচয় আছে। তেতাল্লিশ লক্ষ কুড়ি হাজার বৎসরে এক মন্বন্তর এক এক মনুর রাজত্বকাল। চোদ্দ মন্বন্তরে এক কল্প ব্রহ্মার এক দিন। বর্তমানে ছয় জন মনুর রাজত্বকাল সম্পূর্ণ হয়ে সপ্তম মনু বৈবস্বত মনুর অধিকার চলছে। এ সবই পৌরাণিক কাহিনী, বেদে এ সবের উল্লেখ নেই।

গুরুজী এইবারে খানিকক্ষণ থামলেন। বোধ হয় তাঁর পুরনো

প্রসঙ্গে ফিরে আসবার কথা ভাবছিলেন। মরীচি ঋষির প্রসঙ্গ। আমরা নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

এক সময় গুরুজী তাউজীর দিকে তাকিয়ে বললেন: পুরাণের একটি বৈশিষ্ট্য হল অসঙ্গতি। একই কাহিনী অনেক পুরাণে আছে, কিন্তু তাদের মিল সর্বত্র নেই। অনেক জায়গাতেই গোঁজামিল আছে। যেমন শতরূপার কথা।

বলে গুরুজী আবার থামলেন।

গুরুজীর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, কথাটি তিনি বলবেন কিনা ভাবছেন।

তাউজী বললেন: বলুন।

গুরুজী বললেন: এ সব কথা না বললেই ভাল।

কৌতূহল জাগিয়ে বলবেন না!

গুরুজী বললেন: পুরাণের সব কথা সবার পাতে দেবার মতো নয়।

বলে আমাদের দিকে তাকালেন। তারপরে বললেন: মৎস্য পুরাণে একটা আপত্তিকর কথা পাই। শতরূপা ব্রহ্মার মানসী কন্যা, পত্নীও বটে। মনু এঁদেরই সন্তান।

গুরুজী একটু ভেবে বললেন: দেহ থেকে উৎপন্ন বলে কন্যা বলা হয় তো ঠিক নয়। গোলকে রাধাও শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ থেকে উদ্ভূত হয়ে তাঁর স্ত্রী হয়েছিলেন। এই ব্যাপারে বিষ্ণুপুরাণের মতটাই মেনে নেওয়া উচিত। শতরূপা স্বায়ম্ভুব মনুর পত্নী। এঁদের এক কন্যা দেবহূতির বিবাহ দিয়েছিলেন কর্দম ঋষির সঙ্গে। ব্রহ্মার ছায়া থেকে এঁর জন্ম। কপিল মুনি এঁদের পুত্র, এবং নয়টি কন্যার মধ্যে প্রথমা কন্যার বিবাহ হয়েছিল ব্রহ্মার মানস পুত্র মরীচির সঙ্গে। এঁদের দুই পুত্র, কশ্যপ ও পূর্ণিমাস। মরীচি সপ্তর্ষিদের মধ্যে সর্ব-প্রধান, প্রতি দিন তাঁর উদ্দেশে তর্পণের বিধান। কিন্তু তাঁর পুত্র কশ্যপ দেবাসুরের জন্মদাতা হিসাবে আরও বিখ্যাত হয়েছেন।

কাত্যায়নের বেদানুক্রমণিকায় পাই যে কশ্যপ ঋক্ সংহিতার কয়েকটি সূক্তের ঋষি। সাম যজুঃ ও অথর্ব সংহিতায় তিনি ইন্দ্রাদি দেবতার জনক। শুক্ল যজুর্বেদ প্রভৃতি বৈদিক সংহিতার মতে হিরণ্যবর্ণ ব্রহ্ম থেকে তাঁর জন্ম। আর মার্কণ্ডেয় পুরাণ বলেন যে কশ্য বা সোমরস থেকে উৎপন্ন বলে তাঁর নাম কশ্যপ।

কশ্যপ একজন প্রজাপতি ঋষি। তিনি দক্ষ প্রজাপতির সতেরটি কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন, এবং সতেরটি কুলের তিনি জনক। অদিতি দেবতাদের মা, দিতি দৈত্যদের ও দনু দানবদের, কাষ্ঠার গর্ভে জন্মেছে অশ্বাদি পশু, গন্ধর্বরা অরিষ্টার সন্তান, সুরমা রাক্ষসদের মা, বৃক্ষ জন্মেছে ইলার গর্ভে। মুনি অপ্সরাদের মা, সর্প ক্রোধবসার সন্তান, শ্যেন গৃধ্র প্রভৃতি তাম্রার, গো মহিষাদি সুরভির, শ্বাপদ সরমার, জলজন্তু তিমির সন্তান, বিনতার পুত্র গরুড় ও অরুণ, কদ্রুর সন্তান নাগ, পতঙ্গীর পতঙ্গ ও যামিনীর শলভ। এই হিসাব ভাগবতের। মহাভারত ও পুরাণের মতে কশ্যপের স্ত্রী তের জন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে কশ্যপের সাতজন স্ত্রী দেখি—দিতি অদিতি বিনতা কদ্রু সুরভি সরমা ও দনু।

কশ্যপের স্ত্রীদের নিয়ে অনেক গল্প আছে। বিশেষ করে অদিতি ও দিতির গল্প, বিনতা ও কদ্রুর গল্প।

ঋগ্বেদে দেবতাদের জন্ম বিবরণে আমরা অদিতির নাম পাই।—অদিতি থেকে দক্ষ জন্মালেন, আবার দক্ষ থেকে অদিতি জন্মালেন। অতএব হে দক্ষ, অদিতি তোমার দুহিতা। তাঁরই থেকে অমৃতবন্ধু ভদ্র দেবতারা জন্মেছেন।

তাউজী এইখানে গুরুজীকে বাধা দিলেন। বললেন: মনে একটু খটকা লেগেছে।

গুরুজী হেসে বললেন: জানি। অদিতি যদি দক্ষের কন্যা হন, তাহলে অদিতি থেকে দক্ষ কী করে জন্মালেন, এই তো?

তাউজী বললেন: ঠিক তাই।

গুরুজী বললেন ঃ যাস্ক নিরুক্তে একটা কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করেছেন। বলেছেন, সমানজন্মানৌ স্যাতামিতি। অপি বা দেবধর্মেণ ইতরেতর জন্মানৌ স্যাতামিতরেতর প্রকৃতী।

এ কথার অর্থ কে বুঝতে পারলেন জানি নে। আমরা নীরবে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

গুরুজী বললেন ঃ এই সংস্কৃতের মানে বললেও ব্যাপারটা সহজ মনে হবে না। সরল মানে হল, দক্ষ ও অদিতির সমান জন্ম হতে পারে। কিংবা দেবধর্মে একে অপরের থেকে জন্মলাভ করে অন্যের প্রকৃতি পেয়েছেন। আমার কী মনে হয় জান?

তাউজী বললেন ঃ কী?

আমার একেবারে অন্য কথা মনে হয়। অদিতি কারও নাম নয়, এ একটি রূপক। প্রথম যুগে ঋষিরা আকাশের বর্ণনায় এই শব্দ প্রয়োগ করতেন, পরে এই শব্দে দেবী বা ঋষি পত্নী বোঝাত। ঋগ্বেদেরই একটি ঋকে পাই—হে দেবগণ, তোমাদের নামকে নমস্কার করি, বন্দনা করি, পূজা করি। তোমরা অদিতি থেকে জন্মেছ, অপ্ থেকে জন্মেছ, পৃথিবী থেকে জন্মেছ, তোমরা আমার আবাহন শোন। অপ্ মানে জল, কিন্তু সায়নাচার্য অপ্ মানে অন্তরীক্ষ বলেছেন। বেদে অদিতি শব্দের প্রথম ব্যবহার যে দ্যুলোক অর্থে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পুরাণে এই অদিতি দক্ষ প্রজাপতির কন্যা, কশ্যপের পত্নী ও দেবগণের মাতা। রামায়ণ মহাভারত ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণে আছে যে বামন অবতারের সময় বিষ্ণু অদিতির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু গোলমাল বাধিয়েছে বাজসনেয় সংহিতা ও তৈত্তিরীয় সংহিতা। এতে আছে যে অদিতি বিষ্ণুর স্ত্রী। এই কথা উপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় দেখি না। গোঁজামিল দেবার মতো কোন উপাদানও নেই।

আমরা ভেবেছিলাম যে গুরুজী এবারে অদিতির সম্বন্ধে কোন

পৌরাণিক গল্প শোনাবেন, কিন্তু তা করলেন না। বললেনঃ কশ্যপের পত্নীদের সম্বন্ধে কয়েকটি গল্প খুবই প্রচলিত। দিতি অদিতি ও কদ্রু বিনতার কাহিনী, গরুড়ের গল্প, সে সব তোমরা নিজেরা পড়ে নিও।

একটু থেমে বললেনঃ কশ্যপের চরিত্র সম্বন্ধে কোন ধারণা করতে আমি সক্ষম হই নি। তিনি তপস্বী ছিলেন, দেব দানব প্রভৃতি জাতির জনক প্রজাপতি ঋষি। দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে দৈত্যরা বিনষ্ট হলে দিতি তাঁর কাছে ইন্দ্রবিজয়ী পুত্র চেয়েছিলেন। কশ্যপ তাতে সম্মত হয়েছিলেন। কদ্রু তাঁর কাছে সহস্র নাগ পুত্র চেয়েছিলেন, তিনি তাই দিয়েছিলেন। আবার বিনতা শুধু দুই মহাবলশালী পুত্রের জননী হতে চেয়েছিলেন। কশ্যপ তাঁরও কামনা পূর্ণ করেছিলেন। তিনি যে নির্বিরোধী ঋষি ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় বালখিল্য ঋষিদের সঙ্গে ইন্দ্রের বিরোধের সময়।

পুত্রলাভের জন্য কশ্যপ এক যজ্ঞ করবেন। তিনি যজ্ঞের কাঠ আনবার জন্য বালখিল্য ঋষিদের নিযুক্ত করেন। সংখ্যায় তাঁরা ষাট হাজার, কিন্তু আকারে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ। ব্রহ্মার মানস পুত্র ক্রতু এঁদের পিতা। ঋগ্বেদে আমরা অন্য কথা দেখি। বালখিল্যরা ব্রহ্মার লোম থেকে উৎপন্ন হয়েছেন। এঁরা সকলে মিলে কশ্যপের যজ্ঞের জন্য একটি পলাশপাতার বৃন্ত বয়ে আনছিলেন। এই দৃশ্য দেখে ইন্দ্র তাঁদের উপহাস করেন। বালখিল্যরা অপমানিত হয়ে অন্য এক ইন্দ্র সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। ভয় পেয়ে ইন্দ্র কশ্যপের শরণ নিলেন। কশ্যপের মধ্যস্থতায় একটা মীমাংসা হল। তিনি তাঁদের বোঝালেন যে ব্রহ্মা ইন্দ্রকে নিয়োগ করেছেন, কাজেই অন্য ইন্দ্র উৎপত্তির চেষ্টা উচিত নয়। তার চেয়ে পক্ষীদের এক ইন্দ্র হোক। বিনতা তাঁর কাছে মহাবলশালী পুত্রের কামনায় এসেছিলেন। তাঁর গর্ভে অরুণ ও গরুড়ের জন্ম হল। গরুড় পক্ষীদের ইন্দ্র।

এই গরুড়ের জন্য কশ্যপকে আমরা আরও দুবার দেখতে পাই। একবার ক্ষুধার্ত গরুড় পিতার নিকট খাদ্য প্রার্থনা করেছিলেন। কশ্যপ গজ কচ্ছপকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, বিভাবসু নামে এক রাগী ঋষি ছোট ভাই সুপ্রতীকের শাপে কচ্ছপ হয়ে সরোবরে আছেন। সুপ্রতীক ধন বিভাগের জন্য বার বার অনুরোধ করতেন, আর বিভাবসু বলতেন যে যারা গুরু ও শাস্ত্র মানে না তারাই ভাইদের শত্রু ভেবে ধন বিভাগ চায়। সুপ্রতীক না মানার জন্য তাঁকে তিনি শাপ দিলেন, তুমি ভিন্ন হয়ে ধনী হতে চাও, বেশ, আমার শাপে তুমি হাতী হবে। সুপ্রতীকও ছেড়ে দিলেন না, বললেন, তাহলে আমার শাপে তুমি কচ্ছপ হবে। কশ্যপ বললেন, ঐ যে ঐ সরোবরে গজ কচ্ছপকে যুদ্ধ করতে দেখছ, ওরাই বিভাবসু ও সুপ্রতীক। ওদের তুমি ভক্ষণ কর।

গরুড় এক নখে গজকে আর এক নখে কচ্ছপকে তুলে একটা বটগাছের ডালে বসেছিলেন। সেই ডালে বালখিল্যরা অধোমুখে ঝুলছিলেন। গরুড়ের ভারে সেই ডাল ভাঙতেই গরুড় ঋষিদের ভয়ে ঠোঁট দিয়ে সেই ডাল ধরে গন্ধমাদন পর্বতে তপস্যারত কশ্যপের কাছে উপস্থিত হলেন। কশ্যপের অনুরোধে বালখিল্যরা সেই শাখা পরিত্যাগ করে হিমালয়ে তপস্যা করতে গেলেন।

মহর্ষি কশ্যপকে রামচন্দ্র ও পরশুরামের পুরোহিত রূপেও দেখা যায়। বিভাণ্ডক ঋষি তাঁর পুত্র, পৌত্র ঋষ্যশৃঙ্গের গল্প বারান্তরে বলব।

বলে গুরুজী থামলেন।

ইন্দ্রাদি দ্বাদশ দেবতার পিতা কশ্যপের কাহিনী এইখানেই সমাপ্ত হল। পরে আমি অদিতির দ্বাদশ পুত্রের নাম লিখে নিয়েছিলাম—ইন্দ্র বিষ্ণু সূর্য ত্বষ্টা বরুণ অংশ অর্যমা রবি পুষা মিত্র বরদমনু ও পর্জন্য। এঁরা বৈদিক দেবতা।

তিন

আশ্রমের বাগানে আমি পাকা কাজ পেয়েছি। শক্ত সমর্থ চেহারার মারাঠী অধ্যাপক পাধ্যে আশ্রমের পিছনে এক খণ্ড জমি কোদাল চালিয়ে পরিষ্কার করেছিলেন। বাগানে আমার আগ্রহ দেখে তাউজী একখানা খুরপি কিনে দিয়েছিলেন। চাষীদের কাছ থেকে তরি তরকারির বীজও এনে দিয়েছিলেন। আমরা দুজনে তাই লাগিয়ে দিলাম।

সকাল বেলায় আমি বললাম: সব্জি-বাগানের কাজ তো ফুরিয়েছে, চলুন এবারে সামনে যাই।

পাধ্যে বললেন: কী হবে সামনে?

দুটো ফুলের গাছ লাগাব।

দু নৌকোয় পা দিলে হয়তো কোনটাই হবে না।

তা হলে আজ আমরা কী কাজ করব?

পাধ্যেও বুঝতে পারছিলেন যে বীজ থেকে চারা না বেরনো পর্যন্ত আমাদের আর কিছু করবার নেই। মাঝে মাঝে জল ছেটাচ্ছি, আর অপেক্ষা করছি অঙ্কুরোদ্গমের। পাধ্যে বললেন: এস, তাহলে আর এক ফালি জমি তৈরি করি।

আপত্তি না করে আমি বললাম: আপনি বুঝি ফুল ভালবাসেন না?

ফুল দেবতার প্রিয়।

আপনার?

জীবন ধারণের জন্যে যার প্রয়োজন নেই, আমার তা প্রিয় নয়।

জীরন ধারণের জন্য খাদ্য ছাড়া আর কিছুরই তো প্রয়োজন

নেই। এই যে আমরা এখানে পড়াশুনো করতে এসেছি, এরই কি প্রয়োজন আছে!

পাধ্যে সহসা এ কথার উত্তর খুঁজে পেলেন না। উত্তর দিল স্থপ্তি। পিছন থেকে বলে উঠল: চেনেলু ফুলের বাগান করছে। ও চায় না যে তোমরা সেখানে যাও।

স্থপ্তি সর্বত্র আছে। তাউজীর উপরে এই আশ্রম পরিচালনার ভার, আর তাঁর মাতৃহীন এই মেয়েটি সকলের উপর কর্তৃত্ব করছে। বললাম: তোমাকে যেতে দিচ্ছে তো?

স্থপ্তি তখন দণ্ডপাণির কাছে পৌঁছে গেছে। দণ্ডপাণি দড়ি-দড়া নিয়ে একটা খাটিয়া বুনবার চেষ্টা করছিলেন। স্থপ্তি বোধহয় কিছু বলেছিল, একবার তার দিকে তাকিয়ে নিজের কাজে আবার মন দিলেন। কোন কথা কইলেন কি না শোনা গেল না।

পাধ্যে বললেন: ফুল আমি কেন ভালবাসি না জান?

জানি।

কেন বল তো?

জীবন ধারণের জন্য কোন প্রয়োজন নেই।

বাধা দিয়ে পাধ্যে বললেন: ও কথা সত্যি নয়।

তবে?

পাধ্যে একটু ইতস্তত করে বললেন: সুন্দর জিনিষ কখনও ভালবাসতে নেই। তাতে শুধু দুঃখই আছে।

আমি আশ্চর্য হলাম। এ আবার কী কথা!

পাধ্যে বললেন: সত্যি কথা। সুন্দর জিনিষকে ভালবাসলে দুঃখের শেষ নেই। ভালবেসে সুন্দর ফুল কর, অন্য লোক এসে সে ফুল তুলে নিয়ে যাবে। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকাররা অনেক সংহিতা রচনা করেছেন, কিন্তু এর কোন প্রতিবিধান করেন নি।

এ কথা আমিও স্বীকার করি। আমাদের দেশেও দেখেছি অত্যাচার। সরস্বতী পূজোর আগের রাতে কারও বাগানে একটি

ফুলও থাকে না। অন্যান্য বারোয়ারী পূজার দিনেও প্রায় তাই। বললাম: চুরি করা ফুলে পূজো হয় না, এমনি কোন নিয়ম থাকলে ভাল হত।

পাধ্যে বললেন: শুধু পূজো কেন, অনেকে যে অন্যের ফুল নিয়ে নিজের ফুলদানি সাজায়।

এতটা আমি দেখি নি। আমি দেখেছি ফুল কিনে ফুলদানি সাজাতে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাধ্যে বললেন: দেখবার এখনও অনেক বাকি আছে।

পাধ্যের কণ্ঠে একটা বেদনার ধ্বনি শুনলাম। এ তো অভিজ্ঞতার গর্ব নয়, এ যেন গভীর উপলব্ধির ইঙ্গিত। তা না হলে পাধ্যে আর আমার চেয়ে কত বড়! আমার যদি তেইশ হয় তো তাঁর ত্রিশের কিছু বেশি। সাত বছর এমন আর বেশি কি! তাঁর কাছে সংস্কৃত শিখছি বলেই গুরু বলে খাতির করি। তবু আমি প্রতিবাদ করলাম না। অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম: কাল রাতে গুরুজী আমাদের বিনতা কদ্রুর গল্প কেন বললেন না?

পাধ্যে বোধহয় অন্য কিছু ভাবছিলেন। একটু সময় নিয়ে উত্তর দিলেন: ঋষিদের কথায় সে গল্প অপ্রাসঙ্গিক হত।

ঋষিপত্নীর কথাও অপ্রাসঙ্গিক হবে!

বোধহয়।

তাহলে আমরা এ সব গল্প কী করে জানব?

পাধ্যে জিজ্ঞাসা করলেন: মহাভারত পড় নি? কদ্রু বিনতা ও গরুড়ের গল্প তো একেবারে প্রথমের দিকে।

কিছু যেন মনে পড়ছে। আর দিতি অদিতির গল্প?

তাও আছে।

দিতি অদিতির গল্প আমি পাধ্যের কাছে শুনলাম।

দৈত্য ও দেবতায় প্রবল যুদ্ধ হল। তাতে মারা পড়ল দৈত্যরা। দিতির পুত্র তারা। দিতি কশ্যপকে বললেন, এবারে আমার এক ইন্দ্রবিজয়ী পুত্র চাই। বারে বারে ইন্দ্র আমার ছেলেদের মারবে, এ আমি সইতে পারব না।

কশ্যপ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তথাস্তু। কিন্তু শত বর্ষ শুচি ভাবে গর্ভ ধারণ করতে হবে।

দিতি এই শর্ত মেনে নিলেন, এবং অত্যন্ত সাবধানে দিন যাপন করতে লাগলেন।

এ দিকে ইন্দ্রের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। দিতির এই পুত্রের জন্ম হলেই তাঁর স্বর্গের সিংহাসন ধরে টানবে। কাজেই সারাক্ষণ তিনি দিতির ছিদ্র অন্বেষণ করতে লাগলেন। একদিন সফল হলেন। দিতি অধৌত পদে শয়ন করেছিলেন, সেই সুযোগে ইন্দ্র তাঁর গর্ভস্থ সন্তান বজ্র দিয়ে বিভক্ত করলেন।

একের বদলে দিতি সাত পুত্রের জন্ম দিলেন। ক্রন্দনরত এই পুত্রদের ইন্দ্র 'মা রুদ' বলে কাঁদতে বারণ করেছিলেন। জন্মাবার পরে তাই তাদের মরুৎ নাম হল।

এটি বিষ্ণু পুরাণের গল্প। রামায়ণে গল্পটি কিছু অন্য রকম।

তাউজীর কাছ থেকে একখানা বাঙলা মহাভারত চেয়ে এনে আমি কদ্রু-বিনতার গল্প পড়ে নিলাম।

দিতি অদিতির মতো এঁরাও দক্ষ প্রজাপতির কন্যা ও কশ্যপের পত্নী। কদ্রু স্বামীর কাছে সহস্র নাগপুত্র চেয়েছিলেন, আর বিনতা চেয়েছিলেন মহাবলশালী দুটি পুত্র। যথা সময়ে তাঁরা অণ্ড প্রসব করলেন, সেই অণ্ড থেকে কদ্রুর সহস্র নাগ পুত্রের জন্ম হল। কিন্তু বিনতার অণ্ড থেকে পুত্র জন্মাল না। বিনতা অধৈর্য হয়ে একটি ভেঙ্গে ফেললেন। সর্বনাশ! সন্তানের উপরের অঙ্গ সম্পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু নিম্নাঙ্গ তখনও অপরিণত। পুত্র মাতাকে

তিরস্কার করল, তোমার লোভের জন্য আমি অসম্পূর্ণ রইলাম। এই পাপে তোমাকে পাঁচ শত বৎসর সপত্নী কদ্রুর দাসী হয়ে থাকতে হবে। আর সাবধান, দ্বিতীয় অণ্ডটি তুমি অকালে ভেঙ্গ না। ঐ পুত্র তোমার মুক্তির ব্যবস্থা করবে। বলে সে আকাশে উত্থিত হল, এবং অরুণ নামে সূর্যের সারথি হল।

কদ্রুর ছলনায় বিনতাকে তাঁর দাসী হতে হল। একদিন উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বকে দেখে তার বর্ণ নিয়ে দুজনের মধ্যে তর্ক হল। বিনতা বললেন সাদা ; আর কদ্রু বললেন, এর পুচ্ছের লোম কালো। শেষ পর্যন্ত স্থির হল যে পর দিন তাঁরা ভাল করে দেখবেন, এবং যার কথা ভুল হবে তাকে অন্যের দাসী হতে হবে।

উচ্চৈঃশ্রবার সাদা লেজ, তবু বিনতা হেরে কদ্রুর দাসী হলেন। কদ্রু তাঁর নাগ পুত্রদের বলেছিলেন যে ঐ অশ্বের পুচ্ছে লগ্ন হয়ে সাদাকে কালো করতে হবে। যারা রাজী হল না তাদের তিনি শাপ দিলেন যে জনমেজয়ের সর্পসত্রে তারা দগ্ধ হবে। অন্য নাগেরা মাতার আদেশ পালন করে বিমাতাকে পরাস্ত করল।

যথাসময়ে গরুড়ের জন্ম হল। অগ্নিশিখার মতো তার প্রভা, প্রলয়ের আগুনের মতো প্রদীপ্ত ও ভয়ঙ্কর, সমুদ্রের হুতাশনের মতো উগ্র, বিদ্যুতের মতো পিঙ্গল চক্ষু, মহাকায় পরাক্রান্ত অমিত-বিক্রম পক্ষী-মানব। তার শ্বেতবর্ণ মুখ, স্বর্ণাভ দেহ ও রক্তবর্ণ পক্ষ। পাখীর মতো নখ ও চক্ষু। গরুড় পক্ষীদের ইন্দ্র কেমন করে হলেন, সে কাহিনী আমরা গুরুজীর কাছে শুনেছি।

জন্মের পরে গরুড় যখন সমুদ্র পারে মায়ের কাছে গেলেন, তখন তাঁর দুঃখ দেখে কাতর হলেন। বিনতা কদ্রুকে বহন করে নাগালয়ে যাচ্ছেন, আর সর্পেরা গরুড়ের পিঠে উঠল। গরুড় বিনতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের এই দুরবস্থা কেন মা ?

বিনতা তাঁকে কদ্রুর কপটতার কথা বললেন। কী করলে তাঁদের মুক্তি হবে, গরুড় সেই কথা জানতে চাইলেন নাগদের

কাছে। তারা বলল, অমৃত চাই, নিজের বীর্যবলে স্বর্গ থেকে অমৃত এনে দিলে তোমরা মুক্তি পাবে।

গরুড় বললেন, তাই দেব।

তারপর মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মা, আমি অমৃত আনতে স্বর্গে যাচ্ছি, পথে কী খাব ?

বিনতা বললেন, সমুদ্রের ধারে নির্দয় নিষাদেরা বাস করে, তুমি তাদের খাও। কিন্তু সাবধান ব্রাহ্মণকে হিংসা ক'রো না।

এ দিকে এক নিষাদীকে বিয়ে করে একজন ব্রাহ্মণও নিষাদদের সঙ্গে বাস করছিলেন। গরুড় তাঁকেও মুখে পুরলেন, কিন্তু গিলতে পারলেন না। গলা আগুনের মতো জ্বলতেই ব্রাহ্মণকে বেরিয়ে আসতে বললেন। ব্রাহ্মণ তাঁর নিষাদী স্ত্রীকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

কয়েক হাজার নিষাদ খেয়েও গরুড়ের পেট ভরল না। কশ্যপের কাছে গিয়ে নিজের ক্ষুধার কথা জানালেন। কশ্যপ তাঁকে গজকচ্ছপকে খেতে বললেন। সে গল্প আমরা গুরুজীর মুখে শুনেছি।

গজকচ্ছপকে খেয়ে গরুড় আকাশে উড়ে চললেন। নানা প্রাকৃতিক উপদ্রব শুরু হল। তাই দেখে দেবতারা ভয় পেলেন। গুরু বৃহস্পতি বললেন যে গরুড় স্বর্গ থেকে অমৃত হরণ করতে আসছেন।

অমৃতের রক্ষক হলেন বিশ্বকর্মা। চারিদিকে অগ্নি শিখা জ্বলছে, তার নিকটে একটি লোহার চক্র সারাক্ষণ ঘুরছে। সেই চাকার নিচে দুটি ভয়ঙ্কর সাপ। গরুড় ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাদের যুদ্ধে পরাস্ত করে বিশ্বকর্মাকেও জয় করলেন। তারপর দেহ সঙ্কুচিত করে চক্রের ভিতর দিয়ে গিয়ে সাপ দুটিকে বধ করলেন। বাধা আর রইল না, অমৃত নিয়ে গরুড় আবার আকাশে উড়লেন।

প্রথমে বিষ্ণুর সঙ্গে তাঁর দেখা হল। অমৃত হাতে নির্লোভ গরুড়কে দেখে বিষ্ণু বললেন, বৎস, বর নাও।

গরুড় বললেন, আমি অমৃত পান না করেই অমর হতে চাই, আর তোমার উপরে থাকতে চাই।

বিষ্ণু বললেন, তথাস্তু।

এবারে গরুড় বললেন, প্রভু, তুমিও আমার কাছে বর নাও।

বিষ্ণু হেসে বললেন, বেশ, তুমি আমার বাহন হও, আর থাক আমার রথধ্বজের উপরে।

গরুড়ও বললেন, তথাস্তু।

তারপর দেখা হল ইন্দ্রের সঙ্গে। ইন্দ্র তাঁকে বজ্রাঘাত করলেন। এই আঘাতে গরুড়ের কিছুই হল না। গরুড় হেসে তাঁর দেহ থেকে একটি পালক ফেলে দিয়ে বললেন, দধীচি মুনি ও তাঁর অস্থিতে নির্মিত বজ্র ও তোমার সম্মানের জন্য এই পালকটি আমি ফেলে দিলাম।

এই সুন্দর পালক দেখে সবাই তাঁর নাম রাখল সুপর্ণ, আর ইন্দ্র তাঁর সঙ্গে বন্ধুতা করলেন। বললেন, তোমার তো অমৃতে প্রয়োজন নেই, অমৃত তুমি আমাদের ফিরিয়ে দাও। তা না হলে যাদের তুমি অমৃত দেবে, তারা আমাদের উপর অত্যাচার করবে।

গরুড় বললেন, তোমরা তো জান, আমি অমৃত কেন নিয়ে যাচ্ছি। আমার কার্য সিদ্ধির পরে তোমরা অমৃত হরণ ক'রো।

খুশী হয়ে ইন্দ্র বললেন, তুমি বর নাও।

গরুড় বললেন, সর্পরা আমার ভক্ষ্য হক।

ইন্দ্র সেই বরই দিলেন।

তারপর গরুড় এসে নাগদের বললেন, এই নাও অমৃত। আমি এই কুশের উপরে রাখছি, তোমরা স্নান সেরে খেয়ো। তার আগে আমার মাকে মুক্তি দাও।

নাগরা বিনতাকে মুক্তি দিয়ে স্নান করতে গেল। আর এই সুযোগে ইন্দ্র সেই অমৃত হরণ করলেন। নাগরা ফিরে এসে অমৃত

না পেয়ে কুশ চাটতে লাগল। এরই ফলে তাদের জিভ দুভাগ হয়েছে।

এই প্রসঙ্গেই আস্তীক মুনির কথা। তাঁর পিতা জরৎকারু। তিনি ব্রহ্মচারী মহাতপস্বী পরিব্রাজক ঋষি। একদিন তিনি কয়েকজন মানুষকে একটা গাছ থেকে অধোমুখে ঝুলতে দেখে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁরা বললেন যে জরৎকারু নামে তাঁদের এক বংশধর বিবাহ করে নি, বংশ লোপের আশঙ্কায় তাঁরা ঐ ভাবে আছেন। জরৎকারু নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন যে সমনামের কোন কন্যাকে ভিক্ষা পেলে তিনি বিবাহ করে বংশ রক্ষা করবেন।

এদিকে মায়ের শাপের ভয়ে কদ্রুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বাসুকি তপস্যা শুরু করছেন। জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে কী করে তারা রক্ষা পাবে, সেই চিন্তা। এলাপত্র নামে এক নাগ বাসুকিকে বলল যে তাদের এক ভাগনে সবাইকে রক্ষা করবে। মা যখন শাপ দিয়েছিলেন তখন সে তাঁর কোলে বসে ব্রহ্মার কথা শুনেছে। ব্রহ্মা বলেছেন যে তাদের বোন জরৎকারুর বিয়ে হবে জরৎকারু মুনির সঙ্গে, আর তাঁদের পুত্র আস্তীক তাদের বাঁচাবে। বাসুকি জরুৎকারু মুনির সঙ্গেই তাঁর বোনের বিয়ে দিলেন। এঁরই অন্য নাম মনসা। কশ্যপের মানস কন্যা তিনি। ব্রহ্মার উপদেশে সর্প মন্ত্রের সৃষ্টি করে মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে তাঁর জন্ম। কুমারী অবস্থায় তিনি মহাদেবের কাছে থেকে মন্ত্র ও পূজা শিখে সিদ্ধ হন।

একদিন জরৎকারু মুনি তাঁর স্ত্রী মনসার কোলে মাথা রেখে ঘুমচ্ছিলেন। সূর্যাস্তের সময় হল। সান্ধ্যকৃত্যের কাল উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে ভেবে মনসা তাঁর স্বামীকে জাগালেন। জরৎকারু বললেন, সূর্যের কী দুঃসাহস যে আমি ঘুমিয়ে থাকলে সে অস্ত যাবে! নিদ্রাভঙ্গ করে তুমি আমার অপমান করেছ, আমি আর তোমার কাছে থাকব না।

মুনি আর স্ত্রীর কোন কথা শুনলেন না। স্ত্রী বললেন, তুমি চলে গেলে আমি কী নিয়ে বাঁচব? মুনি তাঁর উত্তরে বলে গেলেন অস্তি। মানে তাঁর গর্ভে পরম তেজস্বী বেদজ্ঞ পুত্র আছে। এই পুত্রই আস্তীক নামে বিখ্যাত ঋষি হবেন।

আস্তীক তাঁর মাতুলালয়ে নাগদের নিকট মানুষ হয়েছিলেন। পরে ভৃগুপুত্র চ্যবনের কাছে শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন। অর্জুনের পৌত্র ও অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিতের মৃত্যু হয়েছিল তক্ষকের দংশনে। এই কথা জেনে তাঁর পুত্র জনমেজয় সর্পসত্রে নাগকুল নির্মূল করার ব্যবস্থা করেছিলেন। নাগদের মধ্যে প্রধান হল শেষ নাগ বাসুকি ও তক্ষক। বাসুকি নাগদের রাজা এবং অনন্ত নাগ নামেও পরিচিত। ব্রহ্মার কথায় বাসুকি পাতালে পৃথিবী ধারণ করে আছেন। জনমেজয় সর্প যজ্ঞ আরম্ভ করলে বাসুকি তাঁর ভগিনী মনসার সাহায্য প্রার্থনা করলেন। মনসা আস্তীককে যজ্ঞস্থলে পাঠালেন।

সর্পযজ্ঞে তখন অনেক সাপ মারা পড়েছে, কিন্তু প্রধান শত্রু তক্ষক তখনও আসে নি। তক্ষক ইন্দ্রের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল। যজ্ঞের হোতারা ইন্দ্রকে আহ্বান করলেন। ইন্দ্র তক্ষককে নিজের উত্তরীয়ের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছেন জেনে জনমেজয় ইন্দ্রকেই আগুনে নিক্ষেপ করতে বললেন। ইন্দ্র তখন তক্ষককে ফেলে পালিয়ে গেলেন।

এদিকে আস্তীক মুনি যজ্ঞস্থলে ঢুকতে পারেন নি। রাজার আদেশে দ্বারপাল তাঁকে বাধা দিয়েছিল। আস্তীক জনমেজয়ের স্তুতি করে তাঁকে সন্তুষ্ট করলেন। রাজা মুনিকে বর দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তক্ষক তখন মন্ত্রবলে যজ্ঞাগ্নির দিকে আসছে। ঋত্বিকরা রাজাকে বললেন, এবারে তক্ষক আসছে, এখন আপনি ব্রাহ্মণকে বর দিতে পারেন।

রাজা বললেন, বালক, তুমি বর চাও।

আস্তীক আকাশের দিকে চেয়ে তক্ষককে বললেন, তিষ্ঠ। আর রাজাকে বললেন, এই যজ্ঞ এখনই বন্ধ হক।

রাজা বললেন, অন্য বর নাও।

আস্তীক উত্তর দিলেন, আর কিছু নয়, আমি শুধু আমার মাতৃকুলের মঙ্গল চাই।

সংকল্পবদ্ধ রাজা সেই বরই দিলেন।

যজ্ঞ নিবৃত্ত হল। রক্ষা পেল সর্পকুল।

এখন আমরা সাপ দেখলে বলি, আস্তীক, আস্তীক। এই নামে আমাদের সাপের ভয় দূর হয়। আর রাত্রে শয়নকালে প্রণাম করি আস্তীক-জননীকে।

আস্তীকস্য মুনের্মাতা ভগিনী বাসুকেস্তথা।
জরৎকারুমুনেঃ পত্নী মনসা দেবি নমোঽস্তুতে॥

চার

খাটিয়ার উপরে লম্বা হয়ে শুয়ে চেনেলু পা দোলাচ্ছিল। চোখ বন্ধ, মুখ গম্ভীর। গত কয়েক দিন ধরেই সে এমনি বিষণ্ণ মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমি তার বিরাগের কারণ জানি। সে নিজেই আমাকে বলেছিল যে তার আর ভাল লাগছিল না। এখান থেকে চলে যাবে বলে স্থির করেছে।

সেদিন রাত্রে তাকে ঘরে না দেখে আমি খুঁজতে বেরিয়েছিলাম। আশ্রমের সামনেই স্বচ্ছসলিলা গঙ্গা প্রত্যক্ষ দেবতার মতো অপরূপ রূপে প্রবাহিতা। আমি মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

বাতাসে একটা গানের সুর ভেসে আসছিল। ভাল করে চেয়ে দেখলাম, অন্ধকারে একটা পাথরের উপর বসে চেনেলু গান গাইছে। দূর দিগন্তে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। হৃদয় দিয়ে হয়তো দেবতার মহিমা দেখছিল। আমি তাকে বাধা দিই নি।

আজও তার অন্যমনস্কতা যায় নি। আজও সে তার দু চোখ বন্ধ করে গভীর ভাবে কিছু ভাবছে, আর পা দোলাচ্ছে। খানিকক্ষণ তাকে লক্ষ্য করবার পরে আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কী ভাবছ?

চেনেলু কোন উত্তর দিল না।

বললাম: শুনতে পাচ্ছ না নাকি!

চেনেলু এ কথারও উত্তর দিল না।

এমন বৈরাগ্য কেন? সুপ্তি কি—

নিমেষে সোজা হয়ে বসে চেনেলু বলল: কী বললে?

সুপ্তি কি তোমাকে—

খবরদার, ও মেয়ের নাম তুমি আমার সামনে করবে না।

কেন, আবার কিছু করেছে নাকি ?

চেনেলু ধমক দিয়ে বলে উঠল : বলছি না, ওর সম্বন্ধে তুমি আমাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করবে না !

বেশ, না হয় নাই জিজ্ঞেস করলাম। তুমি নিজে থেকেই বল।

চেনেলু আমার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল। মনে হল, দৃষ্টি দিয়েই সে আমাকে ভস্ম করে ফেলবে।

পুরাকালে ঋষিদের দৃষ্টি ছিল এই রকম। চোখে আগুন জ্বলত। মহাদেবের রোষ দৃষ্টিতে মদন ভস্ম হয়েছিল, ঋষিদের দৃষ্টিকেও লোকে ভয় পেত। ক্রুদ্ধ হলে আর রক্ষা নেই। হাতে পৈতে জড়িয়ে শাপ দিলেই ভস্ম। অঙ্গরাজ্যের রাজা লোমপাদ যখন বারাঙ্গনাদের ডেকে বলেছিলেন যে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে তাঁর রাজ্যে ভুলিয়ে আনতে হবে, তখন তারা ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। রাজার আজ্ঞা অমান্য করার যত ভয়, তার চেয়ে বেশি ভয় ছিল ঋষিকে। তাদের ছলনা বুঝতে পারলে আর কারও রক্ষা থাকবে না।

অযোধ্যার রাজা দশরথের সখা অঙ্গরাজ লোমপাদ একদা পুরোহিত ও ব্রাহ্মণদের সঙ্গে অসৎ আচরণ করেছিলেন। এই কারণে ব্রাহ্মণেরা তাঁকে পরিত্যাগ করে যান, এবং ইন্দ্রও বারিবর্ষণ বন্ধ করেন। রাজ্যে অজন্মা, প্রজাদের হাহাকারে রাজা বিচলিত হলেন। একজন মুনি বললেন, রাজা, আপনি প্রায়শ্চিত্ত করে ব্রাহ্মণদের তুষ্ট করুন।

তাহলেই বৃষ্টি হবে ?

না। তার জন্যে আপনাকে বিভাণ্ডক মুনির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে আপনার রাজ্যে আনতে হবে।

কিন্তু আজন্ম ব্রহ্মচারী এই ঋষিকুমারকে কে আনতে পারবে ?

রাজা তাঁর মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তারপরে ডেকে পাঠালেন সুদর্শনা বারাঙ্গনাদের। বললেন, যেমন করে পার,

ঋষ্যশৃঙ্গকে তোমরা নিয়ে এস। তার জন্যে পাবে মনোমত পুরস্কার।

সর্বনাশ! কে যাবে সেই ঋষিকে আনতে! কার আছে অমন দুঃসাহস! এক বাক্যে তারা জানিয়ে দিল যে এ তাদের অসাধ্য কাজ।

একজন বৃদ্ধা বারাঙ্গনা বলল, মহারাজ, আমাকে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিষ দিন, আমি তাঁকে আনার ব্যবস্থা করব।

রাজা লোমপাদ বললেন, তোমার যা চাই নাও।

গুরুজীর কাছে ঋষ্যশৃঙ্গের গল্প আমরা সংক্ষেপে শুনেছিলাম। বলেছিলেন, রামায়ণের বালকাণ্ডে ও মহাভারতের বনপর্বে এই কাহিনী আছে। পড়ে নিও।

ঋষ্যশৃঙ্গ কশ্যপতনয় বিভাণ্ডকের পুত্র। বনবাসী পাণ্ডবেরা কৌশিকী নদীর তীরে উপস্থিত হলে লোমশ ঋষি বলেছিলেন, ঐ দেখ বিশ্বামিত্রের আশ্রম। বিভাণ্ডকের আশ্রমও ছিল এইখানে।

তারপর তিনি ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান শুনিয়েছিলেন পাণ্ডবদের।

ঋষি বিভাণ্ডক মহাহ্রদে দীর্ঘকাল তপস্যা করছিলেন। একদিন স্বর্গের অপ্সরা উর্বশীকে দেখে তিনি কামার্ত হলেন, এবং তখনই জলে নেমে অবগাহন করলেন। নিকটে একটি হরিণী জল পান করছিল। জলের সঙ্গে মুনির বীর্য পান করে সে অন্তঃসত্ত্বা হল। এই হরিণী দেবকন্যা ছিলেন। ব্রহ্মা তাঁকে বলেছিলেন যে মৃগীরূপে তপস্বী পুত্র প্রসব করে তাঁর মুক্তি হবে। ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম হল, মাথায় একটি শৃঙ্গের জন্য এই নাম।

বিভাণ্ডকের আশ্রমে ঋষ্যশৃঙ্গ বড় হতে লাগলেন। ব্রহ্মচারী তপস্বী মুনিকুমার তাঁর পিতা ভিন্ন অন্য কোন মানুষ কোন দিন দেখেন নি। নারীর সম্বন্ধে তাঁর কোন ধারণা নেই, পার্থিব ভোগের কোনও স্পৃহা জাগে নি অন্তরে। পিতার আশ্রমে

বেদাধ্যয়ন ও তপশ্চর্যায় দিনপাত করছিলেন ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গ। এঁকেই আনতে হবে অঙ্গদেশে।

চেনেলুর দৃষ্টিতে রোষ দেখে আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। আমার হাতে ছিল বাঙলা মহাভারত। আমি আবার পাঠে মন দিলাম।

অঙ্গরাজ লোমপাদের কাছে ধনরত্ন নিয়ে সেই বৃদ্ধা গণিকা একটি নৌকা আশ্রমের মতো করে সাজাল। তারপর কয়েকজন সুরূপা প্রমদাকে নিয়ে বিভাণ্ডক ঋষির আশ্রমের নিকটে এসে নৌকা বাঁধল, আর বৃদ্ধা তার নিজের কন্যাকে পাঠাল ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে।

রামায়ণে এই গল্প একটু অন্য রকম। লোমপাদের মন্ত্রীরা যে বারাঙ্গনাদের পাঠিয়েছিলেন, তারা আশ্রমের নিকটেই অবস্থান করছিল। একদিন ঋষ্যশৃঙ্গ সেখানে এসে উপস্থিত হলে বিচিত্র-বেশা প্রমদারা মধুর স্বরে গান গাইতে গাইতে তাঁর কাছে এসে পরিচয় জানতে চাইল। পরিচয় দিয়ে ঋষ্যশৃঙ্গ তাদের নিজের আশ্রমে নিয়ে গিয়ে পাদ্য অর্ঘ্য ফলমূল দিয়ে সমাদর করলেন। তারাও তাদের ফলমূল ও পানীয় দিয়ে ঋষিকুমারকে আলিঙ্গন করে পালিয়ে এল। ঋষ্যশৃঙ্গ তাদের বিরহে কাতর হয়েছিলেন, এবং পর দিন আবার তাদের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। বারাঙ্গনারা তাঁকে তাদের আশ্রমে নিয়ে যাবার নাম করে নগরের দিকে নিয়ে গেল।

মহাভারতের কাহিনী আমার বেশি ভাল লাগল। এমন সহজ স্নিগ্ধ কাহিনী আমি অন্যত্র পড়ি নি।

মহাভারতের মেয়েটি একা এসেছিল ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে। বলেছিল, আমি আপনাদের দেখতে এসেছি। আপনারা সুখে আছেন তো, অভাব নেই তো কোনও?

ঋষ্যশৃঙ্গ তখনও পুরুষ ও নারীতে প্রভেদ জানেন না। বললেন,

মহাশয়, আপনি তেজঃপুঞ্জের মতো প্রকাশিত, আপনি যে আমার বন্দনীয় তাতে সন্দেহ নেই। আপনি এই কৃষ্ণাজিনাবৃত কুশের আসনে উপবেশন করুন, আমি পাদ্য ও ফলমূল দিয়ে আপনার সৎকার করি।

তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার আশ্রম কোথায়? আপনি দেবতার মতো কোন্ ব্রতানুষ্ঠান করছেন?

নিপুণা বারাঙ্গনা বলল, আমার আশ্রম এই ত্রিযোজন বিস্তীর্ণ পর্বতের অপর পারে। আমাকে ক্ষমা করবেন, অন্যের অভিবাদন ও পাদ্যোদক গ্রহণ আমার ধর্ম নয়, আমার ব্রত নিয়মে আমিই আপনাকে অভিবাদন ও আলিঙ্গন করব।

ঋষ্যশৃঙ্গ বললেন, আপনার উপযোগের জন্য আমি এই সুপক্ক ভল্লাতক আমলক করূষক ইঙ্গুদ ধন্বন ও প্রিয়লক ফল দিচ্ছি।

বারাঙ্গনা তার পরিবর্তে অমূল্য সুস্বাদু খাদ্য, সুরভি মালা, বিচিত্র বসন ও সুরস পানীয় প্রদান করল। তারপর আশ্রমের উপকণ্ঠে ফলভারে অবনত লতার মতো কন্দুক নিয়ে নানা খেলায় মেতে উঠল। আহ্লাদে হাস্যপরিহাসে কুসুমিত সর্জ অশোক ও তিলক তরু অবনত ও ভঙ্গ করে গায়ে গা মিলিয়ে ও গাঢ় আলিঙ্গন করে মদাভিভূতা লজ্জমানার ন্যায় ঋষ্যশৃঙ্গের মনোহরণ করল। তারপর তাঁকে বিকৃত চিত্ত দেখে অগ্নিহোত্র হোম করবার নামে কটাক্ষপাত করে প্রস্থান করল।

বিভাণ্ডক ঋষি আশ্রমে ফিরলেন। সিংহের ন্যায় পিঙ্গলাক্ষ ও তাঁর সর্ব দেহ রোমাবৃত। দৃষ্টিপাত মাত্রই বুঝতে পারলেন যে নিয়মে আজ ব্যতিক্রম হয়েছে। পুত্র আজ সমিধ আহরণ করে নি, নির্মল করে নি স্রুকস্রুব, হোমধেনু পীতবৎসা হয়ে আছে। তার পরিবর্তে সে আজ একান্তে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, বড় দীন বিচেতন দেখাচ্ছে তাকে! ঋষি প্রশ্ন করলেন, বৎস, আশ্রমে আজ কে এসেছিলেন?

ঋষ্যশৃঙ্গ পিতার নিকট অকপটে সব ব্যক্ত করলেন। বললেন, আজ এক দেবকুমারের মতো ব্রহ্মচারী আমাদের আশ্রমে এসেছিলেন। তিনি নাতিদীর্ঘ নাতিখর্ব। সোনার মতো তাঁর দেহের বর্ণ, পদ্মের মতো আয়ত ও স্নিগ্ধ চোখ। অপরূপ রূপ, প্রভা সূর্যের মতো, মাথায় তাঁর দীর্ঘ নীল নির্মল জটা স্বর্ণসূত্রে গাঁথা সুরভিত। আকাশের বিদ্যুতের মতো তাঁর গলায় কী যেন বিলম্বিত, তারই নিচে দুটি রোমহীন মনোহর পিণ্ড। সুন্দর চীরাবৃত ক্ষীণ কটিতে হিরণ্ময় মেখলা। তাঁর পায়ে ও হাতে আমার অক্ষমালার মতো এক মুখর বস্তু। সামান্য সঞ্চালনে শিঞ্জিত হচ্ছিল। কোকিলের মতো তাঁর কণ্ঠস্বর, তাঁর কথা শুনে আমার আনন্দ হচ্ছিল। তিনি আমাকে আলিঙ্গন করে আমার জটা ধরে মাথা অবনত করে মুখে মুখ রেখে এক রকম শব্দ করেছিলেন, তাতে আমার দেহ পুলকিত হয়েছিল।

বিভাণ্ডক পরম বিস্ময়ে এই সরল পুত্রের কথা শুনছিলেন। বুঝতে পারছিলেন যে কোন বারাঙ্গনা তাঁর আশ্রমে এসেছিল তাকে প্রলুব্ধ করতে। ঋষ্যশৃঙ্গ বলে চললেন, পিতা, তিনি আমাকে যে ফল খেতে দিয়েছিলেন, তা বড়ই সুস্বাদু। তাঁর দেওয়া জল পান করে আমার হর্ষ হল, এই পৃথিবীকে কম্পমান মনে হল। এই সব সুগন্ধ মালা ফেলে রেখে তিনি নিজের আশ্রমে ফিরে গেছেন। আমি তাঁর বিরহে বড় কাতর হয়েছি, আমার দেহ যেন দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

ঋষ্যশৃঙ্গ জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর ব্রহ্মচর্য কী রকম পিতা? আমি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁরই সঙ্গে তপস্যা করতে চাই।

উত্তরে বিভাণ্ডক বললেন, বৎস, রাক্ষসেরা এই রকম রূপ ধারণ করে আমাদের তপস্যায় বিঘ্ন ঘটায়। তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা আমাদের উচিত নয়। তুমি যা পান করেছ তা সুরা। সুরা ও এই সুরভি মালা মুনিদের ভোগের বস্তু নয়।

এই কথা বলে বিভাণ্ডক সেই বারাঙ্গনার অনুসন্ধানে নির্গত হলেন। কিন্তু তার দেখা না পেয়ে তিন দিন পরে আশ্রমে ফিরলেন। তারপর আবার যখন ফল আহরণে বাহির হলেন, তখন সেই বারাঙ্গনা এসে আশ্রমে উপস্থিত হল। ঋষ্যশৃঙ্গ খুশী হয়ে বলে উঠলেন, চলুন, আমার পিতা ফিরে আসবার আগেই আপনার আশ্রমে যাই।

এই বলেই দুজনে বেরিয়ে পড়লেন।

ঋষ্যশৃঙ্গ নৌকায় এসে উপস্থিত হলে বারাঙ্গনারা তাঁকে নানা উপায়ে ভুলিয়ে অঙ্গ দেশের রাজধানী চম্পার দিকে নিয়ে চলল।

ঋষ্যশৃঙ্গ যখন অঙ্গরাজের অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন, তখনই প্রবল বারিপাত হল। রাজা লোমপাদ সানন্দে তাঁর পালিতা কন্যা শান্তাকে তাঁর হাতে সম্প্রদান করলেন।

এদিকে বিভাণ্ডক ঋষিও তাঁর আশ্রমে ফিরে তাঁর পুত্রকে দেখতে পেলেন না। অনুমান করলেন যে অঙ্গরাজ লোমপাদই এর জন্য দায়ী। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি তাঁর রাজধানী চম্পার উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

অঙ্গরাজ আগেই সতর্ক হয়েছিলেন। তাঁর প্রজাদের শিখিয়ে রেখেছিলেন ঋষিকে সসম্মানে সৎকার করবার জন্য। সারাদিন পথ চলার পরে ক্ষুধার্ত ঋষি যখন শ্রান্ত দেহে এক গোপ পল্লীতে উপস্থিত হলেন, তখন গোপরা তাঁকে রাজার মতো আদর আপ্যায়ন করল। ঋষি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কার প্রজা? রাজার কথা মতো তারা উত্তর দিল, আপনার পুত্রের। ঋষি খুশী হয়ে বললেন, সত্যি নাকি!

রাজাও তাঁকে মহাসমাদরে গ্রহণ করলেন। বিভাণ্ডক তাঁর ক্রোধ বিস্মৃত হয়ে পুত্র ও পুত্রবধূকে আশীর্বাদ করে ফিরে গেলেন।

পিতার আদেশে ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গরাজ্যে কিছুকাল কাটালেন।

তারপর এক পুত্রের জন্মলাভের পর পিতার আশ্রমে ফিরে এলেন।

মহাভারতে গল্পের শেষ এইখানে। কিন্তু রামায়ণে আরও একটু কাহিনী আছে। পুত্র-কামনায় অযোধ্যার রাজা দশরথ যে যজ্ঞ করেছিলেন, সেই যজ্ঞে ঋষ্যশৃঙ্গ এসেছিলেন প্রধান যাজক রূপে। দশরথ সপরিবারে তাঁর বন্ধু লোমপাদের কাছে গিয়ে বলেছিলেন, আপনার কন্যা জামাতাকে অযোধ্যায় নিয়েযেতে চাই। লোমপাদ তখনই জামাতাকে অনুরোধ করে তাঁকে সম্মত করান।

দশরথ নিজে সঙ্গে করে ঋষ্যশৃঙ্গ ও শান্তাকে অযোধ্যায় এনেছিলেন। এঁদের সংবর্ধনার জন্য সমস্ত নগর সুসজ্জিত হয়েছিল। সবাই সুখী হয়েছিল এঁদের আগমনে।

ঋষ্যশৃঙ্গ অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রধান যাজক হয়েছিলেন। তারপর তিনি অথর্বোক্ত মন্ত্রে পুত্রীয়েষ্টি করেছিলেন। যজ্ঞাগ্নি থেকে এক প্রভান্বিত পুরুষ উত্থিত হয়ে হিরণ্ময় পাত্রে পায়স দিয়েছিলেন। সেই পায়স খেয়ে দশরথের মহিষীরা বিষ্ণুর মা হবার গৌরব অর্জন করলেন।

মহাভারত বন্ধ করে আমি ঋষ্যশৃঙ্গের কথা ভাবছিলাম। সেই সরল সুকুমার তরুণ ঋষির কথা। মা নেই, নিঃসঙ্গ পিতার কাছে একাকী মানুষ হয়েছেন। আশ্রমের বাহিরে বিরাট পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় নি। তাই সেদিন তাঁকে প্রলুব্ধ করবার জন্য যখন এক বারাঙ্গনা এল তাঁদের আশ্রমে, ঋষ্যশৃঙ্গ তাকে দেব-কুমার বলে মনে করলেন। বিস্মিত হলেন তার রূপে ও আচরণে।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস লিখলেন ঋষ্যশৃঙ্গের কথা, আর সেই বারাঙ্গনার কথা লিখলেন রবীন্দ্রনাথ। 'পতিতা' কবিতাটি আমার খুব ভাল লাগত, অনেক লাইন আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। আজ তা আবার মনে পড়ল।

ধন্য তোমারে হে রাজমন্ত্রী,
চরণপদ্মে নমস্কার।
লও ফিরে তব স্বর্ণমুদ্রা,
লও ফিরে তব পুরস্কার।
ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিরে ভুলাতে
পাঠাইলে বনে যে কয়জনা
সাজায়ে যতনে ভূষণে রতনে,—
আমি তারি এক বারাঙ্গনা।
দেবতা ঘুমালে আমাদের দিন
দেবতা জাগিলে মোদের রাতি,
ধরার নরক সিংহদুয়ারে
জ্বালাই আমরা সন্ধ্যাবাতি।
তুমি অমাত্য রাজ-সভাসদ
তোমার ব্যবসা ঘৃণ্যতর
সিংহাসনের আড়ালে বসিয়া
মানুষের ফাঁদে মানুষ ধর।

অন্য বারাঙ্গনারা যখন ঋষিকুমারের সঙ্গে খেলায় মত্ত, তখন এই মেয়েটি তাঁকে দূর থেকে দেখেছে। তারপর তাদের হাসিতে যখন ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে ঋষির অন্তরে, তখনই সে এগিয়ে এসেছে।—

প্রথম রমণী-দরশ মুগ্ধ
সে দুটি সরল নয়ন হেরি
হৃদয়ে আমার নারীর মহিমা
বাজায়ে উঠিল বিজয় ভেরী।…
…জননীর স্নেহ রমণীর দয়া
কুমারীর নব নীরব প্রীতি
আমার হৃদয়-বীণার তন্ত্রে
বাজায়ে তুলিল মিলিত গীতি।
কহিলা কুমার চাহি মোর মুখে,
"কোন্ দেব আজি আনিলে দিবা।

তোমার পরশ অমৃত সরস
তোমার নয়নে দিব্য বিভা।”

বারাঙ্গনার জীবনে এ একেবারে নূতন কথা।—

মধু রাতে কত মুগ্ধ হৃদয়
স্বর্গ মেনেছে এ দেহখানি,—
তখন শুনেছি বহু চাটু কথা,
শুনি নি এমন সত্যবাণী।...
...আমিও দেবতা, ঋষির আঁখিতে
এনেছি বহিয়া নূতন দিবা,
অমৃত সরস আমার পরশ,
আমার নয়নে দিব্য বিভা।
আমি শুধু নহি সেবার রমণী
মিটাতে তোমার লালসা ক্ষুধা।
তুমি যদি দিতে পূজার অর্ঘ্য
আমি সঁপিতাম স্বর্গ সুধা।
দেবতারে মোর কেহ তো চাহে নি
নিয়ে গেল সবে মাটির ঢেলা,
দূর দুর্গম মনোবনবাসে
পাঠাইল তাঁরে করিয়া হেলা।

কিন্তু ঋষি ভুল করেন নি।—

দেবতারে তুমি দেখেছ, তোমার
সরল নয়ন করে নি ভুল।
দাও মোর মাথে, নিয়ে যাই সাথে
তোমার হাতের পূজার ফুল।

তারপর আর কোন দুঃখ নেই।—

একদিন তার পূজা হয়ে গেলে
চিরদিন তার বিসর্জন,
খেলার পুতলি করিয়া তাহারে
আর কি পূজিবে পৌরজন?

পাঁচ

মরীচিরত্র্যাঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহ ক্রতুঃ।
ব্রহ্মণোমানসাঃ পুত্রা বশিষ্ঠশ্চেতি সপ্ত তে ॥

অত্রি সপ্তর্ষির অন্যতম, ব্রহ্মার মানস পুত্র, তাঁর চক্ষু থেকে ইনি উৎপন্ন হয়েছিলেন। কর্দম ঋষির কন্যা অনসূয়া তাঁর পত্নী, এবং দত্তাত্রেয় দুর্বাসা ও সোম তাঁদের পুত্র।

গুরুজী বলেছিলেন : মরীচির মতো অত্রির পরিচয়ও বড় সংক্ষিপ্ত।

কিন্তু সংক্ষিপ্ত বলে যে এত সংক্ষিপ্ত এ কথা আমরা ভাবতে পারি নি। আমাদের চোখে কৌতূহল দেখে বললেন : ইনি একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। বেদে তাঁর রচিত অনেকগুলি মন্ত্র আছে, এবং ঋগ্বেদের এক জায়গায় তাঁর নামের উল্লেখ আছে পঞ্চ জাতির ঋষি নামে। একটি ঋকে যদু তুর্বশ দ্রুহ্যু অনু ও পুরু এই পাঁচটি বংশের নাম দেখে মনে হয় যে অত্রি এদেরই পুরোহিত ছিলেন। ইনি স্মৃতিগ্রন্থ-প্রণেতা সংহিতাকার।

তাঁর সন্তান লাভের বিষয়ে ভাগবত বিষ্ণুপুরাণ ও মৎস্যপুরাণে একটি গল্প প্রচলিত আছে। পুত্র লাভের আশায় তিনি সস্ত্রীক এক পর্বতে গিয়ে তপস্যা করতে শুরু করেন। তাঁদের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর দর্শন দিয়ে বরদান করেন। ব্রহ্মার অংশে সোম, বিষ্ণুর অংশে দত্তাত্রেয় ও শিবের অংশে দুর্বাসা— অত্রি-অনসূয়া এই তিন পুত্র লাভ করেন।

ত্রিমূর্তিকে পুত্ররূপে পাবার আরও দুটি গল্প আছে। সে অত্রিমুনির তপস্যায় নয়, অনসূয়ার জন্য। অসূয়া বা ঈর্ষা-দ্বেষহীন বলে নাম অনসূয়া। পুরাণান্তরে অনসূয়াকে আমরা দক্ষ

প্রজাপতি ও প্রসূতির কন্যারূপে পাই। একদিন তাঁর সতীত্ব পরীক্ষার নিমিত্ত ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর ব্রাহ্মণের বেশে অত্রির আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। অত্রি তখন অনুপস্থিত। অনসূয়া অতিথিদের সৎকারের আয়োজন করতে যাচ্ছিলেন। দেবতারা তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, পুত্ররূপে তাঁদের সেবার ব্যবস্থা করলেই তাঁরা আতিথ্য গ্রহণে সক্ষম। এই ব্রাহ্মণদের পুত্ররূপে কল্পনা করা অসম্ভব ভেবে অনসূয়া তাঁদের দেহে স্বামীর পাদোদক ছিটিয়ে দিলেন, বললেন, বালো ভব, অর্থাৎ শিশু হও। ত্রিমূর্তি তখনই শিশুতে পরিণত হলেন, আর বাৎসল্য রসে অনসূয়ার বুকে দুধের ধারা এল। দেবতারা তাঁর স্তন্য পান করে শুধু বিস্মিত নন, তৃপ্তও হলেন। এবং নিজ মূর্তি ধারণ করে বর দিতে চাইলেন। অনসূয়া তাঁদের পুত্ররূপে প্রার্থনা করলেন। তাঁরা রাজী হলেন। ব্রহ্মা সোম রূপে, বিষ্ণু দত্তাত্রেয় রূপে ও মহেশ্বর দুর্বাসা রূপে অনসূয়ার কোল আলো করলেন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে এই কাহিনী একটু অন্য রকম। সে এক কুষ্ঠরোগী ব্রাহ্মণের কাহিনী। সেই ব্রাহ্মণের পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীর সেবায় দিনপাত করতেন। একদিন সেই ব্রাহ্মণ তাঁকে এক পতিতা নারীর কাছে নিয়ে যাবার জন্য স্ত্রীকে অনুরোধ করলেন। সেই সাধ্বী স্ত্রী চলচ্ছক্তিহীন স্বামীকে কাঁধে করে সেই পতিতার গৃহের দিকে রওনা হলেন। এই পথের ধারেই ছিলেন শূলবিদ্ধ অণীমাণ্ডব্য ঋষি।

অণীমাণ্ডব্য ঋষির কথা গুরুজী আমাদের পরে বলেছিলেন। তা না হলে আমরা আসল গল্পের খেই হারিয়ে ফেলতাম।

অণীমাণ্ডব্য ঋষির গায়ে ব্রাহ্মণের পা লাগল। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি শাপ দিলেন যে সূর্যোদয়ের পর ব্রাহ্মণ আর বাঁচবেন না। ব্রাহ্মণের স্ত্রী বেদনার্ত হয়ে বললেন, তবে সূর্যের উদয় আর হবে না। তাই হল। পতিব্রতা নারীর ইচ্ছায় প্রভাতে সূর্যোদয় হল না।

অন্ধকারে আবৃত হয়ে রইল সমস্ত পৃথিবী। সৃষ্টি রসাতলে যাবার উপক্রম হল। ভয় পেয়ে দেবতারা গেলেন ব্রহ্মার কাছে। ব্রহ্মা বললেন, এ সতীর মাহাত্ম্য, পরিত্রাণের জন্য তাঁরই শরণ নিতে হবে।

দেবতারা অনসূয়ার কাছে এসে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করলেন। অনসূয়া সেই ব্রাহ্মণের স্ত্রীর কাছে গিয়ে বললেন, সূর্যোদয়ে আপনি আর অমত করবেন না, আপনার স্বামীর মৃত্যু হলে আমি তার ব্যবস্থা করব। ব্রাহ্মণী মত দিলেন, সূর্যোদয় হল। তারপর ব্রাহ্মণের মৃত্যু হলে অনসূয়া তাঁকে নবজীবন দান করলেন।

দেবতারা অনসূয়াকে বর দিতে চাইলেন। অনসূয়া সেই বর প্রার্থনা করলেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে পুত্ররূপে চাই। পেলেন দত্তাত্রেয় দুর্বাসা ও সোমকে।

গুরুজী বললেন: অত্রি অনসূয়ার উল্লেখ আছে রামায়ণে। চিত্রকূট পর্বতে ছিল অত্রির আশ্রম। বনবাসী রাম লক্ষ্মণ ও সীতাকে নিয়ে তাঁর আশ্রমে অতিথি হয়েছিলেন। অনসূয়া তখন অতিশয় বৃদ্ধ হয়েছেন। পক্ক কেশ শিথিল দেহ বলিরেখাঙ্কিত। অত্রি তাঁকে সীতাকে গ্রহণ করতে বললেন। তারপর রামকে বললেন, বৎস, দশ বৎসর অনাবৃষ্টির ফলে পৃথিবী যখন দগ্ধ হচ্ছিল, অনসূয়া তখন তাঁর তপস্যার প্রভাবে গঙ্গাকে প্রবাহিত করে ফলমূল উৎপন্ন করেছিলেন।

সীতার ধর্মজ্ঞান দেখে অনসূয়া সুখী হয়েছিলেন। তাঁকে দিব্য বরমাল্য বস্ত্র আভরণ অঙ্গরাগ ও গন্ধানুলেপন দিয়ে বললেন, এই সমস্ত ধারণ করে স্বামীর শ্রীবৃদ্ধি কর। নিত্য ব্যবহারেও এ জিনিষ ম্লান হবে না।

এ বাল্মীকি রামায়ণের কথা। তুলসীদাসের রামচরিতমানসে অনসূয়ার অপূর্ব উপদেশের কথাও আছে।—

মাতু পিতা ভ্রাতা হিতকারী।
মিতপ্রদ সব সুনু রাজকুমারী॥

অমিতদানি ভর্তা বৈদেহী।
অধম সো নারি জো সেব ন তেহী ॥

শোন রাজকুমারী, বাপ মা ভাই ও হিতকারীরা যা দিতে পারেন তার সীমা আছে, কিন্তু হে বৈদেহি, স্বামী অমিত দাতা বলে জেনো, তাঁর দানের কোন সীমা নেই। সেই স্বামীর সেবা যে করে না, সে নারী অধম।

ধীরজু ধরম মিত্র অরু নারী।
আপদকাল পরখিয় হি চারী ॥

শুধু আপদকালেই ধৈর্য ধর্ম মিত্র ও নারীর পরীক্ষা হয়।

একই ধরম এক ব্রত নেমা।
কায় বচন মন পতিপদ প্রেমা ॥

স্ত্রীর একমাত্র ধর্ম ও ব্রত হল কায়মনোবাক্যে পতিপ্রেম।

পতি প্রতিকূল জনম জহঁ জাঈ।
বিধবা হোই পাই তরুনাঈ ॥

এ জীবনে যে স্ত্রী পতির প্রতিকূল আচরণ করে, পরজন্মে সে যৌবনেই বিধবা হয়।

রামচরিতমানস আমি তাউজীর কাছে পেয়েছিলাম। তিনিই আমাকে এই পরিচ্ছেদটা পড়তে বলেছিলেন। উপরের শ্লোকগুলি আমি তাঁর বই থেকেই টুকে রেখেছিলাম। আরও অনেক শ্লোক আছে। আছে চার প্রকার নারীর পরিচয়। উত্তম স্ত্রীর স্বপ্নেও মনে থাকে যে নিজের স্বামী ছাড়া জগতে আর কোন পুরুষ নেই। মধ্যম স্ত্রী পরের স্বামীকে নিজের ভাই বা ছেলের মতো দেখে। ধর্মের খাতিরে যে স্ত্রী কুলে থাকে, সে নিকৃষ্ট। আর যে সুযোগের অভাবে বা ভয়ে বেঁচে যায়, সে অধম। নিজের স্বামীর সঙ্গে যে ছলনা করে ও পরের স্বামীর সঙ্গে প্রেম করে, তার ভাগ্যে শত কল্প রৌরব নরক।

অত্রি-অনসূয়ার কাহিনী শেষ করে গুরুজী আমাদের অণীমাণ্ডব্য ঋষির গল্প বললেন। এই মৌন ঋষিকে রাজা শূলে চড়িয়েছিলেন।

একদিন তিনি নিজের আশ্রমে যোগাসীন ছিলেন। এই সময় এক দল চোর তাঁর আশ্রমে এসে লুকোয়। নগরপালরা তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করে কোন উত্তর পায় না। আর সুযোগ বুঝে চোরেরা জিনিষপত্র ফেলে পালিয়ে যায়। নগরপালেরা ঋষিকেই চোরদের আশ্রয়দাতা ভেবে রাজসভায় ধরে নিয়ে যায়। বিচারে রাজা তাঁকে শূলে চড়ান। শূলের উপরে চোরদের মৃত্যু হল, কিন্তু ঋষি বেঁচে রইলেন। এই সময়েই এক অন্ধকার রাতে সেই ঘটনাটি ঘটেছিল। দেহে পা লেগেছিল বলে ব্রাহ্মণকে তিনি শাপ দিয়েছিলেন।

এক ঋষিকে শূলে চড়িয়েছেন জানতে পেরে রাজা এসে তাঁকে শূল থেকে নামিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। প্রসন্ন মনেই ঋষি তাঁকে ক্ষমা করেন। শূলের একটা অংশ ঋষির দেহে থেকে গিয়েছিল বলে মাণ্ডব্য ঋষির নাম হয়েছিল অণীমাণ্ডব্য।

এই ঘটনার পরে তিনি যমের নিকটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কোন্ পাপে তাঁর এই শাস্তি হল। যম বললেন, শৈশবে আপনি একটি পতঙ্গের দেহে তৃণ ঢুকিয়েছিলেন, এ সেই পাপেরই শাস্তি। লঘুপাপে গুরুদণ্ড বলে ঋষি যমকে শাপ দিলেন যে তাঁর শূদ্র জন্ম হবে। আর এই নিয়ম করেন যে বারো বৎসরের পূর্বে কোন অজ্ঞানকৃত পাপের জন্য দণ্ড হবে না।

ঋষির শাপে যম বিদুর রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

তারপর সোমের কথা। ব্রহ্মা সোম রূপে অনসূয়ার কোলে এসেছিলেন। কিন্তু পুরাণে তিনি দেবতা নামে পরিচিত। তাঁর গল্প দেবতার কথায় বলা হয়েছে।

বৃহস্পতির স্ত্রী তারা হরণের কাহিনী আমার মনে পড়ল। অশ্বমেধ যজ্ঞ করবার পর অহংকারে মত্ত হয়ে সোম এই দুষ্কর্ম করেছিলেন। এই নিয়ে এক ভীষণ যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল। দৈত্যেরা

এসে সোমের পক্ষে যোগ দিয়েছিল, আর দেবতারা গুরু বৃহস্পতির পক্ষে। মহাদেবের শূলের আঘাতে সোম প্রাণ হারাতেন, কিন্তু ব্রহ্মা এসে তাঁকে রক্ষা করেন। বিবাদ মিটিয়ে তারাকে গুরু বৃহস্পতির নিকট ফিরিয়ে দেন। এই সোম অত্রি-অনসূয়ার পুত্র। অনসূয়া ব্রহ্মাকেই পুত্র রূপে পেয়েছিলেন।

বিষ্ণু এসেছিলেন দত্তাত্রেয় রূপে। একদা উদ্ধত হৈহয় পতি অত্রির অবমাননা করতে চেয়েছিলেন। ক্রুদ্ধ হয়ে দত্তাত্রেয় সপ্তম দিনেই অনসূয়ার গর্ভ থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। অল্প বয়সেই তিনি ভোগ বিলাস পরিত্যাগ করে যোগস্থ হন। তিনি ঋষিকুমারে পরিবৃত হয়ে যোগসাধন করতেন। কিছুদিন পরে তাঁর সংসার ত্যাগের বাসনা হল। তিনি এক সরোবরের জলে গিয়ে বহুকাল ডুবে রইলেন। কিন্তু ঋষিকুমারেরা তাঁকে পরিত্যাগ করে গেলেন না। তাঁরা সরোবরের তীরে দাঁড়িয়ে তাঁর অপেক্ষা করতে লাগলেন। তাঁদের ছলনা করবার জন্য দত্তাত্রেয় এক সুন্দরী নারীকে নিয়ে জল থেকে উঠে এলেন, তারপর মদ খেয়ে তার সঙ্গে নৃত্যগীত শুরু করলেন। ঋষিকুমারেরা তাতে বিচলিত হলেন না, ভাবলেন, দত্তাত্রেয় মহাপুরুষ, তাঁর আসক্তিহীন কোন কর্মে দোষ নেই।

রাজা কার্তবীর্যার্জুন সিংহাসন আরোহণে অস্বীকার করেছিলেন। তারপর দত্তাত্রেয়র উপদেশে সিংহাসনে বসেন।

একদা জম্ভাসুর দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁদের পরাজিত করে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করেন। বৃহস্পতির আদেশে তাঁরা দত্তাত্রেয়র আশ্রমে এসে আশ্রয় নেন। দত্তাত্রেয় তাঁদের আবার যুদ্ধ করতে পরামর্শ দেন। কিন্তু দৈত্যদের মার খেয়ে তাঁরা দত্তাত্রেয়র আশ্রমে পিছিয়ে আসেন। দৈত্যরা তাঁদের মারতে মারতে আশ্রমে এসেই থমকে দাঁড়াল। দত্তাত্রেয়র পাশে লক্ষ্মী। লক্ষ্মীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তারা যুদ্ধ ফেলে তাঁকে শিবিকায় তুলে নিয়ে

গেল। দত্তাত্রেয় হেসে দেবতাদের বললেন, তোমাদের জয় হল তো? লক্ষ্মী যখন দৈত্যদের সপ্তাঙ্গ ত্যাগ করে মাথায় উঠেছেন, তখন নিশ্চয়ই তাদের ত্যাগ করবেন। দেবতারা এই কথা শুনে উৎসাহ পেয়ে দৈত্যদের আক্রমণ করে বিনষ্ট করল। লক্ষ্মীও তাদের মাথা থেকে নেমে দত্তাত্রেয়র পাশে ফিরে এলেন।

গুরুজী বললেনঃ এ সবই পুরাণের গল্প। যা নয়, তা হল কয়েকখানি শাস্ত্র গ্রন্থ। দত্তাত্রেয়র নামে অনেকগুলি গ্রন্থ প্রচলিত আছে, কিছু তান্ত্রিক গ্রন্থও।

শুনে আমরা আশ্চর্য হলাম যে জৈনরাও দত্তাত্রেয়র পূজা করেন।

পরে সুপ্তি আমাকে বলেছিল যে পুষ্করে ব্রহ্মার মন্দিরে সে দত্তাত্রেয়র মর্মর মূর্তি দেখেছে। এ রকম মূর্তি আর কোথায় আছে, তার জানা নেই।

দত্তাত্রেয়র পুত্রের নাম নিমি। পুরাণে যে নিমির কাহিনী পাওয়া যায় তিনি সূর্যবংশীয় রাজা ইক্ষ্বাকুর পুত্র, দত্তাত্রেয়র পুত্র নন।

অত্রির তৃতীয় পুত্রের নাম দুর্বাসা। শিবের অংশে তাঁর জন্ম। তিনি শুধু কোপন স্বভাবের ছিলেন না, উন্মত্তবৎ ছিলেন। তাঁর আচার ব্যবহার ও ক্রিয়া কর্মের বিশ্লেষণ করলে বুঝতে বাকি থাকে না যে মানুষটির রাগের মতো পাগলামিও বেশি ছিল। তিনি ঔর্ব মুনির কন্যা কন্দলীকে বিবাহ করেছিলেন। মহাভারতের আদি পর্বে ঔর্বর গল্প আছে, আর কন্দলীর কাহিনী আছে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে। এই কন্যা অত্যন্ত কলহপ্রিয় ছিলেন। তাই সম্প্রদানের সময় পিতা তাঁর জামাতা দুর্বাসাকে অনুরোধ করেছিলেন, বৎস, এই কন্যার শত অপরাধ ক্ষমা ক'রো।

দুর্বাসা গুণে গুণে তাঁর স্ত্রীর এক শো অপরাধ ক্ষমা করেছিলেন, তার পরের বার বলেছিলেন, ভস্ম হও।

স্বামীর শাপে ভস্ম হবার পর কন্দলী আর মানুষ হয়ে জন্মালেন না, জন্মালেন কলাগাছ হয়ে। কিন্তু ঔর্ব মুনি কন্যার শোকে দুর্বাসাকে শাপ দিলেন, তুমি হতদর্প হবে।

পরবর্তী জীবনে এই শাপ সত্য হয়েছিল। রাজা অম্বরীষের নিকট তাঁকে ক্ষমা ভিক্ষা করতে হয়েছিল।

অম্বরীষ তাঁকে আতিথ্য গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন। দুর্বাসা এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেও যথা সময়ে উপস্থিত হলেন না। উপবাসী রাজার পারণের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। ব্রাহ্মণদের উপদেশে তিনি পারণ আরম্ভ করতেই দুর্বাসা এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর জন্য অপেক্ষা করা হয় নি দেখে তিনি ক্রোধে অজ্ঞান হয়ে নিজের জটা ছিঁড়ে এক ভয়ংকর পুরুষের সৃষ্টি করেন। সেই পুরুষ রাজাকে যখন বিনাশ করতে যাচ্ছিল, তখন কৃষ্ণ সহ্য করতে পারলেন না। সুদর্শন চক্র দিয়ে সেই পুরুষকে হত্যা করে দুর্বাসাকেও বিনাশ করতে উদ্যত হলেন। দুর্বাসা নিজের ভুল বুঝতে পেরে রাজা অম্বরীষের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। দুর্বাসার দর্প নাশ হল।

দুর্বাসা অনেককে শাপ দিয়েছেন। দেবরাজ ইন্দ্রও তাঁর কাছে অব্যাহতি পান নি। তাঁরই শাপে ইন্দ্রকে শ্রীভ্রষ্ট হতে হয়। একদা দুর্বাসা যখন অরণ্য পথে যাচ্ছিলেন, তখন স্বর্গের অপ্সরারা একখানি সন্তানক মালা তাঁর হাতে দেন। ইন্দ্রকে দেখতে পেয়ে ঋষি সেই মালা ইন্দ্রকে দান করেন। ইন্দ্র ঐরাবতের কুম্ভে সেই মালাটি স্থাপন করেছিলেন। শুঁড় দিয়ে মালা নামিয়ে ঐরাবত তা পদদলিত করে। দুর্বাসা এতে অপমানিত বোধ করে ইন্দ্রকে শাপ দেন যে তিনি শ্রীভ্রষ্ট হবেন। লক্ষ্মী তাঁকে ত্যাগ করে পাতালে প্রবেশ করেছিলেন। তারপর সমুদ্র মন্থনের গল্প। সে গল্প আছে দেবতার কথায়।

শকুন্তলাকে শাপ দেবার কথা আমরা পড়েছিলাম। শকুন্তলা যখন দুষ্মন্তের কথা ভাবছিল, তখন দুর্বাসার আগমনের কথা জানতে

পারে নি। ঋষি তাই শাপ দিয়েছিলেন যে যার কথা সে ভাবছে সে তাকে ভুলে যাবে। মহাভারতে এ গল্প নেই। আছে কালিদাসের কাব্যে। রাজা দুষ্মন্তের দুষ্কৃতিকে সমর্থন করবার জন্য কবিকে এই অভিশাপের আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

আরও একটি গল্প মহাভারতে নেই। শৈশবে শুনেছিলাম যে দুর্বাসা যখন দ্বারকায় গিয়েছিলেন, তখন যাদবেরা কৃষ্ণের পুত্র শাম্বকে মেয়ে সাজিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, তার ছেলে হবে না মেয়ে। সর্বজ্ঞ ঋষি তাদের রসিকতা বুঝতে পেরে বলেছিলেন, মুষল হবে, আর সেই মুষলে যদু বংশ ধ্বংস হবে। তাই হয়েছিল। কিন্তু মহাভারতে এই গল্প দেখি বিশ্বামিত্র কণ্ব ও নারদ মুনির সম্বন্ধে। এই তিনজনে যখন দ্বারকায় এসেছিলেন, তখনই ঘটনাটা ঘটেছিল।

দুর্বাসার খামখেয়ালিপনার গল্পও একাধিক। একবার তিনি দশ হাজার শিষ্য নিয়ে দুর্যোধনের কাছে এসেছিলেন, এবং রাজার অনুরোধে কয়েক দিন তাঁর আতিথ্য স্বীকার করেন। দুর্বাসা কোন দিন বলতেন, আমি খুব ক্ষুধার্ত, এখনই অন্ন দাও। বলে স্নান করতে গিয়ে অত্যন্ত দেরিতে ফিরতেন। আবার কোন দিন বলতেন, আজ কিছু খাব না, একেবারে ক্ষুধা নেই। তারপর হঠাৎ এসে বলতেন, এখনই খাব। কোন দিন বা মধ্যরাত্রে উঠে অন্ন প্রস্তুত করতে বলতেন। তারপর কিছু না খেয়েই সকলকে ভর্ৎসনা করতেন। আপ্রাণ চেষ্টায় দুর্যোধন তাঁকে তুষ্ট করলেন। যাবার সময় ঋষি বললেন, তুমি বর চাও।

যুধিষ্ঠিরকে বিপদে ফেলবার জন্য দুর্যোধন আগেই পরামর্শ করে রেখেছিলেন। ঋষির কথা শুনে বললেন, আমার বড় ভাই যুধিষ্ঠির এখন বনবাসী। আপনি একবার তাঁর আতিথ্য স্বীকার করুন। সকলের আহারের পরে দ্রৌপদী যখন নিজে খেয়ে দুপুরে বিশ্রাম করবেন, আপনি সেই সময়ে সেখানে যাবেন।

স্বামীর শাপে ভস্ম হবার পর কন্দলী আর মানুষ হয়ে জন্মালেন না, জন্মালেন কলাগাছ হয়ে। কিন্তু ঔর্ব মুনি কন্যার শোকে দুর্বাসাকে শাপ দিলেন, তুমি হতদর্প হবে।

পরবর্তী জীবনে এই শাপ সত্য হয়েছিল। রাজা অম্বরীষের নিকট তাঁকে ক্ষমা ভিক্ষা করতে হয়েছিল।

অম্বরীষ তাঁকে আতিথ্য গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন। দুর্বাসা এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেও যথা সময়ে উপস্থিত হলেন না। উপবাসী রাজার পারণের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। ব্রাহ্মণদের উপদেশে তিনি পারণ আরম্ভ করতেই দুর্বাসা এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর জন্য অপেক্ষা করা হয় নি দেখে তিনি ক্রোধে অজ্ঞান হয়ে নিজের জটা ছিঁড়ে এক ভয়ংকর পুরুষের সৃষ্টি করেন। সেই পুরুষ রাজাকে যখন বিনাশ করতে যাচ্ছিল, তখন কৃষ্ণ সহ্য করতে পারলেন না। সুদর্শন চক্র দিয়ে সেই পুরুষকে হত্যা করে দুর্বাসাকেও বিনাশ করতে উদ্যত হলেন। দুর্বাসা নিজের ভুল বুঝতে পেরে রাজা অম্বরীষের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। দুর্বাসার দর্প নাশ হল।

দুর্বাসা অনেককে শাপ দিয়েছেন। দেবরাজ ইন্দ্রও তাঁর কাছে অব্যাহতি পান নি। তাঁরই শাপে ইন্দ্রকে শ্রীভ্রষ্ট হতে হয়। একদা দুর্বাসা যখন অরণ্য পথে যাচ্ছিলেন, তখন স্বর্গের অপ্সরারা একখানি সন্তানক মালা তাঁর হাতে দেন। ইন্দ্রকে দেখতে পেয়ে ঋষি সেই মালা ইন্দ্রকে দান করেন। ইন্দ্র ঐরাবতের কুম্ভে সেই মালাটি স্থাপন করেছিলেন। শুঁড় দিয়ে মালা নামিয়ে ঐরাবত তা পদদলিত করে। দুর্বাসা এতে অপমানিত বোধ করে ইন্দ্রকে শাপ দেন যে তিনি শ্রীভ্রষ্ট হবেন। লক্ষ্মী তাঁকে ত্যাগ করে পাতালে প্রবেশ করেছিলেন। তারপর সমুদ্র মন্থনের গল্প। সে গল্প আছে দেবতার কথায়।

শকুন্তলাকে শাপ দেবার কথা আমরা পড়েছিলাম। শকুন্তলা যখন দুষ্যন্তের কথা ভাবছিল, তখন দুর্বাসার আগমনের কথা জানতে

পারে নি। ঋষি তাই শাপ দিয়েছিলেন যে যার কথা সে ভাবছে সে তাকে ভুলে যাবে। মহাভারতে এ গল্প নেই। আছে কালিদাসের কাব্যে। রাজা দুষ্যন্তের দুষ্কৃতিকে সমর্থন করবার জন্য কবিকে এই অভিশাপের আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

আরও একটি গল্প মহাভারতে নেই। শৈশবে শুনেছিলাম যে দুর্বাসা যখন দ্বারকায় গিয়েছিলেন, তখন যাদবেরা কৃষ্ণের পুত্র শাম্বকে মেয়ে সাজিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, তার ছেলে হবে না মেয়ে। সর্বজ্ঞ ঋষি তাদের রসিকতা বুঝতে পেরে বলেছিলেন, মুষল হবে, আর সেই মুষলে যদু বংশ ধ্বংস হবে। তাই হয়েছিল। কিন্তু মহাভারতে এই গল্প দেখি বিশ্বামিত্র কণ্ব ও নারদ মুনির সম্বন্ধে। এই তিনজনে যখন দ্বারকায় এসেছিলেন, তখনই ঘটনাটা ঘটেছিল।

দুর্বাসার খামখেয়ালিপনার গল্পও একাধিক। একবার তিনি দশ হাজার শিষ্য নিয়ে দুর্যোধনের কাছে এসেছিলেন, এবং রাজার অনুরোধে কয়েক দিন তাঁর আতিথ্য স্বীকার করেন। দুর্বাসা কোন দিন বলতেন, আমি খুব ক্ষুধার্ত, এখনই অন্ন দাও। বলে স্নান করতে গিয়ে অত্যন্ত দেরিতে ফিরতেন। আবার কোন দিন বলতেন, আজ কিছু খাব না, একেবারে ক্ষুধা নেই। তারপর হঠাৎ এসে বলতেন, এখনই খাব। কোন দিন বা মধ্যরাত্রে উঠে অন্ন প্রস্তুত করতে বলতেন। তারপর কিছু না খেয়েই সকলকে ভর্ৎসনা করতেন। আপ্রাণ চেষ্টায় দুর্যোধন তাঁকে তুষ্ট করলেন। যাবার সময় ঋষি বললেন, তুমি বর চাও।

যুধিষ্ঠিরকে বিপদে ফেলবার জন্য দুর্যোধন আগেই পরামর্শ করে রেখেছিলেন। ঋষির কথা শুনে বললেন, আমার বড় ভাই যুধিষ্ঠির এখন বনবাসী। আপনি একবার তাঁর আতিথ্য স্বীকার করুন। সকলের আহারের পরে দ্রৌপদী যখন নিজে খেয়ে দুপুরে বিশ্রাম করবেন, আপনি সেই সময়ে সেখানে যাবেন।

দুর্বাসা তাই করলেন। এক অযুত শিষ্য নিয়ে তিনি যুধিষ্ঠিরের কাছে উপস্থিত হলেন। যুধিষ্ঠির তাঁদের স্নান আহ্নিক সেরে আসতে বললেন, কিন্তু দ্রৌপদী উদ্বিগ্ন হয়ে কৃষ্ণকে স্মরণ করলেন। কৃষ্ণ এলে বললেন, ঋষিরা এখনই ফিরবেন, আমি তাঁদের কী খাওয়াব! কৃষ্ণ বললেন, আগে আমাকে কিছু খাওয়াও। দ্রৌপদী বললেন, যতক্ষণ আমি না খাই, ততক্ষণই আমার সূর্যদত্ত স্থালীতে অন্ন থাকে। এখন তো কিছুই নেই। কৃষ্ণ তবু তাঁকে স্থালীটি আনতে বললেন। আর সেই স্থালীর কানায় যে অন্ন লেগে ছিল, তাই খেয়ে তিনি ঢেকুর তুললেন।

এদিকে স্নানরত মুনিদেরও উদ্গার উঠল। দুর্বাসা বললেন, এ বড় চিন্তার কথা। যুধিষ্ঠিরকে রান্না করতে বলে আসা হল, এখন খেতে না পারলে বিপদ বাধবে। তার চেয়ে পালাই চল। বলে শিষ্যদের নিয়ে পালিয়ে গেলেন।

কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল অন্য সময়। কৃষ্ণ তাঁকে গরম পায়স খেতে দিয়েছিলেন। সেই পায়স খেতে খেতে হঠাৎ তাঁকে বললেন, এই পায়স তোমার সর্বাঙ্গে লেপন কর। কৃষ্ণ আপত্তি না করে তাই করলেন, শুধু ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তির জন্য পদতলে পায়স লেপন করলেন না। তারপর দুর্বাসার আদেশে রুক্মিণীর সারা দেহে পায়স লেপন করা হল, এবং তাঁকে রথে যোজনা করে ঋষি সেই রথে আরোহণ করলেন। ঋষির কশাঘাতে রুক্মিণী রথ টেনে টেনে ক্লান্ত হয়ে পড়তেই ঋষি ক্রুদ্ধ হয়ে রথ থেকে নেমে দক্ষিণে রওনা হলেন। অনেক কষ্টে কৃষ্ণ তাঁর রোষ নিবারণ করলেন।

এই রকম অমানুষিক খামখেয়ালি কাজ দুর্বাসা কেন করে-ছিলেন তা তিনিই জানেন। তবে কৃষ্ণ তাঁকে সন্তুষ্ট করবার পর বললেন, তুমি ক্রোধজিৎ, আমার বরে তুমি ও রুক্মিণী সর্বলোকের প্রিয় হবে। তবে তুমি পায়ে পায়স লেপন কর নি বলে পদতল

ছাড়া আর সমস্ত দেহ অভেদ্য হবে। পদতলে ব্যাধের শর লেগেই কৃষ্ণের মৃত্যু হয়েছিল।

দুর্বাসার এই প্রথম বর নয়, আগেও তিনি প্রসন্ন হয়ে বর দিয়েছিলেন। রাজা কুন্তিভোজের গৃহে তিনি যখন অতিথি হয়েছিলেন, তখন তাঁর কন্যা কুন্তী সেবায় তাঁকে সন্তুষ্ট করেন। ঋষি কুমারী কুন্তীকে আহ্বান মন্ত্র প্রদান করেন। তার সাহায্যে যে কোন দেবতাকে কুন্তী আহ্বান করতে পারতেন।

রামায়ণেও আমরা দুর্বাসাকে দেখি। উত্তরকাণ্ডে রাম যখন কালপুরুষের সঙ্গে নিভৃতে আলাপরত, দুর্বাসা এলেন রামের দর্শনাভিলাষী হয়ে। লক্ষ্মণ দ্বারে ছিলেন, তাঁকে বললেন, রামের কাছে আমাকে এখুনি নিয়ে চল। লক্ষ্মণ জানতেন যে এই সময় রামের নিকটে গেলে কালপুরুষের চুক্তি অনুসারে তাঁকে মৃত্যু বরণ করতে হবে। তাই বললেন, একটু অপেক্ষা করুন। দুর্বাশা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, এই মুহূর্তে রামকে সংবাদ না দিলে আমি এই রাজ্য নগর ও তোমাদের সবাইকে অভিশাপ দেব। নিজের বিপদ তুচ্ছ করে লক্ষ্মণ রামকে সংবাদ দিলেন।

রাম বাহিরে এলে দুর্বাসা বললেন, আমার এক হাজার বছরের অনশন ব্রত আজ শেষ হল, আমি তোমার গৃহে ভোজন করব। রাম তাঁর সৎকারের ব্যবস্থা করলেন। আহার করে ঋষি সাধু সাধু বলে প্রস্থান করলেন। আর রাম তাঁর সংকল্প রক্ষার জন্য বর্জন করলেন লক্ষ্মণকে।

দুর্বাসার মতো রাগী ও খামখেয়ালি ঋষি ভারতে আর দ্বিতীয় ছিলেন না। তিনি কখন কার সঙ্গে কী ব্যবহার করবেন তা কেউই জানতেন না। মুনি ঋষির সঙ্গেও তিনি অদ্ভুত ব্যবহার করতেন। মুদগল ঋষির সঙ্গে তিনি অদ্ভুত আচরণ করেছিলেন। কুরুক্ষেত্রে এই ঋষি শিলোঞ্ছবৃত্তি নিয়ে কোন রকমে জীবন ধারণ করতেন। শস্য কেটে নেবার পর যে শস্য ক্ষেতে পড়ে থাকে তাই কুড়িয়ে

তিনি স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে পনর দিন পর একদিন আহার করতেন। অমাবস্যা পূর্ণিমায় যজ্ঞ করে অতিথিকে কিছু অন্ন দিতেন। এই অন্ন শেষ হত না, অতিথি এলেই বৃদ্ধি পেত।

একদিন মুণ্ডিতকেশ দুর্বাসা দিগম্বর হয়ে গালাগালি করতে করতে মুদ্গলের নিকটে এসে বললেন, অন্ন দাও।

মুদ্গল অন্ন দিতেই সমস্ত খেয়ে গায়ে উচ্ছিষ্ট মেখে চলে গেলেন। একেবারে উন্মাদ না হলে কেউ দিগম্বর হয়ে বেড়াতে পারে না, দেহে উচ্ছিষ্টও মাখতে পারে না। একদিন দুদিন নয়, পর পর ছটি পর্ব দিনে দুর্বাসা মুদ্গলের অন্ন খেয়ে গেলেন, আর মুদ্গল রইলেন অনাহারে। শেষ দিনে তাঁকে বলে গেলেন যে তাঁর মহত্ত্বের কথা স্বর্গে জানাজানি হয়ে গেছে, এবং মুদ্গল সশরীরে স্বর্গে যাবেন।

এই সময়ে বিমান নিয়ে এল দেবদূত, বলল, চলুন স্বর্গে।

মুদ্গল বললেন, স্বর্গবাসের দোষগুণ তুমি বল।

দেবদূত বলল, স্বর্গে শোক ক্লান্তি ঈর্ষা মোহ মাৎসর্য নেই। পুণ্যফলে লোকে স্বর্গবাসী হয়। সেখানে শুধু কৃতকর্মেরই ফল ভোগ, নতুন কর্মের সুযোগ নেই। কর্মক্ষয় হলেই পতন।

মুদ্গল বললেন, তবে তোমাকে নমস্কার, তুমি ফিরে যাও, স্বর্গে আমার কাজ নেই। পৃথিবীতে বাস করেই আমি নির্বাণমুক্তি রূপ সিদ্ধি লাভের চেষ্টা করব।

শূন্য বিমান নিয়ে দেবদূত ফিরে গেল।

ছয়

তারপরে গুরুজী অঙ্গিরার কাহিনী বললেন।

তপস্যারত অগ্নি অনুভব করছিলেন যে তাঁর তেজ স্তিমিত হয়ে গেছে, পূর্বের প্রভা আর তাঁর নেই। এই চিন্তা মনে আসতেই তিনি বিচলিত হলেন, কেন এমন হল! তাঁকে তপঃক্লান্ত দেখে ব্রহ্মা কি জগতের প্রয়োজনে অন্য অগ্নির সৃষ্টি করলেন! কে জানে!

এমন সময় তিনি দেখতে পেলেন যে মহাদ্যুতিমান্ এক ঋষি সকলকে তাপ বিতরণ করছেন। অগ্নি তাঁর কাছে গিয়ে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। ঋষি তাঁর নাম বললেন অঙ্গিরা, ব্রহ্মার মানস পুত্র, তাঁর মুখ থেকে তিনি উৎপন্ন হয়েছেন।

অগ্নি ভাবলেন যে জলে দাঁড়িয়ে তপস্যার জন্য তাঁর তেজ লুপ্ত হয়েছে, এখন তাঁর অগ্নিত্ব ফিরে পাওয়া আর সম্ভব নয়। তাই তিনি অঙ্গিরাকে বললেন, আমার কীর্তি শেষ হয়ে গেছে, এবারে আপনি অগ্নিত্ব গ্রহণ করে জগতের মঙ্গল করুন।

অঙ্গিরা বললেন, তা হয় না। অন্ধকার দূর করবার জন্য বিধাতা আপনাকে সৃষ্টি করেছেন, আমাকে নয়। আপনি আপনার পূর্ব তেজে প্রকাশ হন।

অগ্নি বললেন, আমার তেজ কোথায়! তার চেয়ে আপনি প্রথম অগ্নি হন, আমি হব দ্বিতীয় অগ্নি।

অঙ্গিরা এতে রাজী হলেন না, বললেন: আপনি যদি আমার উপর প্রীত হয়ে থাকেন, তাহলে আপনার অগ্নিত্ব গ্রহণ করে আমাকে বর দিন, আমি যেন আপনার মতো এক পুত্র লাভে সমর্থ হই।

অগ্নি বললেন, তথাস্তু।

যথাসময়ে অঙ্গিরার এই পুত্রলাভ হল। তাঁর নাম বৃহস্পতি। অঙ্গিরার প্রথম পুত্রের নাম উতথ্য।

মরীচি অত্রির মতো অঙ্গিরাও কর্দম ঋষির এক কন্যা শ্রদ্ধাকে বিবাহ করেন।

তাউজী বললেন : কর্দম ঋষির কথা আপনি এখনও বলেন নি।

গুরুজী বললেন : বলি নি বুঝি! ইনিও প্রজাপতি ঋষি। ব্রহ্মার ছায়া থেকে এঁর উৎপত্তি। সরস্বতী নদীর তীরে বিন্দুসরতীর্থে তিনি দশহাজার বৎসর বিষ্ণুর তপস্যা করেন। বিষ্ণু তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বর প্রার্থনা করতে বললেন। কর্দম অন্য কিছু না চেয়ে নিজের জন্য উপযুক্ত স্ত্রী চাইলেন। বিষ্ণু স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা দেবহুতির নাম করলেন এবং দেবহুতির সঙ্গেই কর্দমের বিবাহ হল। কলা গতি শ্রদ্ধা অনসূয়া অরুন্ধতী প্রভৃতি নামের নয়টি কন্যার পর কপিল নামে তাঁদের এক পুত্র জন্মে। কর্দম তাঁর কন্যাদের সে যুগের শ্রেষ্ঠ প্রজাপতি ঋষিদের হাতেই সম্প্রদান করেছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে যে নয়টি কন্যার জন্মের পরেই কর্দম যোগাভ্যাসের জন্য সংসার ত্যাগের সংকল্প করেছিলেন। কিন্তু দেবহুতির দুর্ভাবনায় তা পারেন নি এবং তাঁকে আরও কিছু দিন সংসার করতে হয়। এই সময়ে কপিলের জন্ম হয় এবং একে একে তিনি নয়টি কন্যার বিবাহ দেন। তারপর তিনি সংসার ত্যাগ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত মতে কপিল বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার। তিনি সাঙ্খ্য-দর্শন প্রচারের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর জন্মের সময় আকাশের মুখর মেঘ থেকে নানা বাদ্য বেজে উঠেছিল, আনন্দে গান গেয়েছিল অপ্সরাগণ আর গন্ধর্বরা নৃত্য করেছিল, পুষ্পবৃষ্টি হয়েছিল। কর্দমের আশ্রমে এসে স্বয়ং ব্রহ্মা বলেছিলেন, সিদ্ধগণের অধীশ্বর ইনি, পৃথিবীতে নূতন দর্শন প্রচার করবেন।

বেদের উপনিষদ্ভাগে কপিলের নাম পাওয়া যায়। আর পাওয়া যায় গীতায়—গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ। শ্রীমদ্ভাগবতের কপিল তাঁর মাতাকে উপদেশ দিয়েছিলেন। এই মতের সঙ্গে সাঙ্খ্য দর্শনের কিছু প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়।

গুরুজী বললেনঃ যথাস্থানে সে আলোচনা করা যাবে।

আমি ভেবেছিলাম, এবারে তিনি তাঁর পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে আসবেন। কিন্তু তা এলেন না। বললেনঃ পুরাণে কপিল মুনির নাম অন্য এক কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। কপিল মুনির আশ্রম ছিল পাতালে। একান্তে জনশূন্য স্থানে শান্তিতে তপস্যার জন্য তিনি পাতালে থাকতেন। কিন্তু সেখানেও তাঁর তপস্যার বিঘ্ন ঘটে। পৃথিবীতে সগর রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। রাক্ষসের বেশে ইন্দ্র সমুদ্র তীর থেকে সেই যজ্ঞের অশ্ব চুরি করে পাতালে গিয়ে কপিলের আশ্রমে তা বেঁধে রাখেন। সগর রাজার ষাট হাজার পুত্র। তারা এই অশ্বের খোঁজে সমুদ্র খুঁড়ে পাতালে এল। এসে দেখল যে সেই অশ্ব কপিলের আশ্রমে বাঁধা আছে। সগরের পুত্ররা কপিল মুনিকেই চোর ভেবে তাঁকেই আক্রমণ করতে উদ্যত হল। কিন্তু মুনির রোষাগ্নিতে ভস্ম হয়ে গেল। এর পরে সগর তাঁর পৌত্র অংশুমানকে অশ্বের খোঁজে পাঠালেন। অংশুমান পাতালে এসে কপিলকে সন্তুষ্ট করে অশ্ব ফিরে পেল। কপিল আশীর্বাদ করেন যে তার পৌত্র ভগীরথ স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে এনে তার পিতৃ-পুরুষকে উদ্ধার করতে পারবে।

এই পর্যন্ত বলে গুরুজী থেমেছিলেন। তাউজী তাঁকে খেই ধরিয়ে দিলেন, বললেনঃ আপনি অঙ্গিরার কথা বলছিলেন।

গুরুজী বললেনঃ মনে আছে।

তারপরে বললেনঃ ঋগ্বেদে অঙ্গিরার অনেক শ্লোক আছে, অনেক ভাল ভাল শ্লোক। তোমরা যখন ঋগ্বেদ পড়বে—

বাধা দিয়ে তাউজী বললেন : ঋগ্বেদের কথা আজ থাক। আপনি অঙ্গিরার দুই পুত্রের কথা বলুন।

বড় উতথ্য, ছোট বৃহস্পতি। উতথ্যের স্ত্রী মমতা ও বৃহস্পতির স্ত্রী তারা।

এই পর্যন্ত বলেই গুরুজী থামলেন। আমরা নিঃশব্দে তাঁর পরের কথা শুনবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। গুরুজীকে বড় চিন্তিত দেখাচ্ছিল। কিছু উদ্বিগ্নও বটে। তারপরে কিছু সংযত হয়ে বললেন : পুরাণে এমন অনেক কাহিনী আছে, যা সকলের পাতে দেবার মতো নয়। আবার বাদ দিলেও কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যায়। যুগের সঙ্গে সামাজিক রীতি নীতির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আমরা এ যুগে যা নিতান্ত অশ্লীল বলে মনে করি, তা হয় তো পৌরাণিক যুগে প্রচলিত ছিল। নিন্দনীয় হলেও ত ধিক্কৃত ছিল না। তা হলে সেই কাহিনীগুলো একটু রেখে ঢেকে বলার চেষ্টা দেখা যেত।

গুরুজী একটু থেমে বললেন : দেবগুরু বৃহস্পতির স্ত্রী তারাকে চন্দ্র হরণ করেছিলেন, সে কথা আগেই বলেছি। তা নিয়ে দেবাসুরে যুদ্ধ ঘনিয়ে উঠেছিল। দেবতারা গুরু বৃহস্পতির পক্ষে, আর দৈত্যেরা সব চন্দ্রের পক্ষে। ব্রহ্মা এসে বিবাদ মেটালেন। চন্দ্রের কাছ থেকে তারাকে উদ্ধার করে বৃহস্পতির হাতে ফিরিয়ে দিলেন। এর পরে তারা যখন বুধের জন্ম দিলেন, তখন আবার বিবাদ বেধেছিল। বৃহস্পতি বললেন, আমি বুধের জনক ; আর চন্দ্র বললেন, আমি। তারাকে প্রশ্ন করে ব্রহ্মা এ বিবাদও মেটালেন, তারা বললেন যে চন্দ্রই বুধের জনক।

এ নিয়ে সে যুগে নিন্দা প্রশংসার কথা ওঠে নি। তারাকে কেউ ত্যাগ করতে বলেন নি বৃহস্পতিকে। চন্দ্রের ঘর থেকে ফিরে এসে তারা আবার সগৌরবে নিজের সংসারে ঢুকেছিলেন। আজও তিনি প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যারূপে প্রকীর্তিতা।

বৃহস্পতির দুর্বলতার কাহিনীও আমাদের অজ্ঞাত নয়। তিনি তাঁর বড় ভাই উতথ্যের স্ত্রী মমতার নিকট সহবাস প্রার্থনা করেন। মমতা তখন অন্তঃসত্ত্বা। গর্ভস্থ শিশু তাঁকে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল বলে তিনি তাকে 'অন্ধ হও' বলে শাপ দিয়েছিলেন। দীর্ঘতমা তাই অন্ধ হয়ে জন্মালেন, আর বৃহস্পতির বীর্যে জন্ম হল ভরদ্বাজের। ভরদ্বাজকে নিয়ে মমতা ও বৃহস্পতির মধ্যে বিবাদ হয়েছিল। স্বামী তাঁকে ব্যভিচারিণী বলে ত্যাগ করবেন ভয়ে মমতা ভরদ্বাজকে ভরণ করতে রাজী হন নি। অথচ বৃহস্পতি মমতাকে অনেক যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে ভরদ্বাজ তাঁর স্বামীরই পুত্র। শেষ পর্যন্ত মরুদ্‌গণ ভরদ্বাজকে পালন করেন।

এই সব কাহিনী বিচার করলে সে যুগের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু ধারণা হয়। মমতা অন্যায় করেছিলেন, কিন্তু তারা নিরপরাধ ছিলেন। চন্দ্র তারা হরণ করে নিন্দিত হন নি, কিন্তু বৃহস্পতির কীর্তি প্রকাশ হয়ে পড়লে সমাজ তাঁকে সমর্থন করত না।

অন্ধ দীর্ঘতমা ধার্মিক ও বেদজ্ঞ ছিলেন। তাঁর বিবাহ হয়েছিল প্রদ্বেষীর সঙ্গে। তাঁর পশুর মতো গোধর্মে প্রবৃত্তি দেখে প্রতিবেশী মুনিরা তাঁকে পরিত্যাগ করেন, এবং তাঁর স্ত্রীও তাঁকে ভরণপোষণে বিমুখ হন। শেষ পর্যন্ত মায়ের পরামর্শে তাঁর পুত্ররা তাঁকে ভেলায় বসিয়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেয়।

এই বৃদ্ধ ঋষিকে গঙ্গায় ভেসে যেতে দেখে বলিরাজা তাঁকে উদ্ধার করে নিজের প্রাসাদে নিয়ে যান। পুত্র কামনায় রাজা তাঁর মহিষী সুদেষ্ণাকে ঋষির কাছে পাঠিয়েছিলেন। অন্ধ ঋষি রাণীর অঙ্গ স্পর্শ করে বললেন যে তাঁর অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামে পাঁচ বীর পুত্র হবে এবং তাদের নামে হবে পাঁচটি দেশ।

গুরুজী একটু বিশ্রাম নিয়ে বললেন ঃ এর পর বৃহস্পতির কথা। ঋগ্বেদে বৃহস্পতি শব্দের অর্থ পুরোহিত ও মন্ত্রপালক।

কোথাও একাকী কোথাও ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বন্দনা। ইনিও সোমপায়ী, ছন্দের অধিকারী, দেবগণের পুরোহিত। ইনি যোদ্ধা, জয় দাতা, ঋত রথে আরোহণ করে ইনি শত্রু বিনাশ করেন। এই বৃহস্পতির সম্যক পরিচয় পাওয়া যাবে ঋগ্বেদের শ্লোকে।

পরবর্তী যুগে বৃহস্পতি গ্রহাধিপতি হলেন। নবগ্রহের তিনি পঞ্চম গ্রহ। তাঁর অষ্টাশ্ববাহিত রথের নাম নীতিঘোষ। এই বৃহস্পতির পরিচয় পাওয়া যাবে জ্যোতিষশাস্ত্রে।

পুরাণে বৃহস্পতি দেবগুরু বলেই পরিচিত। কিন্তু দৈত্যগুরু ভৃগুপুত্র শুক্রাচার্যের মতো চরিত্রবল তাঁর দেখি না। বৃহস্পতি তাঁর মতো মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রের অধিকারী ছিলেন না, তাই দেবাসুরের যুদ্ধের সময় তিনি অসুবিধায় পড়তেন। শুক্রাচার্য মৃত অসুরদের সঞ্জীবনী মন্ত্রে পুনর্জীবিত করতেন। আর বৃহস্পতি কিছু করতে না পেরে বিচলিত হতেন। শেষ পর্যন্ত আপন পুত্র কচকে পাঠালেন দৈত্যগুরুর কাছে, সেবায় সন্তুষ্ট করে কচ তাঁর কাছ থেকে সঞ্জীবনী মন্ত্র শিখে আসবে।

শুক্রাচার্য হলে এমন কাজ করতেন না। তপস্যায় তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। অসুরদের সাহায্যের প্রয়োজন হলে তিনি কঠিন তপস্যায় প্রবৃত্ত হতেন। দীর্ঘ দশ যুগ ত্রিলোক বলির অধিকারে ছিল। বিষ্ণু ছলনা করে দৈত্যরাজ বলিকে তাঁর অধিকার থেকে বঞ্চিত করে যখন ইন্দ্রকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন তখন অসুরেরা গুরু শুক্রাচার্যের সাহায্য প্রার্থনা করেন। শুক্রাচার্য দেবতাদের শক্তি খর্ব করবার জন্য নূতন ক্ষমতা লাভের চেষ্টায় মহাদেবের তপস্যা শুরু করেন। এই সময় অনেক ঘটনা ঘটে, সে সব শুক্রাচার্যের জীবনী আলোচনার সময় বলা সম্ভব হবে। এখানে বৃহস্পতির চরিত্র বর্ণনায় এইটুকুই প্রাসঙ্গিক যে তিনি শুক্রাচার্যকে বিতাড়িত করবার জন্য ছলনার আশ্রয় নিয়েছিলেন। শুক্র যখন জয়ন্তীর সঙ্গে অজ্ঞাতবাস করছিলেন, তখন বৃহস্পতি শুক্রের রূপ ধারণ করে

অসুরদের কাছে এসেছিলেন। অসুররা তাঁকেই তাদের গুরু বলে বিশ্বাস করেছিল। তারপর একদিন যখন আসল শুক্র ফিরলেন, তখন নকল শুক্র অসুরদের আসল গুরুকেই বিতাড়িত করবার পরামর্শ দিলেন। অসুররা তাই করতে গিয়ে গুরুর অভিশাপ পেল, তারা জ্ঞানভ্রষ্ট ও বিনষ্ট হবে। তারপরে তারা বৃহস্পতির ছলনা বুঝতে পারল। শুক্রও পরে তাঁর শিষ্যদের নির্দোষ জেনে ক্ষমা করলেন।

এই ঘটনায় বৃহস্পতির চরিত্রের মহত্ত্ব প্রকাশ পায় নি। প্রাচীন পুরাণকার তাঁকে দেবগুরু বলেই সম্মান করেছিলেন, কিন্তু তাঁকে আদর্শ চরিত্র বলে রূপায়িত করবার কোন চেষ্টা করেন নি।

গুরুজী একটু থেমে বললেন ঃ ভরদ্বাজ তাঁর পরিত্যক্ত অনাদৃত সন্তান। তিনি গুরু গৃহে বেদাধ্যয়নের সুযোগ পান নি, হরিদ্বারে গঙ্গা তীরে তিনি তপস্যা করতেন। মুনিদের অনুরোধে তিনি একবার ইন্দ্রালয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে ইন্দ্রের নিকট তিনি আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তারপর ফিরে এসে তিনি ব্যাধিগ্রস্ত লোকের চিকিৎসা করতেন ও অন্যান্য ঋষিদের আয়ুর্বেদ শিক্ষা দিতেন।

ভরদ্বাজের দুই পুত্রের নাম আমরা জানি, দ্রোণ ও যবক্রীত। দ্রোণের জন্মবৃত্তান্ত রহস্যময়। স্বর্গের অপ্সরা ঘৃতাচী হরিদ্বারে গঙ্গাস্নান করে সিক্ত বসনে তীরে উঠেছিলেন। সেই যৌবনোদ্ধত সুন্দরীকে দেখে তপস্বী ভরদ্বাজ মুগ্ধ হন। একটি দ্রোণ পাত্রে ভরদ্বাজ তাঁর বীর্য রক্ষা করেছিলেন। দ্রোণের জন্ম হয় সেই পাত্রে।

দ্রোণ অগ্নির পুত্র অগ্নিবেশ্য মুনির কাছে অস্ত্র শিক্ষা করেন। আর অস্ত্র গ্রহণ করেন পরশুরামের নিকট। তিনি বিবাহ করে-ছিলেন শরদ্বান ঋষির কন্যা কৃপীকে, কৃপ তাঁর শ্যালক। শরদ্বান ঋষি গৌতমের শিষ্য ছিলেন। বেদজ্ঞানের চেয়ে ধনুর্বেদে তাঁর

বেশি মেধা ছিল। জানপদী নামে এক অপ্সরার রূপে মুগ্ধ হয়ে তিনি এই পুত্র কন্যার জন্ম দেন। মহারাজ শান্তনু তাদের পালন করেছিলেন। দ্রোণের পুত্রের নাম অশ্বত্থামা। মহাভারতে এঁদের বিস্তারিত বিবরণ আছে।

যবক্রীত তাঁর পিতা ভরদ্বাজের সঙ্গে বসবাস করতেন। তিনিও গুরুর নিকট বেদাধ্যয়ন করেন নি বলে ব্রাহ্মণরা পিতা-পুত্রকে সম্মানের চোখে দেখতেন না। তাঁদের প্রতিবেশী রৈভ্য ছিলেন ভরদ্বাজের বন্ধু। রৈভ্য ও তাঁর দুই পুত্র অর্বাবসু ও পরাবসু বেদজ্ঞ ও বিদ্বান ছিলেন। সকলে তাঁদের সম্মান করত। এই কারণে যবক্রীতের মনে দুঃখের সীমা ছিল না। বিনা অধ্যয়নে বেদজ্ঞ হবার চেষ্টায় তিনি কঠোর তপস্যা শুরু করেন। ইন্দ্র তাঁকে দর্শন দিয়ে বললেন, এ ভাবে নয়, গুরুর কাছে বেদাধ্যয়ন কর।

কিন্তু যবক্রীত নিবৃত্ত হলেন না। এর পর একদিন তিনি দেখতে পেলেন যে একজন যক্ষ্মাক্রান্ত জরাগ্রস্ত ব্রাহ্মণ মুঠো মুঠো বালি গঙ্গায় নিক্ষেপ করছেন। যবক্রীত তার কারণ জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে ব্রাহ্মণ সেখানে গঙ্গার উপরে একটি সেতু নির্মাণের চেষ্টা করছেন। যবক্রীত বললেন, এ তোমার বৃথা চেষ্টা।

তখন সেই ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্র বললেন, তোমার চেষ্টাও এই রকম।

কিন্তু যবক্রীতের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে পিতাপুত্রকে বেদজ্ঞ হবার বর দান করলেন।

পুত্রের নিকট এই বর লাভের সংবাদ পেয়ে ভরদ্বাজ সুখী হন নি। বলেছিলেন, এই অহংকার হয়তো তোমার মৃত্যুর কারণ হবে।

শেষ পর্যন্ত তাই হয়েছিল। রৈভ্যর আশ্রমে একদিন পরাবসুর সুন্দরী স্ত্রীকে দেখে যবক্রীত তাঁকে অপমান করেছিলেন। রোদনরতা পুত্রবধূর নিকট এই কথা শুনে রৈভ্য তাঁর দুটি জটা ছিঁড়ে এক সুন্দরী নারী ও রাক্ষস সৃষ্টি করেন। সুন্দরী নারী

যবক্রীতের কমণ্ডলু হরণ করে ও রাক্ষস তাঁকে শূলবিদ্ধ করে হত্যা করে।

পুত্রের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে ভরদ্বাজ শোকে অধীর হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন যে রৈভ্য বিনা কারণে তাঁর পুত্রকে হত্যা করেছিলেন। তাই তিনি শাপ দিয়েছিলেন যে রৈভ্য তাঁর পুত্রের হাতে নিহত হবেন। তারপর পুত্রের চিতায় জীবন বিসর্জন করেন।

আমরা যখন ভাবছিলাম যে গুরুজী এবারে নূতন কোন ঋষির কথা বলবেন, তখন তিনি বললেনঃ ভরদ্বাজের কাহিনী এইখানেই শেষ হয় নি। ভরদ্বাজ পুনর্জীবিত হয়েছিলেন।

যথাসময়ে ভরদ্বাজের শাপে রৈভ্যর মৃত্যু হয়েছিল। একদিন রাত্রিকালে আশ্রমে ফেরার পথে পরাবসু অরণ্যে তাঁর পিতাকে বধ করেন। কৃষ্ণাজিনধারী পিতাকে তিনি মৃগ মনে করেছিলেন। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন তাঁর বড় ভাই অর্বাবসু। কিন্তু পরাবসু তাঁর সঙ্গে শঠতা করেছিলেন। রাজা বৃহদ্‌দ্যুম্নর এক যজ্ঞে দুই ভাই নিযুক্ত হয়েছিলেন। পরাবসু রাজাকে বলেন যে অর্বাবসু ব্রহ্মহত্যাকারী, এই যজ্ঞে তিনি উপস্থিত থাকলে অনিষ্ট হবে। অর্বাবসুর সত্য কথা রাজা বিশ্বাস করলেন না, এবং তাঁকে তাড়িয়ে দিলেন।

দুঃখিত চিত্তে অর্বাবসু বনে এসে সূর্যের আরাধনা শুরু করলেন। তাঁর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে দেবতারা রৈভ্য ভরদ্বাজ ও যবক্রীতের পুনর্জীবন দান করেন। প্রাণ লাভ করে যবক্রীত দেবতাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, রৈভ্য কেমন করে তাঁর মতো বেদজ্ঞ তপস্বীকে বধ করলেন! দেবতারা তখন তাঁকে রৈভ্যর শ্রেষ্ঠতা বুঝিয়ে দিলেন। রৈভ্য বেদাধ্যয়ন করেছিলেন গুরুগৃহে দীর্ঘ দিন কষ্ট স্বীকার করে, আর যবক্রীত তপস্যায় বেদ শিক্ষা করেছিলেন।

রামায়ণেও আমরা ভরদ্বাজ ঋষির উল্লেখ দেখি। তখন তিনি হরিদ্বারে নয়, শিষ্যপরিবৃত হয়ে প্রয়াগে বাস করেন। গঙ্গা-

যমুনার সঙ্গমে তাঁর আশ্রম। বনবাস যাত্রার কালে রাম তাঁর আশ্রমে এসেছিলেন। রামকে তিনি তাঁর আশ্রমে থাকবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু রাম আরও নির্জন স্থানে বাস করতে চাইলেন। ভরদ্বাজ তাঁকে চিত্রকূটের পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

তারপর রামের অন্বেষণে সসৈন্যে এসেছিলেন ভরত। ভরদ্বাজ তাঁকে তিরস্কার করে বলেছিলেন, তুমি কি তোমার রাজ্য নিষ্কণ্টক করবার জন্য কোন দুরভিসন্ধি নিয়ে এখানে এসেছ?

ভরতের বিলাপ শুনে ঋষি প্রীত হয়েছিলেন। বলেছিলেন, তোমার অভিপ্রায় আমি জানি। কিন্তু লোক জন সৈন্য সামন্ত কোথায়? তাদের এখানে আসতে বল। আমি তাদের অতিথি সৎকার করব।

তারপর তিনি বিশ্বকর্মাকে স্মরণ করে আতিথ্যের আয়োজন করতে বললেন। তাঁর মন্ত্রবলে ইন্দ্রাদি লোকপাল গন্ধর্ব ও অপ্সরারাও এলেন। দেখতে দেখতে পঞ্চ যোজন বিস্তৃত সভাভূমি নির্মিত হয়ে গেল। আসন শয্যা ও আহার্য দ্রব্যের আর কোন অভাব রইল না। সুন্দরী নারীরা এল সৈন্যদের আনন্দ বর্ধনের জন্য, সুরাপান করে তারা যেন নন্দন কাননে রাত্রি যাপন করল।

রাবণ বধ করে রামচন্দ্র আবার এসেছিলেন ভরদ্বাজের আশ্রমে। এক রাত্রির জন্য আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। রামের প্রার্থনায় ভরদ্বাজ বর দিয়েছিলেন, অযোধ্যা পর্যন্ত তিন যোজন পথের সমস্ত বৃক্ষ সহসা ফলে ফুলে মধুস্রাবী হয়ে উঠেছিল।

তুলসীদাস তাঁর রামচরিতমানসে এই ঘটনা খুব সংক্ষেপে বলেছেন।

তুরত পবনসুত গবনত ভয়উ।
তব প্রভু ভরদ্বাজ পহিঁ গয়উ॥

হনুমান যখন অযোধ্যার খবর আনবার জন্য চলে গেলেন, তখন প্রভু রামচন্দ্র এলেন ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে।

নানা বিধি মুনি পূজা কীন্ হী।
অস্তুতি করি পুনি আসিষ দীন হী॥

রাম নানা প্রকারে মুনির পূজা করলেন, আর মুনি রামের স্তুতি করে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন।

গুরুজী বললেন ঃ ভরদ্বাজের নাম আমরা বেদেও পেয়ে থাকি। অনেক মন্ত্রের তিনি বক্তা।

তাউজী তাঁকে গল্পের সূত্র ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন, বললেন ঃ বৃহস্পতির কথায় ভরদ্বাজের কথা উঠেছিল।

গুরুজী একটু ভেবে বললেন ঃ বৃহস্পতির পরে তাঁর পুত্র কচ। শুক্রাচার্যের কথায় কচের কথা এসে পড়বে। কচকে আমরা ঋষির সম্মান দিই নি, তাঁকে আমরা শুক্রাচার্যের প্রিয় শিষ্যরূপে পেয়েছি, আর তাঁর কন্যা দেবযানীর প্রণয়ীরূপে। মহাভারতে তাঁদের কাহিনী তোমরা পড়ে নিও।

সাত

কচ ও দেবযানীর কাহিনী আমি নূতন করে পড়লাম।

ত্রিলোকের ঐশ্বর্য লাভের জন্য দেবাসুরে যখন দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়, তখন দেবতারা বৃহস্পতিকে ও অসুররা শুক্রাচার্যকে গুরুপদে বরণ করেন। তারপর দেবতারা দেখতে পেলেন যে শুক্রাচার্যের মতো বৃহস্পতি মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যার অধিকারী নন, এবং যুদ্ধে হত দেবতাদের বাঁচিয়ে তুলতে পারেন না। অথচ শুক্রাচার্য প্রত্যেকটি অসুরকে এই বিদ্যার বলে বাঁচিয়ে তুলছেন। শেষ পর্যন্ত দেবতারা স্থির করলেন যে বৃহস্পতির পুত্র কচ শুক্রাচার্যের নিকটে গিয়ে এই বিদ্যা শিখে আসবেন। দেবতারা কচকে বললেন, তুমি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীর মনোরঞ্জন করে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা আয়ত্ত করে এস।

কচ এই উদ্দেশ্য নিয়ে অসুররাজ বৃষপর্বার রাজ্যে এসে শুক্রাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। গুরু ও গুরুকন্যার সেবা করে তিনি তাঁদের প্রিয় হলেন।

দেবযানী ইন্দ্রের দৌহিত্রী। শুক্র যখন কঠোর তপস্যায় রত, ইন্দ্র তখন ভয় পেয়েছিলেন। শুক্র নূতন কোন শক্তির অধিকারী হলে দেবতাদের নিগ্রহ আরও বাড়বে। তাই তিনি নিজের কন্যা জয়ন্তীকে পাঠালেন দৈত্যগুরুর কাছে। পৃথিবীর ঋষিদের তপোভঙ্গ করতে ইন্দ্র উর্বশী মেনকাকে পাঠিয়েছেন, পাঠিয়েছেন রম্ভা ঘৃতাচীকে। কিন্তু শুক্রাচার্যের নিকট নিজের কন্যাকে কেন পাঠালেন, সে কথার সদুত্তর পুরাণে নেই। সেবায় সন্তুষ্ট করে জয়ন্তী শুক্রের মনোহরণ করলেন, এবং তাঁর সঙ্গে অজ্ঞাতবাস করলেন দশ বৎসর। এই মিলনের ফলেই দেবযানীর জন্ম।

দেবযানী তাঁর একমাত্র কন্যা, প্রিয় কন্যা, এবং দেবযানীর জন্য দৈত্যগুরুর অদেয় কিছুই ছিল না। পিতা পুত্রীর এই স্নেহের সম্পর্কের সম্পূর্ণ সুযোগ নিতে কচ সমর্থ হয়েছিলেন।

কচ গান গাইতে জানতেন, নৃত্য ও বাদ্যে তাঁর পটুতা ছিল। কচ রূপবান, প্রিয়বাদী, সেবাপরায়ণ। নানা গুণের জন্য কচ দেবযানীর অনুরাগের পাত্র হয়ে উঠলেন। দেবযানীও তাঁকে নিভৃতে গান শোনালেন, অকুণ্ঠ সেবা দিয়ে এই প্রবাসী যুবকের আনন্দ বিধানের চেষ্টা করলেন।

পাঁচশো বছর পরে অসুররা কচের অভিসন্ধি বুঝতে পারল। সঙ্গে সঙ্গেই তারা কচকে কেটে কুকুর দিয়ে খাইয়ে দিল। সন্ধ্যা অতীত হলে দেবযানী তাঁর ভয়ের কথা পিতাকে নিবেদন করলেন। বললেন, তাকে বাঁচাতেই হবে, তা না হলে আমি বাঁচব না।

শুক্র মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা প্রয়োগ করে কচকে বাঁচালেন। কচ কুকুরদের উদর বিদীর্ণ করে বেরিয়ে এলেন।

অসুররা দ্বিতীয়বার কচকে হত্যা করল। সেবারেও দেবযানী পিতাকে অনুরোধ করে কচের জীবন দান করলেন।

তৃতীয়বার অসুররা কচকে হত্যা করে তাঁকে দাহ করে সেই ভস্ম সুরায় মিশ্রিত করে গুরুকে খাওয়াল। উদ্দেশ্য যে কচকে বাঁচানো আর সম্ভব হবে না। কিন্তু দেবযানী নাছোড়বান্দা। পিতাকে বললেন, অসম্ভব, আমি তাহলে কিছুতেই বাঁচব না।

শুক্র বললেন, তাহলে আমার উপায়! কচ যে এখন আমার পেটে। তাকে বাঁচাতে গেলে যে আমাকে জীবন দিতে হবে!

দেবযানী বললেন, আমি কিছু জানি না। তোমাদের দুজনকেই আমার চাই। আমি কাউকে হারিয়ে বাঁচতে পারব না।

শুক্র বললেন, বেশ, আমি কচকে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা দিচ্ছি। সে পুত্ররূপে আমার দেহ থেকে নির্গত হয়ে তার নবলব্ধ বিদ্যার প্রভাবে আমাকে বাঁচাবে।

গুরু শিষ্যকে তার অভীপ্সিত বিদ্যা দিলেন, শিষ্যও তাঁর সম্মান রক্ষা করলেন। নিজে নির্গত হয়ে গুরুকে বাঁচালেন।

তারপর বিদায়ের ক্ষণ এল ঘনিয়ে। সহস্র বর্ষ পূর্ণ হলে কচ গৃহে ফেরার অনুমতি চাইলেন।

দেহ আজ্ঞা দেবযানী, দেবলোকে দাস
করিবে প্রয়াণ।

দেবযানী বললেন, আচার্যের কাছে দুর্লভ বিদ্যা তো পেয়েছ, কিন্তু—

আর কিছু নাহি কি কামনা
ভেবে দেখো মনে মনে।

কচ বললেন, আর কিছু নাহি।

দেবযানী মর্মাহত হলেন, কিছু নাই? তবে

আমার হৃদয়
বিদ্যা নিতে এসে কেন করিলে হরণ
স্বর্গের চাতুরী জালে? বুঝেছি এখন,
আমারে করিয়া বশ পিতার হৃদয়ে
চেয়েছিলে পশিবারে—কৃতকার্য হয়ে
আজ যাবে মোরে কিছু দিয়ে কৃতজ্ঞতা,
লব্ধমনোরথ অর্থী রাজদ্বারে যথা
দ্বারী হস্তে দিয়ে যায় মুদ্রা দুই-চারি
মনের সন্তোষে।

কচ দেবযানীকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন,

ধর্ম জানে
প্রতারণা করি নাই, অপকট-প্রাণে
আনন্দ-অন্তরে তব সাধিয়া সন্তোষ,
সেবিয়া তোমারে যদি করে থাকি দোষ,
তার শাস্তি দিতেছেন বিধি।

দেবযানীর কাছে কচ ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন।—

ক্ষম মোরে, দেবযানী,
ক্ষম অপরাধ।

কিন্তু দেবযানী কচকে ক্ষমা করতে পারেন নি। বলেছিলেন,

তোমা-'পরে
এই মোর অভিশাপ—যে বিদ্যার তরে
মোরে কর অবহেলা, সে বিদ্যা তোমার
সম্পূর্ণ হবে না বশ—তুমি শুধু তার
ভারবাহী হয়ে রবে, করিবে না ভোগ ;
শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ।

এই অভিশাপের উত্তরে রবীন্দ্রনাথের কচ দেবযানীকে বর দিলেন—

আমি বর দিনু, দেবী, তুমি সুখী হবে।
ভুলে যাবে সর্ব গ্লানি বিপুল গৌরবে।

কিন্তু মহাভারতের কচ তা পারেন নি। চিরন্তন প্রথা অনুযায়ী তিনি শাপের উত্তরে শাপ দিলেন, তোমার কামনাও সার্থক হবে না, কোনও ঋষিপুত্র তোমাকে বিবাহ করবেন না।

মহাভারতের পাতা বন্ধ করে আমি এই কচের আচরণের কথা খানিকক্ষণ ভাবলাম। শাপই দিন আর বরই দিন, কচ দেবযানীর প্রেম প্রত্যাখ্যান করেছিলেন! রবীন্দ্রনাথের কচ বললেন,

ছিল মনে
কব না সে কথা। বলো কী হইবে জেনে
ত্রিভুবনে কারো কাছে নাই উপকার,
একমাত্র শুধু যাহা নিতান্ত আমার
আপনার কথা। ভালোবাসি কিনা আজ
সে তর্কে কী ফল ?

যে দায়িত্ব নিয়ে তিনি দীর্ঘ সহস্র বৎসর গুরুগৃহে বাস করলেন, সে দায়িত্ব তাঁকে নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পূর্ণ করতে হবে।

দেব-সবে
এই সঞ্জীবনী বিদ্যা করিয়া প্রদান
নূতন দেবত্ব দিয়া তবে মোর প্রাণ
সার্থক হইবে ; তার পূর্বে নাহি মানি
আপনার সুখ।

মহাভারতেও এই প্রত্যাখ্যানের সঙ্গত কারণ নেই। দেবযানী স্পষ্ট ভাষায় কচকে অনুরোধ করেছিলেন, তুমি আমাকে বিবাহ কর। এই প্রস্তাবের উত্তরে কচ শাস্ত্র বাক্য শুনিয়েছিলেন, তুমি গুরু-কন্যা, তুমি আমার পূজনীয়া।

দেবযানী এ কথা মেনে নেন নি। বলেছিলেন, আমার প্রীতির সম্বন্ধ তুমি অস্বীকার করতে পার না।

কচ তখন তাঁদের সম্পর্ক ভাইবোনের সম্পর্ক বলে ঘোষণা করেন। গুরুর দেহে বাস করে তিনিও দেবযানীর মতো শুক্রাচার্যের আত্মজ।

দেবযানী এ কথাও মেনে নেন নি, বলেছিলেন, আমার প্রার্থনা যদি প্রত্যাখ্যান কর তবে তোমার বিদ্যা নিষ্ফল হবে।

আমার মনে হল, কচ দেবযানীকে বিবাহ করতে পারতেন। শুক্রাচার্য এই বিবাহে সানন্দেই সম্মতি দিতেন, এবং কচ দেবযানীকে নিয়ে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করলে বৃহস্পতি বা অন্য দেবতারা তাঁর নিন্দা করতেন না। দেবযানীর জন্য আমার দুঃখ হল, আমি কচকে কিছুতেই সমর্থন করতে পারলাম না।

চেনেলু যে অনেক ক্ষণ থেকে আমাকে লক্ষ্য করছিল, আমি তা বুঝতে পারি নি। তার কণ্ঠস্বর শুনে আমি চমকে উঠলাম। প্রশ্ন করল : অমন গভীর মনোযোগে কী ভাবছ ?

আমি সহজভাবে উত্তর দিলাম : দেবযানীর কথা।

আমার উত্তর শুনে চেনেলু একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেলল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : দীর্ঘ শ্বাস কেন ?

চেনেলু বলল ঃ বলিহারি! আমি ভেবেছিলাম, হয়তো কোন আধুনিক দেবযানীর কথা ভাবছ।

এ কথার উত্তরে আমি শুধু হাসলাম।

চেনেলু বলল ঃ মহাভারতের এ চরিত্র সত্য নয়। নারী কোন দিন পুরুষকে কামনা করে না।

আমি বললাম ঃ এ কথাও সত্য নয়।

আমার উত্তর চেনেলুর পছন্দ হল না। সে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুল।

আমি আবার মহাভারত খুললাম।

কচের বিদায়ের পরেই দেবযানীর কাহিনী শেষ হয় নি। তার নূতন জীবন শুরু হয়েছে ক্ষত্রিয় রাজা যযাতির সঙ্গে। দেবযানী একদিন অসুররাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা ও তার সহচরীদের সঙ্গে জলকেলি করছিলেন। ইন্দ্র বায়ুরূপে তাদের বসন ওলোটপালট করে দিয়ে গেলেন। জল থেকে উঠে শর্মিষ্ঠা দেবযানীর বস্ত্র পরলেন ভুল করে। দেবযানী তাঁকে সদাচারহীন বলে তিরস্কার করলেন। শর্মিষ্ঠাও তাঁকে স্তাবকের কন্যা বলে অপমানিত করলেন। দেবযানী তাঁর বস্ত্র কেড়ে নেবার চেষ্টা করতে শর্মিষ্ঠা তাঁকে এক কূপের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিলেন। রাজা যযাতি এসেছিলেন মৃগয়ায়। দেবযানীর কান্না শুনে তিনি সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। দেবযানী নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছিলেন, আপনাকে কুলশীলযুক্ত বীর্যবান দেখছি, আপনি আমার দক্ষিণ হাত ধরে তুলুন।

যযাতি তাঁকে উদ্ধার করে ফিরে গিয়েছিলেন।

এই পর্যন্ত পড়ে আমার মনে হল যে যযাতিকে এই অনুরোধের মধ্যে দেবযানীর কোন ইঙ্গিত ছিল। দেবযানী কি যযাতিকে তাঁর পাণি গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেছিলেন!

এর পরে আমরা দেবযানীর প্রতিশোধের বাসনা দেখতে পাই।

তিনি তাঁর পিতাকে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে বললেন, এর একটা বিহিত করতেই হবে।

কিন্তু শুক্রাচার্য তপস্বী ব্রাহ্মণ। তিনি বললেন, সাধুজনের শ্রেষ্ঠ গুণ হল ক্ষমা, ক্ষমা দিয়ে যে ক্রোধকে জয় করতে পারে, জগৎ জয় করা তার পক্ষে সম্ভব।

কঠিন ভাবে দেবযানী বললেন, ও তত্ত্বকথা আমি জানি। নীচের নিকট অপমানিত হওয়ার চেয়ে মৃত্যু ভাল। এ আমার বাক্‌ক্ষত, অস্ত্রাঘাতের ক্ষত হলে চিকিৎসায় সারত।

শুক্রাচার্য অনন্যোপায় হয়ে অসুর রাজের কাছে গেলেন, বললেন: আর আমি তোমার রাজ্যে থাকতে পারব না। তুমি বার বার আমার প্রিয় শিষ্য কচকে হত্যা করেছ, এবারে আমার কন্যাকে কূপে ফেলে দিয়েছ। আমি চললাম।

বৃষপর্বা বললেন, এসব কাজ যদি আমি করে থাকি, তবে আমাকে আপনি শাস্তি দিন। আপনি চলে গেলে আমি সমুদ্রে ডুবে মরব।

গুরু প্রসন্ন হয়ে বললেন, আমার কন্যাকে তুমি প্রসন্ন কর।

রাজা দেবযানীকে প্রসন্ন হতে বললেন। দেবযানী বললেন, সহস্র কন্যার সঙ্গে শর্মিষ্ঠাকে দাসীরূপে পেলে আমি প্রসন্ন হব। আর আমার বিবাহ হলে এরাও আমার পতিগৃহে যাবে।

রাজা সম্মত হলেন। শর্মিষ্ঠা দেবযানীর দাসী হল।

এর পরে আবার সেই যযাতির কাহিনী। যযাতি আবার এলেন মৃগয়ায়। আবার দেখা হল দেবযানীর সঙ্গে। পরিচয় হল। দেবযানী যযাতির নিকট আত্মনিবেদনে উন্মুখ হলেন। যযাতি বললেন, আমি তোমার যোগ্য নই। ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে বিবাহে তোমার পিতা রাজী হবেন না।

তারপর সেই পাণি গ্রহণের কথা। দেবযানী বললেন, আপনি পূর্বেই আমার পাণি গ্রহণ করেছেন।

তারপর পিতাকে ডেকে বললেন, এই রাজা আমার পাণি গ্রহণ করে কূপ থেকে উদ্ধার করেছিলেন। এঁর হাতে আমাকে সম্প্রদান করুন, আমি অন্য পতি বরণ করব না।

শুক্রাচার্য বললেন, প্রণয় কখনও ধর্মের অপেক্ষা রাখে না। তাই তুমি যযাতিকে বরণ করেছ। কচের শাপের কথাও আমার মনে আছে। তোমাকে আমি যযাতির হাতেই সম্প্রদান করলাম।

শর্মিষ্ঠাকে দেখিয়ে যযাতিকে বললেন, ইনি রাজা বৃষপর্বার কুমারী কন্যা শর্মিষ্ঠা। এঁকে তুমি সসম্মানে রেখ, নিজের শয্যায় কখনও ডেকো না।

রাজা যযাতি দেবযানী ও সহস্র কন্যাসহ শর্মিষ্ঠাকে নিয়ে নিজের রাজধানীতে ফিরে গেলেন।

দেবযানীর কাহিনী এইখানেই শেষ হয় নি। শর্মিষ্ঠার সৌভাগ্য দেখে আবার বিবাদ আরম্ভ হয়। শর্মিষ্ঠা গোপনে যযাতির সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করেছিলেন। একদিন যযাতিকে নিভৃতে পেয়ে তাঁর কামনার কথা জানিয়েছিলেন। শুক্রাচার্যের আদেশ যযাতির মনে ছিল। সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিতেই শর্মিষ্ঠা বললেন, নারীর মনোরঞ্জনের জন্য মিথ্যা ভাষণে দোষ নেই। যযাতি শর্মিষ্ঠার জীবন ব্যর্থ হতে দেন নি।

দেবযানীর দুই পুত্র জন্মেছিল, আর শর্মিষ্ঠার তিন। একদিন এই সত্য আবিষ্কার করে দেবযানী ক্রোধে অন্ধ হলেন। পিতার নিকটে গিয়ে স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন। যযাতিও তাঁকে অনুসরণ করে শুক্রাচার্যের নিকটে গিয়েছিলেন। শুক্রাচার্য জামাতাকে শাপ দিলেন, তোমার এই অধর্মের জন্য জরা তোমাকে গ্রাস করবে।

তারপর যযাতির অনুনয়ে তিনি শান্ত হলেন, বললেন, বেশ, তোমার জরা তুমি অন্যকে দিতে পারবে।

যযাতি বললেন, তবে আশীর্বাদ করুন, আমার যে পুত্র তার

যৌবনের বিনিময়ে আমার জরা নেবে, সেই হবে রাজত্বের অধিকারী।

শুক্রাচার্য বললেন, তাই হোক।

যযাতি প্রথমে দেবযানীর দুই পুত্রকে, পরে শর্মিষ্ঠার তিন পুত্রকে একে একে ডাকলেন। না, কেউ তাঁর যৌবনের বিনিময়ে পিতার জরা নেবে না। রাজী হল শর্মিষ্ঠার কনিষ্ঠ পুত্র পুরু। পিতার পাপে পুত্র হল জরাগ্রস্ত।

সহস্র বৎসর পরে পুরুকে ডেকে যযাতি বললেন, বৎস, কামনার শেষ নেই। ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। অতএব তৃষ্ণা আমাদের ত্যাগ করা উচিত। তস্মাৎ তৃষ্ণাং পরিত্যজেৎ। আমি অনেক ভোগ করেছি, এবারে তুমি তোমার যৌবন ফিরিয়ে নাও, আমার রাজ্যও নাও।

পুরুকে তাঁর যৌবন ও রাজ্য দিয়ে জরাগ্রস্ত যযাতি বনবাসে গেলেন।

আট

তাউজী আমাদের বলেছিলেন যে ঋষির কথায় বেশি কালক্ষেপ করলে আমাদের চলবে না। অসংখ্য ঋষি, তাঁদের কাহিনীরও শেষ নেই। সমস্ত ঋষির সমস্ত কাহিনী শুনতে হলে শাশ্বত ভারতের সব কথা শোনা আমাদের হবে না। তাউজী বোধহয় গুরুজীকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তাই উপাসনার মন্দিরে আজ গুরুজী সংক্ষেপে বলতে লাগলেন। সপ্তর্ষির তিন জন ঋষির কথা বললেন পর পর। পুলস্ত্য পুলহ ও ক্রতুর কথা। বশিষ্ঠ শুধু বাকি রইলেন। বশিষ্ঠের কথা বোধ হয় এমন সংক্ষেপে বলা যায় না।

পুলস্ত্য ব্রহ্মার মানস পুত্র, ব্রহ্মার কর্ণ থেকে তাঁর জন্ম। সুমেরু পর্বতের নিকট তৃণবিন্দু মুনির আশ্রম। সেই আশ্রমের এক প্রান্তে তিনি তপস্যা করতেন। মাঝে মাঝে অপ্সরা ও মুনিকন্যারা আসত। তাদের নৃত্য গীতে পুলস্ত্যের তপোভঙ্গ হত, বিঘ্ন হত তপস্যার। একদিন বিরক্ত হয়ে তিনি এক অদ্ভুত অভিশাপ দিলেন। আশ্রমের এই প্রান্তে এসে যে নারী তাঁর তপোভঙ্গ করবে, সে অন্তঃসত্ত্বা হবে তাঁর দৃষ্টিপাতে। অদৃষ্টের পরিহাসে অভাবনীয় ঘটনা ঘটল। তৃণবিন্দুর কন্যা হবির্ভূ তাঁর বেদপাঠ শুনতেন। একদিন যখন একাগ্র চিত্তে হবির্ভূ পুলস্ত্যের দিকে চেয়ে বেদপাঠ শুনছেন, তখন পুলস্ত্যের দৃষ্টি তাঁরই উপরে পড়ল। প্রথম নারীর উপরে অভিশাপ সফল হল। এই কথা জেনে তৃণবিন্দু বললেন, হবির্ভূকে তুমি বিবাহ কর। আর কোন উপায় নেই।

পুলস্ত্য এই কন্যার পাণিগ্রহণ করলেন। জন্ম হল বিশ্রবার।

ব্রহ্মার নিকট থেকে পুলস্ত্য আদি পুরাণ ব্রহ্ম পুরাণ লাভ

করেছিলেন। এই পুরাণ তিনি বশিষ্ঠের পৌত্র পরাশরকে শিক্ষা দেন। পরাশর তা সর্বসাধারণে প্রচার করেন। পুলস্ত্যের নামে একখানি স্মৃতি গ্রন্থও প্রচলিত আছে। কমলাকরের শূদ্রধর্মতত্ত্বে তার উল্লেখ আছে।

এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে গুরুজী বললেন: পুলস্ত্যের একমাত্র পুত্রের নাম বিশ্রবা।

বিশ্রবা নাম আমরা জানি। রামায়ণে আমরা এই নাম পড়েছি। লঙ্কার রাক্ষস রাজা রাবণ ছিলেন বিশ্রবার পুত্র। ইনিই কি পৌলস্ত্য বিশ্রবা? আমরা গুরুজীর পরের কথা শোনবার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

গুরুজী বললেন: রামায়ণে তোমরা এই বিশ্রবা নাম পড়েছ। ইনি রাবণের পিতা। রাক্ষস রাবণ জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। রাবণকে বধ করে তাই রামচন্দ্রের ব্রহ্ম বধের পাপ হয়েছিল। সেই পাপ ক্ষালনের জন্য তাঁকে রামেশ্বরে শিব প্রতিষ্ঠা করে পূজা করতে হয়েছিল।

ঋষির পুত্র কী করে রাক্ষস হল, সে কথা আমার মনে ছিল না। হয়তো অনেকেরই ছিল না। রামায়ণের অনেক কথাই আমরা ভুলে গেছি।

গুরুজী বললেন: বিশ্রবা বিবাহ করেছিলেন ভরদ্বাজের কন্যা দেববর্ণিনীকে। অনেকে বলেন যে এই কন্যার নাম ছিল ইড়বিড়া বা ইলবিড়া। এঁদের পুত্রের নাম কুবের। কুবের সুপুরুষ ছিলেন না। তিন পা ও আট দাঁতে তাঁকে অত্যন্ত কুৎসিত দেখাত। এই জন্যেই তাঁর নাম হয়েছিল কুবের। কুবের মহাবনে গিয়ে দু হাজার বছর তপস্যা করেছিলেন। ব্রহ্মা তাঁকে বর দিয়েছিলেন যে তিনি অমর হবেন, উত্তর দিকের দিকপাল ও ধনাধিপতিও হবেন। আর দিয়েছিলেন পুষ্পক রথ। ঋষিপুত্র কুবেরকে ব্রহ্মা দেবতার সমান মর্যাদা দিয়েছিলেন। ত্রিকূট শিখরস্থ লঙ্কায় বিশ্বকর্মা যে পুরী

নির্মাণ করেছিলেন, পিতা বিশ্রবা কুবেরকে সেইখানে বাস করতে বললেন।

তপস্যারত ধার্মিক বিশ্রবা রাক্ষসেরও জন্মদাতা। সুমালী রাক্ষসের কৌশলে তাঁর কন্যা নিকষা বা কৈকসীকে তাঁর বিবাহ করতে হয়। একদা লঙ্কায় রাক্ষসদের বাসভূমি ছিল। বিষ্ণুর নিকট যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তারা পাতালে আশ্রয় নিয়েছিল। সুমালী তাঁর সুন্দরী কন্যার বিবাহের জন্য পাতাল থেকে বেরিয়ে এসে পাত্রের অন্বেষণ করতে লাগলেন এবং বিশ্রবাকে মনোনীত করলেন। তাঁর মনে হল যে বিশ্রবার পুত্র বিষ্ণুকে পরাজিত করে তাঁদের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পারবে। তাই কন্যাকে বিশ্রবার নিকট পাঠালেন। ধ্যানযোগে ঋষি সমস্ত অবগত হয়ে বললেন, এই বিবাহের ফলে রাক্ষসের জন্ম হবে।

কৈকসী তাতে নিবৃত্ত হলেন না, বললেন, এক সুপুত্রও যেন আমার হয়।

ঋষি বললেন, তথাস্তু, তোমার কনিষ্ঠ পুত্র ধার্মিক হবে।

এই বিবাহের ফলেই রাবণের জন্ম হয়। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দশানন বিংশভুজ। ক্রমে ক্রমে কুম্ভকর্ণ বিভীষণ ও সূর্পনখারও জন্ম হল। এঁদের সকলের বৃত্তান্ত আমরা রামায়ণে পড়েছি।

লিঙ্গ ও কূর্মপুরাণে বিশ্রবার চার পত্নী দেখি। দেববর্ণিনী ও তিনটি রাক্ষস কন্যা। তাদের প্রত্যেকের তিন পুত্র ও এক কন্যা। দেববর্ণিনীর শুধু একটি পুত্র কুবের। সেই কুবেরকে রাবণ লঙ্কা থেকে বিতাড়িত করলেন। পিতার আদেশে কুবের কৈলাসে এলেন। সেখানে একদিন রুদ্রাণীকে দেখে তাঁর এক চক্ষু দগ্ধ ও অন্য চক্ষু পিঙ্গল বর্ণ হয়ে যায়। কঠোর তপস্যা করে কুবের মহাদেবকে প্রসন্ন করেন।

লঙ্কায় রাবণ যখন সকলের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন, তখন কুবের কৈলাস থেকে তাঁর নিকটে দূত পাঠান। বলেন যে

দুষ্কর্ম নয়, ধর্মাচরণ কর। এই উপদেশের জন্য রাবণ কুবেরকে আক্রমণ করেন ও যুদ্ধে পরাস্ত করে তাঁর পুষ্পকরথ হরণ করে নিয়ে যান।

কুবের বিবাহ করেন আহুতিকে। তাঁর দুই পুত্রের নাম নলকুবের ও মণিগ্রীব। কন্যার নাম মীনাক্ষী। যক্ষ ও কিন্নরদের অধিপতি কুবের দশ দিকপালের অন্যতম। অন্যান্য দিকপালেরা হলেন ইন্দ্র অগ্নি যম নৈঋত বরুণ বায়ু মহাদেব ব্রহ্মা ও অনন্ত। দেবতাদের সঙ্গে কুবেরকেও আমরা পূজার সময় স্মরণ করি।

এর পরে গুরুজী পুলহের কথা বললেন। এত সংক্ষেপে তিনি আর কোন ঋষির কথা বলেন নি। তিনি যে ঋষিদের কথা তাড়াতাড়ি শেষ করতে চান, তা আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। গুরুজী বললেন: সপ্তর্ষিমণ্ডলীর অন্যতম পুলহ ব্রহ্মার মানস পুত্র, ব্রহ্মার নাভি থেকে তাঁর জন্ম। কর্দম ঋষির এক কন্যা গতিকে তিনি বিবাহ করেন। তাঁর পুত্রদের নাম কর্মশ্রেষ্ঠ বরীমান্ ও সহিষ্ণু।

গুরুজী ক্রতুর কথাও খুব সংক্ষেপে বললেন।

ক্রতুও ব্রহ্মার মানস পুত্র, সপ্তর্ষির অন্যতম। ব্রহ্মার হাত থেকে এঁর জন্ম হয়েছে। ষাট হাজার বালখিল্য ঋষি এঁর সন্তান। এঁরা খর্বাকৃতি অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ ছিলেন।

ঋগ্বেদে এই বালখিল্য ঋষিদের উল্লেখ আছে। এঁরা নাকি ব্রহ্মার লোম থেকে উৎপন্ন হয়েছেন। বালখিল্যদের সম্বন্ধে যে কাহিনী প্রচলিত আছে, মহাভারতের আদি পর্বে তোমরা তা পড়ে নিও।

আমার মনে হয়, সে কাহিনী আমাদের জানা হয়ে গেছে। গরুড়ের জন্ম বৃত্তান্তে আমরা বালখিল্যদের কাহিনী জেনেছি।

খানিকক্ষণ থেমে গুরুজী বললেন: সপ্তর্ষির সপ্তম ঋষি হলেন বশিষ্ঠ, ভারতের শ্রেষ্ঠ ঋষি বলে সর্বজনস্বীকৃত। বশিষ্ঠের চরিত্র আলোচনায় আমরা একটি আদর্শ পুরুষকে দেখতে পাব।

পুরাণ মতে ব্রহ্মার মন থেকে বশিষ্ঠর জন্ম। কর্দম ঋষির কন্যা অরুন্ধতীকে তিনি বিবাহ করেছিলেন।

বেদের বশিষ্ঠ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের অধিকাংশ ঋক্ই তাঁর রচিত। তাঁর জন্ম সম্বন্ধে বেদে একটি কাহিনী আছে।—

উত্তাসি মৈত্রবরুণো বসিষ্ঠোর্বশ্যা
ব্রহ্মন্ মনসোঽধি জাতা।

হে বশিষ্ঠ, তুমি মিত্র ও বরুণের পুত্র। হে ব্রহ্মন্, উর্বশীর মন থেকে তুমি জাত।

বৃহদ্দেবতা নামে বৈদিক গ্রন্থেও এই কাহিনীর উল্লেখ আছে। এ নিয়ে আলোচনাও আছে অনেক রকম। সে সব আলোচনা এখানে অবান্তর।

গুরুজী বললেন ঃ বেদের ঋষিদের সম্বন্ধে আমরা অল্পই জানি। তাঁদের জীবন নিয়ে আলোচনা করবার মতো উপাদান আমাদের হাতে নেই। কিন্তু পৌরাণিক ঋষিদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁদের একজনের কথা আর একজনে বলেছেন। ঋষি ও ঋষিপত্নীদের জীবন নিয়ে অনেক কাহিনী আছে। সে সব কাহিনী আমরা রামায়ণ ও মহাভারতে পাই, পাই অষ্টাদশ পুরাণে।

গুরুজী একটু থেমে বললেন ঃ বশিষ্ঠের জীবনে যদি বিশ্বামিত্র এসে দেখা না দিতেন, তাহলে তাঁর চরিত্র এমন উজ্জ্বল হয়ে হয়তো উঠত না। বশিষ্ঠ ছিলেন একজন অত্যন্ত সাদাসিধে ভাল মানুষ গোছের ঋষি। তিনি সকল ইন্দ্রিয় জয় করে পরম শান্তিতে নিজের আশ্রমে বাস করছিলেন। এমন সময় দেখা দিলেন মহারাজা বিশ্বামিত্র।

বিশ্বামিত্রের চেয়ে শক্তিমান চরিত্র সে যুগে আর দ্বিতীয় ছিল না। তাঁর মতো অধ্যবসায়ের উদাহরণ পৃথিবীতে আর কোন দেশে নেই। একদিকে ব্রাহ্মণ ঋষি বশিষ্ঠ ও অন্য দিকে ক্ষত্রিয় রাজা

বিশ্বামিত্র সে যুগের সমাজ ব্যবস্থাকে গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছিলেন। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রর বিবাদ কোন ব্যক্তিগত বিবাদ নয়, একটা সামাজিক বিপ্লব বলে আমার মনে হয়েছে। এই বিপ্লবে জয় হয়েছে যোগ্যতার, ব্যক্তির অধিকারের কাছে সামাজিক অনুশাসন হয়েছে খর্ব। অপরিসীম অধ্যবসায়ে বিশ্বামিত্র শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছিলেন, কিন্তু বশিষ্ঠের সম্মান তাতে ক্ষুণ্ণ হয় নি। বিশ্বামিত্রের জয় তিনি প্রসন্ন মনে মেনে নিয়েছিলেন।

বিশ্বামিত্র শুধু পৌরাণিক ঋষি নন, তিনি বেদেরও মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের সমস্ত সূক্তের মন্ত্রগুলি তাঁর রচনা।

পুরাণে তাঁর জন্ম দেখি পুরুবংশে। কান্যকুব্জের রাজা কুশের পুত্র কুশিক। তাঁর পুত্র গাধি ও পৌত্র বিশ্বামিত্র। দেবরাজ ইন্দ্রের মতো পুত্র লাভের বাসনায় রাজা কুশিক সহস্র বর্ষ তপস্যা করেন। ইন্দ্র প্রথমে ভয় পেয়েছিলেন, তারপর নিজের অংশে গাধিরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কুশিকের মহিষী পৌরকুৎসীর গর্ভে। গাধির সত্যবতী নামে এক কন্যা হল, কিন্তু কোন পুত্র হল না।

এরও পূর্বের একটু ইতিহাস আছে। ভৃগুপুত্র চ্যবন দিব্যদৃষ্টিতে জেনেছিলেন যে কুশিক বংশ থেকে ভৃগু বংশে ক্ষত্রাচার সংক্রামিত হবে। তাই তিনি কুশিক বংশ দগ্ধ করতে চেয়েছিলেন। মহারাজ কুশিক ও তাঁর মহিষীর ছিদ্রান্বেষণে এসে তাঁদের সর্বতোভাবে পরীক্ষা করলেন। রাজা ও রাণী অনিদ্রায় ও অনাহারে দিনের পর দিন ঋষির সেবা করলেন, হাসি মুখে সহ্য করলেন ঋষির সমস্ত অত্যাচার। চ্যবন সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, পরীক্ষায় তোমরা উত্তীর্ণ হয়েছ, তোমরা বর নাও।

রাজা বললেন, আপনার ক্রোধে যে আমরা দগ্ধ হয়ে যাই নি, এই তো আমাদের পরম লাভ।

চ্যবন বললেন, আমি ব্রহ্মার কাছে শুনেছিলাম যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বিরোধে কুল সংকর হবে। তাই তোমাদের দগ্ধ করতে

চেয়েছিলাম। আমি জানি যে তুমি ব্রাহ্মণত্বলাভের অভিলাষী। কিন্তু ব্রাহ্মণত্ব বড় দুর্লভ বস্তু। তবু আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি যে তোমার পৌত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভে সমর্থ হবে।

এই পৌত্রই বিশ্বামিত্র।

চ্যবন যে সন্দেহ করে কুশিক বংশ দগ্ধ করতে চেয়েছিলেন, তাও সত্যে পরিণত হয়। ভার্গব ঋচীক গাধি রাজার নিকট গিয়েছিলেন সত্যবতীর পাণিপ্রার্থী হয়ে। গাধি ঋচীককে তাঁর কন্যাদান করেন। ব্রাহ্মণগুণসম্পন্ন এক পুত্র কামনায় ঋচীক তাঁর স্ত্রীর জন্য এক পাত্র চরু প্রস্তুত করেন। ঐ সঙ্গে অপুত্রক শাশুড়ীর জন্য আর এক পাত্র চরু প্রস্তুত করেন। তাতে ক্ষত্রিয়গুণ সম্পন্ন এক মহাবলবান পুত্র লাভের সম্ভাবনা ছিল। মাতার প্ররোচনায় কন্যা এই পাত্র পরিবর্তন করে নিলেন। কন্যা মাতার চরু খেলেন, আর মাতা কন্যার। তারপরেই সত্যবতী নিজের ভুল বুঝতে পেরে স্বামীর নিকট সব কথা অকপটে স্বীকার করলেন। ঋচীক বললেন, আর উপায় নেই। তাঁর ক্ষত্রিয় স্বভাবের পুত্র হবে। শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর অনুনয়ে এই স্থির হল যে পুত্র নয় তাঁর পৌত্র পাবে ক্ষত্রিয়ের স্বভাব। পুত্র জমদগ্নির জন্ম হল। তাঁর পুত্র পরশুরাম ক্ষত্রিয়ের স্বভাব পেয়েছিলেন। ওদিকে গাধির পুত্র হল বিশ্বামিত্র, ক্ষত্রিয়-কুলে ব্রাহ্মণের স্বভাব নিয়ে জন্মালেন ভারতের এক অদ্বিতীয় তপস্বী।

বশিষ্ঠের সঙ্গে বিশ্বামিত্রর দেখা হয়েছিল এক অশুভ মুহূর্তে। বশিষ্ঠ অরণ্যে আশ্রমবাসী, আর বিশ্বামিত্র কান্যকুব্জের সিংহাসনে সগৌরবে অধিষ্ঠিত। একদিন সসৈন্যে মৃগয়ায় এসে তৃষ্ণার্ত ও ক্লান্ত দেহে বশিষ্ঠের আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। বশিষ্ঠ তাঁকে সসম্মানে গ্রহণ করলেন, বললেন, যদি অনুমতি করেন তাহলে আপনাদের উপযুক্ত সংকারের ব্যবস্থা করি।

রাজার সঙ্গে অনেক সৈন্য সামন্ত। তিনি এই ঋষির কোন

অসুবিধার সৃষ্টি করতে চাইলেন না। কিন্তু বশিষ্ঠের আগ্রহে তাঁর আতিথ্য স্বীকারে বাধ্য হলেন। কিন্তু এই সামান্য ঘটনা থেকেই তাঁদের জীবনব্যাপী বিবাদের সূত্রপাত হল।

বশিষ্ঠ তাঁর কামধেনু শবলাকে বললেন রাজার উপযুক্ত আয়োজন করতে। শবলার অপর নাম সুরভি, কেউ বলেন নন্দিনী। ছয় রসের সমাবেশে অপূর্ব ব্যবস্থা করে শবলা সসৈন্য বিশ্বামিত্রকে যুগপৎ প্রীত ও বিস্মিত করল। বিশ্বামিত্র ভাবলেন, এই কামধেনু তাঁর চাই, এই অমূল্য রত্ন রাজগৃহেরই উপযুক্ত। বিদায় কালে রাজা ঋষিকে বললেন, আপনাকে সহস্র ধেনু দিচ্ছি, আপনার কামধেনুটি আমাকে দিন।

এই প্রস্তাব শুনে বশিষ্ঠ দুঃখিত হলেন। অতিথির কোন বাঞ্ছা অপূর্ণ রাখতে নেই, অথচ এ যে তাঁর পক্ষে মর্মান্তিক দান হবে।

বিশ্বামিত্র বললেন, আমার অর্ধেক রাজত্ব আপনি বিনিময়ে গ্রহণ করুন।

বশিষ্ঠ বললেন, রাজ্যে আমার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই সহস্র ধেনুতেও। শবলা আমার কন্যার মতো, তাকে বিদায় দিয়ে আমি বাঁচব না।

রাজা সরোষে বললেন, বেশ, আপনার শবলাকে আমি সবলে নিয়ে যাব।

বলে সৈন্যদের সেই আদেশ দিলেন।

সৈন্যরা যখন শবলাকে আকর্ষণ করল তখন সে কাতর কণ্ঠে ঋষিকে বলল, প্রভু, আমাকে রক্ষা করুন।

বশিষ্ঠ ব্যথিত চিত্তে বললেন, রাজা তোমাকে সবলে নিয়ে যাচ্ছেন। ক্ষত্রিয়ের বল তেজ, ব্রাহ্মণের বল ক্ষমা। আমি কেমন করে রক্ষা করব!

শবলা বলল, প্রভু, আপনি ব্রাহ্মণ, আপনার শক্তির অভাব কী! আপনার আদেশ পেলে আমি নিজেই আত্মরক্ষা করতে পারি।

অনন্যোপায় হয়ে বশিষ্ঠ বললেন, তবে তাই কর।

মুহূর্ত মধ্যে শবলার রূপ পরিবর্তিত হল। তার বিভিন্ন অঙ্গ থেকে পহ্লব দ্রবিড় যবন শবর কিরাত বর্বর শক হূন ম্লেচ্ছ প্রভৃতি সেনা উৎপন্ন হয়ে রাজার সেনাদল আক্রমণ করল। বিশ্বামিত্রের শত পুত্র বশিষ্ঠকে আক্রমণ করতে আসছিল। বশিষ্ঠের হুঙ্কারেই তারা ভস্ম হয়ে গেল। বিশ্বামিত্রের সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করল।

ক্ষুব্ধ মর্মাহত বিশ্বামিত্র হিমালয়ে গিয়ে মহাদেবের তপস্যা করলেন। তাঁকে তুষ্ট করে আনলেন সাঙ্গোপাঙ্গ মন্ত্রের সঙ্গে সরহস্য ধনুর্বেদ। তারপর আবার এলেন বশিষ্ঠের আশ্রমে, নূতন দিব্যাস্ত্র দিয়ে ঋষির আশ্রম দগ্ধ করতে লাগলেন। আশ্রমবাসীর ভয় দেখে বশিষ্ঠ দাঁড়ালেন তাঁর ব্রহ্মদণ্ড নিয়ে। একে একে বিশ্বামিত্র তাঁর সমগ্র অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন—আগ্নেয়াস্ত্র বারুণ ঐন্দ্র পাশুপত। কিন্তু সব ব্যর্থ হল। বশিষ্ঠের ব্রহ্মদণ্ডের প্রভাবে সব অস্ত্র পরাস্ত হল।

বিশ্বামিত্র অবশেষে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। অন্তরীক্ষে দেবতারা ও পৃথিবীতে ঋষিরা হলেন সন্ত্রস্ত। সহাস্যে বশিষ্ঠ তাঁর দণ্ড দিয়ে সেই ব্রহ্মাস্ত্র নিরাকৃত করলেন।

পরাজিত বিক্ষুব্ধ রাজা বিশ্বামিত্র বুঝতে পারলেন যে বাহুবল বল নয়, বল ব্রাহ্মণের, বল তপস্যার।

ধিগ্‌ বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজোবলং বলম্।
বলাবলং বিনিশ্চিত্য তপ এব পরং বলম্॥

ধিক্ ক্ষত্রিয়বলকে, ব্রহ্মতেজই বল। এই সমস্ত দেখে এখন বুঝলাম যে তপোবলই পরম বল।

বিশ্বামিত্র আর রাজধানীতে ফিরলেন না। রানীকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণে গিয়ে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলেন। এক হাজার বৎসর তপস্যার পর ব্রহ্মা এসে বর দিলেন, তুমি রাজর্ষি হবে।

বিশ্বামিত্র এই বর লাভ করে প্রীত হলেন না। তপস্যা তাঁর

ব্যর্থ হয়েছে বলে মনে হল। তিনি তো রাজর্ষি হতে চান নি, তিনি চেয়েছিলেন ব্রাহ্মণ হতে। ব্রহ্মা তাঁকে রাজর্ষি বলে ভুলিয়ে গেলেন। বিশ্বামিত্র আবার তপস্যা শুরু করলেন।

এই সময়ে ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা ত্রিশঙ্কু গিয়েছিলেন তাঁর কুলগুরু বশিষ্ঠের কাছে। সশরীরে স্বর্গে যাবার বাসনা জানিয়েছিলেন তাঁর কাছে। বলেছিলেন, এমন যজ্ঞ করুন, যার প্রভাবে আমি এই অসাধ্য সাধন করতে পারি।

বশিষ্ঠ স্পষ্ট ভাষায় বললেন, তা অসম্ভব। রাজার অনেক মিনতিতেও তিনি এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে রাজী হলেন না।

বশিষ্ঠের শতপুত্র তখন দক্ষিণ দেশে তপস্যা করছিলেন। ত্রিশঙ্কু তাঁদের কাছে গিয়ে সেই একই অভিপ্রায় নিবেদন করলেন। তাঁরা রাজাকে ভর্ৎসনা করে বললেন, আপনার দুর্বুদ্ধি হয়েছে। গুরুর প্রত্যাখ্যানের পর আপনি অন্যের নিকট এসেছেন। বশিষ্ঠ যা অসম্ভব বলেছেন, আমরা তা সম্ভব করতে পারব না।

ত্রিশঙ্কু এই ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হলেন, বললেন, বেশ, আমি এবারে অন্যত্র চেষ্টা করব।

বশিষ্ঠের পুত্ররা ত্রিশঙ্কুর এই অসদাচরণের জন্য শাপ দিলেন, তুমি চণ্ডাল হও।

চণ্ডালের রূপ পেতেই মন্ত্রী ও অমাত্যরা রাজাকে পরিত্যাগ করে চলে গেল।

ত্রিশঙ্কু গেলেন বিশ্বামিত্রের কাছে। সবিনয়ে সব কথা তাঁকে নিবেদন করলেন। বললেন, আমি ধর্মানুসারে প্রজাপালন করেছি, সদাচারে সন্তুষ্ট করেছি গুরুজনদের, জীবনে কখনও অসত্য বলি নি। এ পর্যন্ত এক শত যজ্ঞ করেছি, আরও যজ্ঞ করব। এতেও যদি আমি সশরীরে স্বর্গে যেতে না পারি, তাহলে বুঝব যে পুরুষকার নিরর্থক, এবং দৈবই প্রবল।

বিশ্বামিত্র তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, কে বলে তুমি সশরীরে স্বর্গে যেতে পারবে না! আমি তোমার যজ্ঞ সম্পাদন করব।

দক্ষিণ দেশে আসবার পর বিশ্বামিত্রের চার পুত্রের জন্ম হয়েছিল। তারা যজ্ঞের আয়োজন করতে লাগল, এবং তাঁর শিষ্যরা গেল ঋষিদের নিমন্ত্রণ করতে। ফিরে এসে তারা জানাল যে মহোদয় ঋষি ও বশিষ্ঠের শতপুত্র ভিন্ন অন্য সব ব্রাহ্মণেরা এই যজ্ঞে আসবেন। বশিষ্ঠের পুত্ররা বলেছেন যে চণ্ডালের যজ্ঞে ক্ষত্রিয় যাজক, এই যজ্ঞের হবি দেবতা ও ঋষিরা গ্রহণ করতে পারেন না। বিশ্বামিত্র এই কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিলেন যে সাত জন্ম তারা চণ্ডাল হয়ে দুর্গতি ভোগ করবে।

তারপর যজ্ঞ আরম্ভ হল, কিন্তু দীর্ঘকাল গত হবার পরেও কোন দেবতা যজ্ঞভাগ নিতে এলেন না। তখন অপমানিত ও ক্ষুব্ধ বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুকে বললেন, আমি আমার সমস্ত তপস্যার ফল প্রয়োগ করছি, তুমি সেই প্রভাবে স্বর্গে যাও।

সমবেত ব্রাহ্মণেরা সকলে আশ্চর্য হলেন, ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গারোহণ করলেন। তখন ইন্দ্র তাঁকে ধিক্কার দিয়ে বললেন, মূঢ়, স্বর্গবাসের অধিকার তোমার হয় নি, মাথা নিচু করে তুমি পৃথিবীতে পতিত হবে।

ত্রিশঙ্কুকে পড়তে দেখে বিশ্বামিত্র চেঁচিয়ে বললেন, তিষ্ঠ, তোমার জন্য আমি দ্বিতীয় স্বর্গ রচনা করছি। আমি নতুন ইন্দ্র সৃষ্টি করব।

এই বলে তিনি দক্ষিণ আকাশে নূতন সপ্তর্ষিমণ্ডল ও নক্ষত্র সৃষ্টি করলেন, এবং যখন দেবতা সৃষ্টি আরম্ভ করলেন তখন দেবতারা তাঁর সঙ্গে সন্ধি করলেন, বললেন, আকাশে জ্যোতিশ্চক্রের বাহিরে আপনার নক্ষত্ররা থাক, ত্রিশঙ্কু সেখানে দেবতুল্য হয়ে জ্যোতির্ময় রূপে অবস্থান করুন।

বিশ্বামিত্র এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন।

এর পর বিশ্বামিত্র তপস্যার জন্য পুষ্কর তীর্থে গেলেন।

এক সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলে গুরুজী এবারে থামলেন। আমাদের মনে হল, তিনি এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন, ক্লান্তি স্বাভাবিক। আমরা নিঃশব্দে তাঁকে বিশ্রামের অবকাশ দিলাম। কিন্তু তিনি যখন কথা কইলেন তখন বুঝতে পারলাম যে বিশ্রামের জন্য তিনি থামেন নি, তিনি থেমেছিলেন অন্য কারণে। বললেন: এই সব ঋষিদের জীবনে অনেক ঘটনা ঘটেছে, তার কোন পরম্পরা নেই। পুরাণকার কোন ঋষির জীবন এক জায়গায় গ্রথিত করেন নি, নানা প্রসঙ্গে নানা ঘটনার উল্লেখ আছে। এই সব ঘটনা পরপর সাজাবার জন্যে যে সূত্রের প্রয়োজন, তা আমাদের হাতে নেই।

রামায়ণে আমরা বিশ্বামিত্রের জীবনের অনেক ঘটনা জানতে পারি। তাঁর ব্রাহ্মণত্ব লাভের পর তিনি অযোধ্যায় এসেছিলেন। রাক্ষসরা তখন ব্রাহ্মণদের যজ্ঞ নষ্ট করছে। তাদের হাত থেকে ব্রাহ্মণদের রক্ষা করবার জন্য তিনি রাম লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিলেন। তাড়কা বধের পর তিনি রাম লক্ষ্মণকে নিয়ে মিথিলায় জনক রাজার নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর আগমন সংবাদ পেয়ে জনক রাজা তাঁর পুরোহিত শতানন্দ ও ঋত্বিকদের সঙ্গে এগিয়ে এসে তাঁকে সম্বর্ধনা করেছিলেন। শতানন্দ গৌতম মুনির জ্যেষ্ঠপুত্র। অহল্যা উদ্ধার হয়েছেন জেনে তাঁর আনন্দের সীমা ছিল না। তিনি রামের নিকট বিশ্বামিত্রের জীবন কাহিনী বিবৃত করেছিলেন—বশিষ্ঠের সঙ্গে তাঁর বিরোধের কথা, ত্রিশঙ্কু ও শুনঃশেপের উপাখ্যান, এবং তাঁর ব্রাহ্মণত্ব লাভের কথা। এর পূর্বে বিশ্বামিত্র নিজেই তাঁর জন্মবৃত্তান্ত সঙ্গী ঋষিদের নিকট বলেছিলেন।

গুরুজী বললেন: এই প্রসঙ্গে রাজা কল্মাষপাদের কাহিনী বিবৃত হয় নি। বশিষ্ঠের সঙ্গে বিশ্বামিত্রের সেই সবচেয়ে নিষ্ঠুর আচরণ।

তাউজী বললেন : সে তো মহাভারতের কাহিনী !

গুরুজী বললেন : মহাভারতের আদি পর্বে আছে। গন্ধর্বরাজ অঙ্গারপর্ণ অর্জুনকে এই কাহিনী বলেছেন।

রামায়ণে শতানন্দ রাম লক্ষ্মণকে কেন বলেন নি ?

বিশ্বামিত্রের সামনে সেই কাহিনী বলা অশোভন হত। তাতে তাঁর মহত্ত্বের বদলে নিষ্ঠুরতার কথা প্রকাশ পেত।

গুরুজী খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেন : এই ঘটনা দক্ষিণ দেশে ঘটেছিল বলে আমি মনে করি। তার কারণ বিশ্বামিত্র নিজে ও বশিষ্ঠের শত পুত্র তখন দক্ষিণ দেশেই তপস্যা করছিলেন। পুষ্করে যাবার আগে এই ঘটনাটি ঘটেছিল।

ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা কল্মাষপাদ। তিনি একদিন অরণ্যে মৃগয়ায় এসে সংকীর্ণ বনময় পথে চলছিলেন। অবসন্ন দেহ ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত। অপর দিক থেকে বশিষ্ঠের জ্যেষ্ঠ পুত্র শক্ত্রি আসছিলেন। রাজা তাঁকে পথ ছেড়ে দিলেন না, শক্ত্রিও পথ ছাড়লেন না। এই নিয়ে বিবাদ হল। রাজা বললেন, পথ ছাড়।

শক্ত্রি বললেন, তুমি ছাড়। ব্রাহ্মণকে পথ ছেড়ে দেওয়াই সনাতন রীতি।

ক্রুদ্ধ রাজা ব্রাহ্মণকে কশাঘাত করলেন। শক্ত্রি অভিশাপ দিলেন, গর্বোদ্ধত রাজা, তুমি রাক্ষস হও।

এই সুযোগে বিশ্বামিত্র কিংকর নামে এক রাক্ষসকে রাজার শরীরে প্রবেশ করতে আদেশ দিলেন।

শাপগ্রস্ত রাজা একদিন শক্ত্রিকে বললেন, তুমি আমাকে শাপ দিয়েছিলে, আমি সকলের আগে তোমাকেই খাব।

এই বলে রাজা তাঁকে বধ করে খেয়ে ফেললেন। তারপর বিশ্বামিত্রের প্ররোচনায় বশিষ্ঠের বাকি নিরানব্বই জন পুত্রকেও খেয়ে ফেললেন।

এই সংবাদ পেয়ে বশিষ্ঠ শোকে উন্মত্তের মতো হয়েছিলেন। নানা তীর্থ পর্যটন করেও মনে শান্তি পান নি। হিমালয়ের শিখর থেকে লাফিয়ে পড়ে তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যু হয় নি। নিজেকে পাশবদ্ধ করে খরস্রোতা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু নদী তাঁকে পাশমুক্ত করে তীরে পৌঁছে দিয়েছিল। বিপাশা নামে সেই নদী আজও প্রবাহিতা। তারপর একদিন তিনি নিজের পিছনে বেদপাঠ শুনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। এখানে কে বেদ পাঠ করছে! এক নারী তাঁর সামনে এসে বললেন, আমি আপনার পুত্রবধূ অদৃশ্যন্তী, শক্তির স্ত্রী, আমার গর্ভে আপনার পৌত্রের বয়স হয়েছে দ্বাদশ বর্ষ, সেই বেদপাঠ করছে।

বশিষ্ঠের এই পৌত্রের নাম পরাশর।

মনে মনে আমি আশ্চর্য হলাম। এই সব কাহিনী এ যুগে অসম্ভব বলে মনে হয়। অথচ সে কালে তা মনে হত না। সাধারণের মধ্যে বিশ্বাস ছিল যে মহাপুরুষ কখনও দশ মাস দশ দিন পরেই ভূমিষ্ঠ হন না। যিনি যত দিন মাতৃগর্ভে বাস করেন, তিনি তত বড় মহাপুরুষ।

গুরুজী বললেন: বশিষ্ঠের মহানুভবতা দেখে আমরা আশ্চর্য হই। সে কথা পরে বলছি। পুত্রবধূর মুখে তাঁর বংশধর এখনও বেঁচে আছে শুনে আত্মহত্যার বাসনা তাঁর অন্তর্হিত হল। অদৃশ্যন্তীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি তাঁর আশ্রমে ফিরে এলেন। আমার মনে হয়, এই আশ্রম ছিল হিমালয়ের কুলু উপত্যকায় বিপাশার তীরে। পুষ্কর থেকে অদূরে আবু পাহাড়েও আমরা বশিষ্ঠের আশ্রম দেখেছি।

একদিন কল্মাষপাদ রাজা বশিষ্ঠকে বধ করে খাবার জন্য তাঁর আশ্রমে এলেন। ভয় পেলেন অদৃশ্যন্তী, কিন্তু বশিষ্ঠ ভয় পেলেন না। তাঁর একশত পুত্রকে অন্যায় ভাবে হত্যা করার অপরাধে

তিনি তাঁকে শাপ দিয়ে ভস্ম করতে পারতেন। কিন্তু বশিষ্ঠ কোন দিন কাউকে শাপ দেন নি, কারও অনিষ্ট চিন্তাও করেন নি কোন দিন।

তাউজী এখানে বাধা দিলেন। বললেন: কামধেনু নিয়ে বিবাদের সময় বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের শতপুত্রকে হুঙ্কারে ভস্ম করেছিলেন বলে আপনি বলেছেন।

গুরুজী স্বীকার করলেন: তা বলেছি। সেই শত পুত্র নানা আয়ুধ নিয়ে বশিষ্ঠকে আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু তাদের ভস্ম করার কথাটা আমার বিশ্বাস হয় নি। তার কারণ আছে।

তাউজী বললেন: বলুন।

রামায়ণে শুনঃশেপের কাহিনীতে দেখি যে শুনঃশেপ যখন বিশ্বামিত্রের সাহায্য প্রার্থনা করেন, তখন তিনি পুষ্করে। তাঁর প্রস্তাবে কোন পুত্র রাজী না হওয়াতে তিনি তাদের শাপ দিয়েছিলেন, বশিষ্ঠের পুত্রদের মতো তারাও চণ্ডাল হবে। কোনও পুরাণে আমি এই ঘটনায় শত পুত্রের উল্লেখ পেয়েছি। তাতেই মনে হয় যে বশিষ্ঠের হুঙ্কারে তারা ভস্ম হয় নি, পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছিল।

তাউজী বললেন: এতো আপনার অনুমানের কথা।

যুক্তির উপরেই অনুমান।

তাউজী আর কোন কথা কইলেন না।

গুরুজী বললেন: কল্মাষপাদের কথা বলছিলাম। তিনি যখন বশিষ্ঠকে বধ করবার জন্য এগোলেন, তখন নির্বিকার ঋষি বললেন, তিষ্ঠ।

তারপর কমণ্ডলু থেকে মন্ত্রপূত জল তাঁর দেহে ছিটিয়ে দিলেন। দেখতে দেখতেই রাজার রূপান্তর হল। তিনি শাপমুক্ত হলেন। বশিষ্ঠ তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন, ব্রাহ্মণের অমর্যাদা আর ক'রো না।

গুরুজী বললেন ঃ এত বড় ক্ষমার কথা আমার আর জানা নেই। পুরাণে ইতিহাসে এত বড় ক্ষমার কথা বোধ হয় আর নেই। পুত্র-শোকের প্রতিশোধ না নিয়ে যিনি পুত্রহন্তাকে আশীর্বাদ করতে পারেন, তাঁকে মহাপুরুষ বললেও কম বলা হয়। শুধু এই ঘটনাটির জন্য বশিষ্ঠকে আমি ভারতের শ্রেষ্ঠ ঋষি বলে সম্মান করি।

দুচোখ বন্ধ করে গুরুজী খানিকক্ষণ স্থির হয়ে রইলেন। তারপর চোখ খুলে বললেন ঃ বিশ্বামিত্র তখন পুষ্করে তপস্যা করছেন ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য। দক্ষিণ দেশে তাঁর অহংকার চূর্ণ হয়েছে। ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞে দেবতারা যজ্ঞের ভাগ নিতে আসেন নি। ত্রিশঙ্কুকেও তিনি স্বর্গে পাঠাতে পারেন নি। তার জন্য অন্য ব্যবস্থা করতে হয়েছে। এবারে তিনি আরও কঠোর তপস্যা করবেন। এই সময় শুনঃশেপ এসে তাঁর পদপ্রান্তে আশ্রয় নিল।

শুনঃশেপ তাঁর ভাগিনেয়, ঋচীকের মধ্যম পুত্র। অযোধ্যার রাজা অম্বরীষ তাঁকে যজ্ঞে বলিদানের জন্য নিয়ে যাচ্ছিলেন। শুনঃশেপ মাতুলের নিকট তাঁর জীবন ভিক্ষা করলেন।

নরবলি !

আমরা আশ্চর্য হলাম।

গুরুজী বললেন ঃ যজ্ঞে পশু বলিরই ব্যবস্থা হয়েছিল। ইন্দ্র সেই পশু অপহরণ করলেন। অম্বরীষের পুরোহিত বললেন, এ আপনারই দোষ, তাই যজ্ঞে বিঘ্ন হল। সেই পশু না পাওয়া গেলে নরবলি দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। অম্বরীষ অনেক অন্বেষণ করলেন। দেশ থেকে দেশান্তরে গিয়ে ব্যর্থ হলেন। শেষ পর্যন্ত ভৃগুতুঙ্গে গিয়ে ঋচীক মুনির দর্শন পেলেন। ঋচীক মুনি সেখানে গাধিকন্যা সত্যবতী ও তাঁর তিন পুত্র নিয়ে সংসার করছিলেন। বড় দারিদ্র্যে তাঁদের দিন কাটছিল। রাজা বললেন, আমার যজ্ঞের পশুকে কোথাও খুঁজে পেলাম না। আপনি আপনার এক পুত্রকে আমার নিকট বিক্রয় করুন, আমি আপনাকে লক্ষ ধেনু দাম দেব।

ঋচীক বললেন, জ্যেষ্ঠ পুত্রকে আমি বিক্রয় করতে পারি না।

সত্যবতী বললেন, কনিষ্ঠ আমার প্রিয় পুত্র, তাকেও আমি দিতে পারি না।

অতএব মধ্যম পুত্র শুনঃশেপ রাজাকে বললেন, কাজেই আমাকে আপনি নিয়ে চলুন।

অনেক ধন রত্ন ও ধেনু দিয়ে রাজা শুনঃশেপকে ক্রয় করলেন এবং তাঁকে অযোধ্যায় যজ্ঞভূমিতে নিয়ে চললেন।

মধ্যাহ্নে তাঁরা পুষ্কর তীর্থে উপস্থিত হলেন। বিশ্বামিত্র সেখানে তপস্যা করছিলেন। মাতুলকে দেখতে পেয়ে শ্রান্ত অবসন্ন শুনঃশেপ তাঁর পায়ে পড়ে জীবন ভিক্ষা করলেন। বললেন: আমাকে আপনি বাঁচান।

বিশ্বামিত্র তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন, ভয় নেই, আমি তোমাকে রক্ষা করব।

তারপর একে একে নিজের পুত্রদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, যজ্ঞের বলি হতে তোমাদের মধ্যে কে রাজী আছ?

বিস্মিত হয়ে বিশ্বামিত্রের পুত্রেরা বললেন, রাজী! পরের পুত্রকে রক্ষার জন্য আপনি নিজের পুত্রকে বলি দিতে চান!

বিশ্বামিত্র বললেন, এই বালক আমার শরণাগত, এর জীবনের জন্য জীবন দিতে তোমাদের একজন শুধু রাজী হও।

কিন্তু নিজের জীবন দিতে কেউ রাজী হলেন না। বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁদের শাপ দিলেন, বশিষ্ঠের পুত্রদের মতো তোমরাও চণ্ডাল হয়ে সহস্র বর্ষ যাপন করবে।

শুনঃশেপকে তিনি দুটি দিব্য গাথা শেখালেন। বললেন, যূপে বদ্ধ হবার পর অগ্নির স্তব করে ইন্দ্র ও বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে এই গাথা গান ক'রো। তুমি রক্ষা পাবে।

বিশ্বামিত্রের আদেশ পালন করে শুনঃশেপ দীর্ঘায়ু পেয়েছিলেন, এবং বিশ্বামিত্র তাঁকে পুত্ররূপে পালন করেছিলেন।

গুরুজী একটু চিন্তা করে বললেন: ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এই উপাখ্যান কিছু অন্যরূপ। রাজা সেখানে অম্বরীষ নন, ইক্ষ্বাকু বংশের হরিশ্চন্দ্র। নিঃসন্তান রাজা সংকল্প করেছিলেন যে পুত্র হলে বরুণের প্রীত্যর্থে নরমেধ যজ্ঞ করবেন। কিন্তু সত্যই যখন তাঁর পুত্র হল, বরুণ তাঁর পুত্রকেই নরমেধে বলি দিতে বললেন। হরিশ্চন্দ্র এই সংকল্প রক্ষা করতে পারলেন না। নানা অজুহাতে বিলম্ব করতে লাগলেন। বরুণ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে রোগগ্রস্ত হবার শাপ দিলেন। শেষ পর্যন্ত যখন মন স্থির করলেন তখন পুত্র রোহিত বড় হয়েছে। সে আপত্তি করল এবং বনে পালিয়ে গেল। কুলগুরু বশিষ্ঠ বললেন যে অন্য কারও পুত্রকে ক্রয় করে সংকল্প রক্ষা করা হোক। রোহিত অজিগর্ত নামে এক ব্রাহ্মণের পুত্র শুনঃশেপকে এক শো গাভীর মূল্যে ক্রয় করল এবং বরুণের সম্মতি ক্রমে নিজের পরিবর্তে এই ব্রাহ্মণ কুমারকে উৎসর্গ করবার ব্যবস্থা করল। দেবতার পূজা করে শুনঃশেপ আত্মরক্ষা করেন ও বিশ্বামিত্রের সঙ্গে মিলিত হন।

শুনঃশেপের উপাখ্যানে বিশ্বামিত্রের উদারতা প্রকাশ পেয়েছে। শরণাগতকে তিনি নিজের পুত্রের চেয়েও প্রিয় বলে স্বীকার করেছিলেন।

পুষ্করেও তিনি দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা করেছিলেন। এক সহস্র বৎসর অতীত হবার পরে ব্রহ্মা তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে ঋষি বলে সম্বোধন করেন। বিশ্বামিত্র এই সম্বোধনে বিন্দুমাত্র সন্তুষ্ট না হয়ে তপস্যা বন্ধ করলেন না। দেবতারা ভীত হলেন এবং বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গের জন্য ইন্দ্র অপ্সরা মেনকাকে পুষ্করে প্রেরণ করলেন। পুষ্করের মহাহ্রদে স্নানরতা মেনকা বিশ্বামিত্রের মনোহরণে সক্ষম হলেন। দশ বৎসর তাঁরা সুখে সংসার করেছিলেন। এই সময়েই জন্ম হয়েছিল শকুন্তলার।

গুরুজী বললেন: শকুন্তলার কাহিনী তোমরা মহাভারতে পড়ে নিও। কালিদাসের কাব্যও পড়ে দেখতে পার।

আমি জানতাম যে এই সমস্ত কাহিনী গুরুজী আমাদের বলবেন না। ঋষির কথায় শকুন্তলার গল্প বলার প্রয়োজন নেই, কিন্তু শকুন্তলার জন্মের কথা না বললে বিশ্বামিত্রের কাহিনী অসম্পূর্ণ থাকে।

গুরুজী বললেন ঃ মেনকার সঙ্গে দশবৎসর যাপনের পর বিশ্বামিত্র বুঝতে পারলেন যে তাঁর তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাবার জন্যই দেবতারা এই কৌশল করেছেন। এবারে তাঁর রাগ হল না, অনুশোচনায় তিনি দগ্ধ হলেন। মেনকা ভয় পেয়েছিলেন যে ঋষি হয় তো তাঁকে শাপ দেবেন। কিন্তু বিশ্বামিত্র তাঁকে বিদায় দিলেন গভীর লজ্জায়। আর নিজে পুষ্কর ছেড়ে হিমালয়ে গেলেন কৌশিকী নদীর তীরে আরও কঠোর তপস্যার জন্য।

বিশ্বামিত্রর তপস্যা দেখে দেবতারা আবার ভয় পেলেন। ব্রহ্মার নিকটে গিয়ে বললেন, একটা বিহিত করুন। বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হতে চান, তাঁকে ব্রহ্মর্ষি বলে স্বীকার না করা পর্যন্ত তিনি তপস্যা ত্যাগ করবেন না। দেবতাদের কথায় ব্রহ্মা আবার এলেন বিশ্বামিত্রের কাছে। বললেন, তোমার তপস্যায় তুষ্ট হয়ে আমি তোমাকে মহর্ষির পদ দিলাম।

বিশ্বামিত্র প্রণাম করে বললেন, মহর্ষি নয়, আমি ব্রহ্মর্ষি হতে চাই। আপনি কি আমাকে এখনও জিতেন্দ্রিয় মনে করেন না ?

ব্রহ্মা বললেন, এখনও তোমার ইন্দ্রিয় জয় হয় নি।

বিশ্বামিত্র আরও সহস্র বৎসর কঠোরতর তপস্যায় নিমগ্ন হয়ে গেলেন।

চিন্তিত হয়ে দেবতারা আবার পরামর্শ করলেন। ইন্দ্র এবারে অপ্সরা রম্ভাকে বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গের ভার দিলেন। ভয়ে রম্ভা অসম্মত হলেন। ইন্দ্র বললেন, ভয় কি, কোকিলরূপে কন্দর্পের সঙ্গে আমিও তোমার কাছে থাকব।

সাহসে ভর করে রম্ভা বিশ্বামিত্রের কাছে গিয়েছিলেন। গান গেয়ে অঙ্গভঙ্গি করে তাঁর মনোহরণের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু

বিশ্বামিত্র এবারে সবই বুঝলেন। বললেন, ইন্দ্রের কথায় তুমি আমার তপোভঙ্গ করতে এসেছ, তুমি পাষাণ হও।

রম্ভা পাষাণে পরিণত হলেন, ইন্দ্র ও কন্দর্প গেলেন পালিয়ে। তারপর বিশ্বামিত্র অনুতাপে দগ্ধ হতে লাগলেন। কাম জয় করতে তিনি ক্রোধের বশীভূত হয়েছেন। সকল ইন্দ্রিয় জয় করতে না পারলে তো তিনি ব্রাহ্মণ হতে পারবেন না। এবারে তিনি হিমালয় ত্যাগ করে পূর্ব দেশে গিয়ে অনাহারে নিঃশ্বাস রোধ করে তপস্যা করতে লাগলেন।

এক হাজার বৎসর পরে তাঁর ব্রত পূর্ণ হল। তিনি যখন উপবাস ভঙ্গ করছিলেন, তখন ব্রাহ্মণ বেশে ইন্দ্র এসে তাঁর কাছে অন্ন চাইলেন। বিশ্বামিত্র সেই অন্ন ব্রাহ্মণকে দান করে আরও এক সহস্র বৎসর অনাহারে তপস্যা করলেন। তাঁর মাথা থেকে যে ধোঁয়া বার হতে লাগল তার তাপে ত্রিলোক ব্যাকুল হল। দেবতারা ব্রহ্মাকে বললেন, আর কী পরীক্ষা বাকী আছে? বিশ্বামিত্রকে আর কত দিন কষ্ট দেবেন? তপস্যায় যে তাঁর ত্রিলোক ধ্বংসের ক্ষমতা জন্মেছে!

ব্রহ্মা এবারে স্বীকার করলেন যে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হবার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। তাঁর সামনে এসে বললেন, ব্রহ্মর্ষি, এত দিনে তুমি ব্রাহ্মণত্ব পেলে।

আনন্দে গদগদ হয়ে বিশ্বামিত্র বললেন, কিন্তু প্রভু, বশিষ্ঠও কি আমাকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করবেন!

ব্রহ্মা বললেন: কেন করবেন না! আমরা সবাই তাঁকে অনুরোধ করব।

এই প্রসঙ্গে আমার একটি পুরাতন কথা মনে পড়েছিল। শৈশবে সেই রচনাটি আমি পড়েছিলাম। সব কথা আজ ভাল মনে নেই। শুধু এইটুকু মনে আছে যে বিশ্বামিত্র বাসুকির কাছে গিয়েছিলেন, এবং বাসুকি তাঁকে পৃথিবী ধারণ করতে বলেছিলেন। বিশ্বামিত্র এই কাজ সহজ মনে করে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু বাসুকির মাথা

থেকে পৃথিবী গ্রহণ করে শূন্যে তলিয়ে যেতে লাগলেন। নিজের সমস্ত তপোবল অর্পণ করাতেও পৃথিবী স্থির হল না। শেষে বশিষ্ঠের সঙ্গে যে সৎসঙ্গ করেছিলেন, সেই পুণ্য ফল অর্পণ করলেন। পৃথিবী তখনই স্থির হল। বশিষ্ঠের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত হয়েছে এই কাহিনীতে।

এক অবাঙ্গালী বন্ধুর মুখেও আমি এই গল্প শুনেছিলাম। তিনি বলেছিলেন যে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র বাসুকির নিকট গিয়েছিলেন নিজেদের শ্রেষ্ঠতার বিচার করতে। বাসুকি বলেছিলেন, আমার মাথার পৃথিবী একজন ধারণ কর, তারপর সুস্থ মাথায় এই বিচার করব।

বিশ্বামিত্র পৃথিবী ধারণ করে স্থির থাকতে পারলেন না। স্থির হবার জন্য প্রথমে নিজের তপস্যার বল প্রয়োগ করলেন, পরে বশিষ্ঠের সঙ্গে তাঁর সাধু সঙ্গের ফল। পৃথিবী নিশ্চল হতেই বাসুকি বললেন, বিচার তো হয়েই গেল। ক্ষত্রিয়ের তপস্যার ফলের চেয়ে ব্রাহ্মণের সাধু সঙ্গই বড়।

বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করে বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের দীর্ঘ কালের বিরোধ মিটিয়েছিলেন।

নয়

সকালবেলায় বাগানের কাজে নামবার আগে সুপ্তি এসে খবর দিল, শকুন্তলাদি আমায় ডাকছেন।

আমি একটু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম : কেন বলতো ?

সুপ্তি গম্ভীর ভাবে জবাব দিল : তোমার খাতা দেখবেন।

কেন ?

চেনেলু নালিশ করেছে, তুমি আজকাল কবিতা লিখছ।

ও।

বলে আমি শকুন্তলাদির ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম।

শকুন্তলাদি আমার অপেক্ষা করছিলেন। ঘরে ঢুকতেই বললেন : বস।

আমি তাঁর খাটের এক পাশে জড়োসড়ো হয়ে বসলাম।

শকুন্তলাদি হেসে বললেন : ভয় নেই, আমি তোমার পরীক্ষা নেবার জন্য ডাকি নি। একটু সহজ হয়ে বস।

নিঃশব্দে আমি তাঁর আদেশ পালন করলাম।

শকুন্তলাদি আর একটা খাটে বসে বললেন : কালকের পড়া তোমার কেমন লাগল ?

এক রকমের অদ্ভুত ভাল লাগা আমার মনের মধ্যে গুনগুন করে বাজছিল। আমি সংক্ষেপে বললাম : অপূর্ব।

শকুন্তলাদি বললেন : আমাদের এই পরিবেশের কথা ভুলে যাও। মনে কর, আমরা আর এই আশ্রমে নেই, এই পাহাড় এই নদী এই আশ্রম গুরুজী তুমি আমি কেউ নেই। আমরা তোমার ঋষির কথা পড়ছি কলকাতার বাড়িতে বসে। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের গল্প আমাদের ভাল লাগবে তো!

সহসা এ কথার উত্তর আমি দিতে পারলাম না।

শকুন্তলাদি বললেন ঃ পরিবেশের গুণে অনেক জিনিষ আমাদের ভাল লাগছে। সেই পরিবেশ সরিয়ে নিলে তা হয়তো ভাল না লাগতেও পারে। রামায়ণে মহাভারতে দেখেছ যে ঋষিদের কথা পর পর বলা হয় নি। বলা হয়েছে সব চেয়ে উপযুক্ত স্থানে। পদব্রজে চলতে চলতে রাম লক্ষ্মণ বা পঞ্চ-পাণ্ডব যখন কোন ঋষির আশ্রমে পৌঁছেছেন, তখনই সেই ঋষির কাহিনী বলা হয়েছে। এইখানে বিশ্বামিত্রের আশ্রম ছিল, আর এইখানে বশিষ্ঠের। চোখের সামনে একটি রমণীয় স্থান দেখে তাঁদের কৌতূহল জেগেছে।

আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ পারবে সেই রকমের কোন কৌতূহল জাগাতে ?

অকপটে স্বীকার করলাম, আমি সে কথা ভেবে দেখি নি।

শকুন্তলাদি বললেন ঃ ভেবে দেখতে হবে। আর কিছু লেখবার আগেই তা ভাবতে হবে।

স্বল্পবাক শকুন্তলাদি আজ আমাকে অনেক কথা বললেন ঃ বাঙলায় আমি তৈলঙ্গ স্বামীর একখানা জীবনী পড়েছিলাম। লেখক একটি একটি করে অনেকগুলি অলৌকিক কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন। সমস্ত বইখানা পড়ে আমার মনে হয়েছিল যে তৈলঙ্গ স্বামী একজন ক্ষ্যাপা সাধু, তাঁর খামখেয়ালিপনার যেন সীমা নেই। সেই মহাপুরুষকে একজন বিরাট সাধক বলে আমি কিছুতেই ভাবতে পারলাম না।

তারপর বললেন ঃ ঋষিদের কথা যেন সেই রকমের কিছু না হয়। ঋষিরা মানুষ ছিলেন, মানুষের মতো সংসার করেছেন। পাহাড়ে নদীর তীরে অরণ্যের ছায়ায় আশ্রম তৈরি করে তাঁরা সশিষ্যে বাস করতেন। পূজার্চনা বেদাধ্যয়ন তত্ত্বালোচনায় তাঁদের সময় অতিবাহিত হত। কেউ নির্জনতা পছন্দ করতেন, তিনি কোন দুর্গম স্থানে একাকী থাকতেন। সমাধিস্থ হয়ে তিনি যে

জ্ঞানলাভের চেষ্টা করতেন, তারই নাম তপস্যা। ব্রাহ্মণ তপস্যা করে ঋষি হয়েছেন।

আমি আজ নিঃশব্দে শকুন্তলাদির কথা শুনছিলাম। তাঁর কোন কথার উত্তর তিনি চাইলেন না। বললেন ঃ গুরুজী আমাকে কী বলছিলেন জান বিনায়ক ?

জানি নে।

বলছিলেন, সূর্যের আলোয় আছে সাতটি রঙ, কিন্তু আমরা তা সাদা দেখি। সজল মেঘের গায়ে আমরা রামধনু দেখি। ঋষিদের কথাও তাই। ঐ সাত রঙ দেখতে হলে নিজের মনটাকে সজল মেঘের মতো আর্দ্র করতে হবে। নানা অসম্ভব অলৌকিক ঘটনার ভিড় থেকে আসল মানুষটিকে আমাদের আবিষ্কার করতে হবে।

শকুন্তলাদি বললেন ঃ বিনায়ক, তোমার ঋষির কথা যেন একটা আজগুবি গল্পের জাদুঘরে পরিণত না হয়। দেবতারা যাঁদের সম্মান করতেন, দেশের রাজারা যাঁদের পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে পূজো করতেন, তোমার লেখায় যেন তাঁরা জীবন্ত হয়ে ওঠেন।

এইবারে আমি আস্তে আস্তে বললাম ঃ শকুন্তলাদি!

কী!

আপনি নিজে লেখেন না কেন ?

শকুন্তলাদি হেসে বললেন ঃ নিজে লিখতে পারলে তোমাকে এত কথা বললাম কেন!

আমিও তো লিখতে পারি না।

তুমি পারবে।

এ আপনার যুক্তিহীন কথা। পরীক্ষার খাতায় প্রশ্নের উত্তর লেখা, আর ঋষির কথা লেখা তো এক কাজ নয় শকুন্তলাদি।

শকুন্তলাদি বললেন ঃ সেই জন্যেই তো সবাই লেখে না।

একটু থেমে শকুন্তলাদি বললেন ঃ তোমার ওপরে আস্থা রাখেন বলেই গুরুজী তোমাকে লিখতে বলেছেন।

গুরুজীর কথায় আমার রোমাঞ্চ হল। আমি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলাম: গুরুজী আবার কিছু বলেছেন নাকি?

শকুন্তলাদি হাসলেন। বললেন: আমি তোমাকে যা বললাম তা বুঝি তোমার ভাল লাগল না!

বললাম: ভাল লাগার কথা নয়, ক্ষমতার কথা। আপনি আমাকে যা বললেন, তা কি আমি পারব!

শকুন্তলাদি বললেন: কেন পারবে না! গভীর ভাবে চিন্তা করে ঋষিদের সঙ্গে একাত্ম হতে পারলেই তাঁদের মর্ম কথাটি ধরা পড়ে যাবে। দোহাই তোমার বিনায়ক, ঋষিদের সম্বন্ধে কতগুলি আজগুবি গল্প লিখে আমাদের নিরাশ ক'রো না।

বলে শকুন্তলাদি উঠে দাঁড়ালেন।

আমি বুঝতে পারলাম যে এবারে আমাকেও উঠতে হবে। আমি না উঠলে শকুন্তলাদি কোন কাজের ফরমাস করে আমাকে যেতে বলবেন। আমিও উঠে পড়ে বললাম: আপনার কথা আমি মনে রাখব শকুন্তলাদি।

শকুন্তলাদি আমারই মতো অধ্যয়নের জন্য এই আশ্রমে এসেছেন। তিনিও পড়ছেন সকলের সঙ্গে। কিন্তু তাঁর চেহারায় ও ব্যবহারে এমন একটা ব্যক্তিত্ব আছে যে প্রথম দিনেই তিনি আমাকে 'তুমি' বলেছিলেন, আর আমি তাঁকে 'আপনি' বলেছি। তাঁকে আমি ভয়ও পাই, কিন্তু এই ভয়ের সঙ্গে খানিকটা শ্রদ্ধাও মিশে আছে।

শকুন্তলাদি বললেন: মনে রাখব নয়, বল মেনে নিলাম।

কিন্তু আমি এ কথা বলতে পারলাম না।

সন্ধ্যাবেলায় আবার আমরা সমবেত হলাম। ভেবেছিলাম যে গুরুজী আজ কোন নূতন ঋষির কথা বলবেন। কিন্তু তা বললেন না। গুরুজীকে ভাবতে দেখে তাউজী বললেন : কাল আমরা বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের গল্প শুনেছি।

গুরুজী বললেন : কিন্তু তাঁদের কথা শেষ হয়েছে বলে আমার মনে হচ্ছে না। ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডল না পড়লে বিশ্বামিত্রের সব কথা জানা হবে না। সেখানে আমরা তাঁর বংশ পরিচয় পাই, আর আরও অনেক কথা জানতে পারি। তিনি সুদাস রাজার যজ্ঞে পৌরোহিত্য করেছিলেন। ইন্দ্র তাঁর সঙ্গে প্রিয় ব্যবহার করেন। এই যজ্ঞে বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি তাঁর বল ও বাক্য হরণ করেন। জমদগ্নি সূর্যের কন্যা বাগ্দেবতাকে এনে তাঁকে প্রদান করেন। বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি ইন্দ্রের স্তুতি করেছিলেন। তার উত্তরে ইন্দ্র বলেছেন, হে বিশ্বামিত্র হে জমদগ্নি, তোমরা সোম তৈরি করলে আমি যখন তোমাদের গৃহে যাই, তখন তোমরা ভাল করে আমার স্তব ক'রো। পুরাণের কাহিনী অনুসারে বিশ্বামিত্র জমদগ্নির সমবয়সী মাতুল।

গুরুজী একটু থেমে বললেন : অথর্ববেদের মন্ত্রে বিশ্বামিত্রের স্তব আছে। ঋষিরাও তাঁর স্তুতি করেছেন।

বিশ্বামিত্রের আর একটি কাহিনী আমরা মার্কণ্ডেয় পুরাণে পাই। রাজা হরিশ্চন্দ্র মৃগয়ায় এসে অরণ্যে এক নারীর আর্তনাদ শুনতে পেয়েছিলেন। বিশ্বামিত্র সেই অরণ্যে বিদ্যাসিদ্ধির জন্য তপস্যা করছিলেন। তাঁরই যোগবলে আবদ্ধ হয়ে বিদ্যারা আর্তনাদ করছিল। হরিশ্চন্দ্র এই কথা জানতে পেরে বিদ্যাদের

রক্ষা করবার জন্য বিশ্বামিত্রের নিকটে যান। তাতে ঋষির তপোভঙ্গ হয়। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন, বিদ্যারাও এই অবকাশে পালিয়ে যায়।

বিশ্বামিত্র রাজাকে বললেন, তুমি তো রাজসূয় যজ্ঞ করেছ, আমি ব্রাহ্মণ, আমাকে তো যজ্ঞে কোন দান কর নি!

রাজা বললেন, আদেশ করুন, আমার রাজ্য জীবন স্ত্রীপুত্র ধনরত্ন—আপনার প্রীতির জন্য আমি সবই দিতে প্রস্তুত।

এই কথার উত্তরে বিশ্বামিত্র রাজা রাণী ও রাজপুত্র রোহিতের জীবন ছাড়া আর সবই গ্রহণ করলেন।

গুরুজী বললেনঃ এই ব্যাপারে পুরাণান্তরে অন্য ঘটনার উল্লেখ আছে। বশিষ্ঠ একদিন বিশ্বামিত্রের নিকট রাজা হরিশ্চন্দ্রের ধর্ম ও দানশীলতার সবিশেষ প্রশংসা করেছিলেন। বিশ্বামিত্র তারই পরীক্ষা নিতে চেয়েছিলেন।

তাই তিনি হরিশ্চন্দ্রকে পথের ভিখারী করেই সন্তুষ্ট হন নি। তাঁকে অনুসরণ করে কাশীতে এসেছিলেন। রাজা যে তাঁরই ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন, তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। আরও নিগ্রহের জন্য তিনি রাজাকে ধরলেন, দান করেছ, কিন্তু দক্ষিণা কোথায়?

রাজা ভাবলেন, স্ত্রীপুত্র ছাড়া আর আমার কী আছে! কিন্তু বিশ্বামিত্রকে দক্ষিণা দিতেই হবে। তাই চেষ্টা করে এক ব্রাহ্মণের নিকট শৈব্যা ও রোহিতকে বিক্রয় করলেন। রাজাকে ক্রয় করতে রাজী হল এক চণ্ডাল। নিজেদের বিক্রয় করে হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রকে দক্ষিণা দিলেন।

তার পরের ঘটনা সকলের জানা। অনেক দুঃখ যন্ত্রণার পরে তাঁদের মিলন হল। সাপের কামড়ে রোহিতের মৃত্যু হয়েছিল। শৈব্যা তাকে শ্মশানে এনেছিলেন। চণ্ডালের দাস রূপে কর্মরত হরিশ্চন্দ্র শৈব্যাকে চিনলেন। রাণীও চিনতে পারলেন রাজাকে।

অনেকক্ষণ কাঁদলেন। তারপর পুত্রের চিতায় জীবন বিসর্জন দিতে কৃতসংকল্প হলেন। এই সময় দেবতারা এলেন, বিশ্বকর্মা এলেন, যে ধর্ম চণ্ডালের রূপে হরিশ্চন্দ্রকে ক্রয় করেছিলেন নিজরূপে তিনিও এলেন। রাজা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। রোহিতকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করে হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যাকে দেবতারা স্বর্গে নিয়ে গেলেন।

রামায়ণে বিশ্বামিত্রকে আমরা অন্য রূপে দেখতে পাই। তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন, নিজের শক্তিক্ষয়ে তিনি বিমুখ। যজ্ঞে বিঘ্নকারী রাক্ষস দমনে সমর্থ হয়েও তিনি অযোধ্যায় রাজা দশরথের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হয়ে এসেছেন। রাজা যখন সভায় বশিষ্ঠ ও মন্ত্রীদের সঙ্গে পুত্রদের বিবাহের বিষয় আলোচনা করছিলেন, তখন বিশ্বামিত্র এসে তাঁর নিকট ব্রাহ্মণদের বিপদের কথা নিবেদন করলেন। মারীচ ও সুবাহু নামে দুই রাক্ষস তাঁদের যজ্ঞ বেদীর উপর মাংস ও রক্ত বর্ষণ করছে। যজ্ঞের দশ রাত্রির জন্য রামকে দরকার, তিনি রাক্ষসদের বধ করবেন।

ভগিনীপতি ঋচীক মুনি সশরীরে স্বর্গে যাবার পর তাঁর ভগিনী সত্যবতী কৌশিকী বা কুশী নদীরূপে প্রবাহিতা। বিশ্বামিত্র হিমালয়ে সেই নদীর তীরেই তপস্যা করছিলেন। সম্প্রতি এক যজ্ঞ করবার মানসে সিদ্ধাশ্রমে এসেছেন। বামনরূপী বিষ্ণু সেখানে তপস্যা করে স্থানটি পবিত্র করে গেছেন। কিন্তু রাক্ষসদের অত্যাচারে ব্রাহ্মণদের দুর্দশার সীমা নেই।

পুত্রবৎসল দশরথ বিশ্বামিত্রের প্রস্তাব শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। বললেন, রামের বয়স এখন ষোলর কম, নিতান্তই বালক, যুদ্ধ বিদ্যা আয়ত্ত হয় নি, রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার যোগ্যতা তার নেই। আপনি অনুমতি করলে এক অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে আমি নিজে সেখানে যাব।

বিশ্বামিত্র বললেন, শুনেছি পুলস্ত্য ঋষির পৌত্র রাবণ নামে

এক পরাক্রান্ত রাক্ষসের আজ্ঞায় মারীচ ও সুবাহু আমাদের যজ্ঞে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে।

এই কথা শুনে দশরথ যারপরনাই ভীত হলেন। বললেন, সর্বনাশ! দেব দানব গন্ধর্বরা যাকে ভয় পায়, সেই রাবণের সঙ্গে আমরা যুদ্ধ করব! আপনি আমাদের ক্ষমা করুন।

বিশ্বামিত্র এইবারে ক্রুদ্ধ হলেন, বললেন: তোমার প্রতিশ্রুতির কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ! তবে তাই হোক, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে তুমি সুখী হও, আমি ফিরে যাচ্ছি।

বিশ্বামিত্র কোন শাপ দিলেন না। কিন্তু তাঁর অসন্তোষে পৃথিবী চঞ্চল হল, দেবতারাও ভয় পেলেন। বশিষ্ঠ বললেন, মহারাজ, অকারণে আপনি ভয় পাচ্ছেন, ও নিজের পূর্ব প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করছেন। বিশ্বামিত্র অভিভাবক হলে ত্রিভুবনে রামের কোন ভয় নেই। তিনি নিজেই রাক্ষস দমনে সমর্থ, রামের মঙ্গলের জন্যই আপনার কাছে প্রার্থী হয়ে এসেছেন।

গুরুজী বললেন: এখানেও আমরা দুই ঋষিকে দেখতে পাচ্ছি। একদা যে বিশ্বামিত্র বলেছিলেন যে ত্রিশঙ্কুর জন্য আমি দ্বিতীয় স্বর্গ রচনা করব, সেই বিশ্বামিত্র সাধারণ মানুষের মতো ফিরে যেতে উদ্যত হয়েছিলেন। রাক্ষস দমনে তিনি তাঁর দৈব অস্ত্র প্রয়োগ করেন নি, শাপ দিয়েও ভস্ম করেন নি তাদের। দশরথকেও কোন অভিশাপ দিলেন না। বশিষ্ঠ রাজাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে বিশ্বামিত্র শক্তিহীন নন, তিনি শক্তিক্ষয় আর করবেন না। বশিষ্ঠের কথায় বিশ্বামিত্রের প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধার কথাই প্রকাশ পেয়েছে। দেব দানব গন্ধর্ব রাবণকে ভয় পেতে পারে, কিন্তু বিশ্বামিত্র সঙ্গে থাকলে মানুষেরও কোন ভয় নেই। আশ্বস্ত হয়ে দশরথ রাম লক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে যেতে দিলেন।

সরযূ নদীর তীরে পৌঁছে বিশ্বামিত্র রামকে বলা-অতিবলা মন্ত্র দিলেন। বললেন, এই মন্ত্রের প্রভাবে তোমার ক্ষুধা তৃষ্ণা শ্রম ও

রোগ দূর হবে, সুপ্ত অবস্থাতেও শত্রু আঘাত করতে পারবে না, জ্ঞানে দক্ষতায় ও সৌভাগ্যে অদ্বিতীয় হবে।

তাড়কা বধের পর বিশ্বামিত্র সন্তুষ্ট হয়ে রামকে সমস্ত দিব্যাস্ত্র দিলেন, বললেন, এই সব অস্ত্রের প্রভাবে তুমি সর্বজয়ী হবে।

তারপর রামকে সংহার মন্ত্র শেখালেন। এই অস্ত্রের গুণে বিমুক্ত অস্ত্রকে আবার ফিরিয়ে আনা যায়।

সিদ্ধাশ্রমে পৌঁছে বিশ্বামিত্র যজ্ঞ সম্পূর্ণ করলেন। রাম সেই সময়ে মারীচ ও সুবাহুকে বধ করলেন। তারপর সবাই মিলে মিথিলার দিকে যাত্রা করলেন। মিথিলার রাজা জনক সেখানে যজ্ঞ করছিলেন। গিরিব্রজ বিশালা হয়ে তাঁরা মিথিলায় এলেন। এখানেই এক উপবনে ছিল গৌতমের আশ্রম।

তাউজী বললেন: গৌতমের কথা কি এখানে প্রাসঙ্গিক হবে না?

গুরুজী খানিকক্ষণ ভাবলেন, তারপরে বললেন: অপ্রাসঙ্গিকও হবে না।

তাউজী বললেন: অনেক মুনি ঋষির কথা হয়তো আমাদের বাদ পড়ে যাবে। কিন্তু গৌতমের কথা বাদ পড়লে সে বড় দুঃখের হবে।

গুরুজী বললেন: গৌতমের কথা বাদ দেওয়া যায় না।

একটু থেমে বললেন: ঋগ্বেদে আমরা মহর্ষি গোতমের উল্লেখ পাই। অনেক মন্ত্রের তিনি রচয়িতা। ন্যায় দর্শনও ইনি রচনা করেছেন। এঁর অপর নাম সত্যানন্দ। এই গোতম ঋষির পুত্র গৌতম। ইনিও ধর্মশাস্ত্র প্রণেতা, সংহিতাকার। এঁর পুত্রের নাম শতানন্দ, রামায়ণে আমরা শতানন্দকে জনক রাজার পুরোহিত রূপে দেখি, আর মহাভারতে গৌতমের পুত্রকন্যার নাম পাই কৃপ ও কৃপী। এই গৌতম মহর্ষি গৌতমের পুত্র শরদ্বান। জানপদী নামে

এক অপ্সরাকে দেখে তাঁর চিত্তবিভ্রম ঘটেছিল। একটি শরস্তম্ভে তাঁর পুত্রকন্যার জন্ম। এ গল্প বোধহয় আগেই বলেছি।

তাউজী এ কথার কোন উত্তর দিলেন না।

গুরুজী বললেন: গৌতমের মতো জিতেন্দ্রিয় পুরুষ পুরাণে আর নেই। স্বয়ং ব্রহ্মা তাঁর চরিত্রমাধুর্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন। সেও এক সুন্দর গল্প।

সত্য যুগে ব্রহ্মা এক পরমা সুন্দরী কন্যা সৃষ্টি করলেন। তাঁর সৌন্দর্যে কোন খুঁত নেই, কোন ত্রুটি নেই। তাই এই মানস কন্যার নাম রাখলেন অহল্যা। কোন হল্য বা বিরূপতা নেই। সংস্কৃতে হল শব্দের মানে কদর্যতা। এই কন্যাকে তিনি দীর্ঘ দিনের জন্য গৌতমের কাছে গচ্ছিত রাখলেন। তারপর যখন তাঁকে নিতে এলেন, তখন গৌতমের যত্নের কথা শুনলেন, আর উভয়ের পবিত্র সম্বন্ধের কথা শুনে মুগ্ধ হলেন। বললেন, আমার এইরকম জামাতারই দরকার, আমি তোমার হাতেই অহল্যাকে সম্প্রদান করলাম।

অহল্যার বিবাহ হল গৌতমের সঙ্গে।

স্ত্রীপুরুষের পবিত্র সম্বন্ধই স্বাভাবিক। তার অন্যথায় আমরা নিন্দা করি। গৌতম ও অহল্যা দীর্ঘ সময় একত্র বাস করেও যে নিষ্ঠার সঙ্গে পরস্পরকে সম্মান করেছিলেন, তার জন্য আমরা গৌতমকেই শ্রদ্ধা করি। তার কারণ অহল্যার চরিত্রে বোধহয় দৃঢ়তার অভাব ছিল, এবং দেবরাজ ইন্দ্রের আকর্ষণ ছিল অহল্যার প্রতি। এই জন্যেই অনুমান করা যেতে পারে যে ব্রহ্মা তাঁর অনুপস্থিতির কালে কন্যাকে একা না রেখে গৌতমের কাছে রেখে গিয়েছিলেন। গৌতমের উপরে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস নিশ্চয়ই ছিল।

এই বিবাহে ইন্দ্র ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, ঈর্ষান্বিতও হয়েছিলেন। বেদে ইন্দ্র দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু পুরাণে তিনি দেবরাজ বলে পরিচিত হলেও চরিত্রবান বলে সম্মানিত নন। তিনি সোমপায়ী

এবং সুন্দরী নারীর প্রতি তাঁর দুর্বলতা সুবিদিত। শচীর সঙ্গে তাঁর বিবাহও কিছু রহস্যময়। কোনখানে দেখি, শচী কশ্যপের পুত্র পুলোমার কন্যা, আবার অন্যত্র দেখি তিনি অসুর রাজ পুলোমার কন্যা। অবশ্য অসুরেরাও কশ্যপেরই পুত্র। ইন্দ্র শচীর রূপে আকৃষ্ট হয়েই তাঁকে বিবাহ করেছিলেন। এমন কি বিবাহের পূর্বেই নাকি তাঁদের মিলন হয়েছিল। পুলোমা শাপ দেবেন বলে ইন্দ্র ভয় পেয়েছিলেন, তাই তাঁকে হত্যা করে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন।

এই ইন্দ্র ব্রহ্মার মানস কন্যা অহল্যার রূপেও মুগ্ধ হয়েছিলেন, এবং তাঁর বিবাহের পরেও লোভ সংবরণ করতে পারেন নি। একদিন তিনি গৌতম ঋষির ছদ্মবেশে তাঁর আশ্রমে এলেন। ঋষি তখন আশ্রমে নেই, অহল্যা একাকী আছেন। দেবরাজকে চিনতে পেরেও অহল্যার মতিভ্রম হল। ইন্দ্রের আবেদনে তাঁকে দেহদান করলেন। তারপর ভয় পেলেন স্বামীর অভিশাপের। বললেন, ঋষির আসবার সময় হয়েছে, আপনি পালান।

কিন্তু ইন্দ্র পালাবার অবকাশ পেলেন না। দেব-দানব-দুর্ধর্ষ তপোবলসমন্বিত অগ্নির মতো দীপ্যমান গৌতম তীর্থজলে স্নান করে কুশ ও সমিধ হাতে তাঁর সামনে উপস্থিত হলেন। ভীত ইন্দ্রকে মুনির বেশে দেখেই সব বুঝতে পারলেন। তারপর শাপ দিলেন দুজনকেই। ইন্দ্র পুরুষত্ব হারালেন, আর অহল্যা হলেন পাষাণে পরিণত। বহু সহস্র বৎসর নিরাহারে বায়ুভুক হয়ে ভস্মশয্যায় অদৃশ্য হয়ে বাস করবার পরে রামের আগমনে তিনি শাপমুক্ত হবেন।

পুরুষত্ব লাভের আশায় ইন্দ্রকে এই কলঙ্কের কথা দেবতাদের নিকট স্বীকার করতে হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন যে গৌতমের তপোবল খর্ব করবার জন্যই তাঁকে এই কাজ করতে হয়েছে। এক শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করে বা তপস্যার প্রভাবে মানুষ ইন্দ্রত্ব লাভ করতে পারে। সেইজন্যই তিনি সদাসতর্ক থাকেন এবং মুনিদের তপোভঙ্গের

জন্য কখনও অপ্সরা পাঠান, কখনও আসেন নিজে। অহল্যার মতো রূপসী নারীকে নিকটে পেয়েও যে ঋষির চিত্তে কোন বিকার ঘটে নি, স্বর্গের কোন অপ্সরা তাঁকে ভোলাতে পারত না।

গৌতমের আশ্রমে পৌঁছে বিশ্বামিত্র গল্প শোনালেন রামকে। রামের পবিত্র স্পর্শে অহল্যা উদ্ধার হলেন।

গুরুজী খানিকক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন। আমি ভেবেছিলাম, তিনি এবারে অন্য কোন ঋষির কথা ভাবছেন, কিংবা অন্য কোন কাহিনীর কথা। তাউজী তাঁকে খেই ধরিয়ে দেবার জন্য বললেন : তারপরে বিশ্বামিত্র এলেন জনকরাজার সভায়।

গুরুজী বোধহয় এই কথা শুনতে পেলেন না। বললেন : অহল্যার উপাখ্যান অনেকে একটা রূপক বলে মনে করেন। ইন্দ্র সূর্যের প্রতীক ও অহল্যা উষার। সূর্যোদয়ে উষা অসূর্যম্পশ্যা হয়। বেদের ভাষ্যকার কুমারিল ভট্ট বলেছেন যে ইন্দ্র সূর্যের প্রতীক বটে, কিন্তু অহল্যা রাত্রির প্রতীক। সূর্যের উদয় হলে রাত্রি হয় অদৃশ্য।

পুরাণের অহল্যা প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যার অন্যতমা।

গৌতমের কথায় আমার সত্যকামের গল্প মনে পড়ল। ছান্দোগ্য উপনিষদের গল্প, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পড়েছিলাম। সত্যকাম নামে এক বালক গৌতমের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার প্রার্থনা নিয়ে এলে ঋষি তাকে তার গোত্র জিজ্ঞাসা করেন। সত্যকাম তার মাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি মৃদু-কণ্ঠে অবনত মুখে বললেন,

যৌবনে দারিদ্র্যদুখে
বহু পরিচর্যা করি পেয়েছিনু তোরে,
জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে,
গোত্র তব নাহি জানি তাত।

তার এই কথা শুনে গৌতমের শিষ্যরা

কেহবা হাসিল কেহ করিল ধিক্কার
লজ্জাহীন অনার্যের হেরি অহংকার।

সত্যকাম অকপটে এই কথা গৌতমের নিকট স্বীকার করেন। কিন্তু উদারচেতা ঋষি বালকের এই সত্যবাদিতায় সন্তুষ্ট হয়ে তাকে আলিঙ্গন করে বললেন

অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত।
তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত।

পরবর্তী জীবনে এই সত্যকাম মহর্ষি হতে পেরেছিলেন।

এগারো

বশিষ্ঠের স্ত্রীর নাম অরুন্ধতী।

তাউজীর দিকে তাকিয়ে গুরুজী প্রশ্ন করলেন: কুশণ্ডিকার মন্ত্র মনে আছে?

তাউজী বিচলিত হয়ে উঠলেন! গুরুজী হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন করলেন বুঝতে না পেরে বললেন: বিবাহের পরে যে কুশণ্ডিকা হয় তার কথা জিজ্ঞাসা করছেন?

তাউজীর এ প্রশ্নটি বোধহয় অবান্তর হয়েছিল। তাই গুরুজী হেসে বললেন: হ্যাঁ।

তাউজী স্বীকার করলেন যে সে সব কথা তাঁর মনে নেই।

গুরুজী বললেন: কুশণ্ডিকার মন্ত্র উচ্চারণের সময় নববধূকে অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখাবার নিয়ম আছে। আকাশে সপ্তর্ষি মণ্ডলে বশিষ্ঠের পাশে অরুন্ধতীর স্থান। ক্ষুদ্র একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর পতিভক্তির মতোই সমুজ্জ্বল। যারা বিবাহিত তাদের হয়তো মনে আছে যে বর বধূকে এই নক্ষত্র দেখায়।

বলে গুরুজী মেয়েদের দিকে তাকালেন। বললেন: আকাশে অরুন্ধতীর দিকে তাকিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করেছিলে, ওগো সতী অরুন্ধতী, আমি যেন তোমার মতোই পতিব্রতা হই।

প্রজাপতি ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ কন্যা দেবতা অরুন্ধতীদর্শনে বিনিয়োগঃ

ওঁ অরুন্ধত্যবরুদ্ধাহমস্মি।...

ওঁ ধ্রুবা দ্যৌ ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ।

ধ্রুবাসঃ পর্বতা ইমে ধ্রুবা স্ত্রী পতিকুলে ইয়ম্।

আমি সকলের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। এ কথা সবার কাছেই নূতন মনে হয়েছে। তাই হয়। সংস্কৃতে অধিকার আমাদের এত

কম যে মন্ত্র আমরা না বুঝেই পাঠ করি, অর্থ বোধের চেষ্টা কখনও করি না। অর্থ না বুঝে মন্ত্র পাঠ যে নিরর্থক, তা আমরা মানি না। মানে না বুঝে শুধু শব্দ শুনে কি কোন মহৎ ভাব মনে আসে! শুধু ধ্বনিতে ব্যঞ্জনা আছে, নেই চেতনা।

অরুন্ধতীর পতিভক্তির কোন কাহিনী আমার জানা ছিল না। হয়তো অনেকেরই জানা ছিল না। দেবতার কথা আলোচনার সময় জেনেছিলাম যে সপ্তর্ষির যজ্ঞে উত্থিত হয়ে অগ্নি ঋষিপত্নীদের দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। অন্য দিকে দক্ষকন্যা স্বাহা অগ্নিকে কামনা করে একে একে ছয় জন ঋষিপত্নীর রূপ ধারণ করে তাঁর কাছে গিয়েছিলেন, কিন্তু অরুন্ধতীর তপস্যার প্রভাবে তাঁর রূপ ধারণ করতে পারেন নি।

গুরুজী বললেন: অরুন্ধতী ঋষিদের সঙ্গে সমান কৃচ্ছ্র সাধন করেছিলেন। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে আছে যে তিনি তাঁর স্বামী বশিষ্ঠের সঙ্গে ব্রহ্মলোক লাভের জন্য কঠোর তপস্যা করে পৃথিবী পর্যটন করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে সে যুগের শ্রেষ্ঠ ঋষিরাও ছিলেন—কশ্যপ অত্রি ভরদ্বাজ গৌতম বিশ্বামিত্র জমদগ্নি। কখনও অনাহারে কখনও বনের ফলমূল খেয়ে তাঁরা কোনমতে জীবন ধারণ করতেন। ইন্দ্র তাঁদের বিপদ থেকে উদ্ধার করে স্বর্গে নিয়ে যান।

অরুন্ধতী নক্ষত্র আমরা কখনও দেখি, কখনও দেখতে পাই না। এই নিয়ে মহাভারতে একটি কাহিনী আছে। বশিষ্ঠের মতো সচ্চরিত্র স্বামীকেও অরুন্ধতী একবার সন্দেহ করেছিলেন যে তাঁর ব্যভিচার দোষ হয়েছে, এবং সেইজন্য তাঁকে অবজ্ঞা করেছিলেন। এই পাপে তিনি মলিন হয়েছেন। অনেকের বিশ্বাস যে পরমায়ু শেষ হয়ে এলে অরুন্ধতী নক্ষত্র আর দেখতে পাওয়া যায় না।

অরুন্ধতী বিদুষী বলে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর বিদ্যাবত্তা বা পতিভক্তির পরাকাষ্ঠার কোন মুখরোচক কাহিনী পুরাণকার লিপিবদ্ধ করে যান নি।

অরুন্ধতী সম্বন্ধে আর কোন কথা গুরুজী আমাদের বলেন নি। বলেছিলেন পাধ্যে। সকাল বেলায় বাগানে কাজ করতে করতে একটা অলৌকিক কাহিনীর উল্লেখ করেছিলেন। বলেছিলেনঃ কোথায় পড়েছি বলতে পারব না। অরুন্ধতী সেখানে কর্দম ঋষির কন্যা নন, তিনি মেধাতিথি ঋষির পালিতা কন্যা। তাঁর জন্মের একটু ইতিহাস আছে।

হাতের কাজ থামিয়ে আমি গল্প শোনার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলাম।

পাধ্যে বললেনঃ সন্ধ্যা ব্রহ্মার মানস কন্যা। বিষ্ণু ছিলেন তাঁর ইষ্টদেবতা। তাঁর দেখা পাবার জন্য সন্ধ্যা বহু দিন তপস্যা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ব্রহ্মা এসে কন্যাকে বললেন, গুরুর কাছে দীক্ষা নাও নি বলেই বিষ্ণু দেখা দিচ্ছেন না। বশিষ্ঠ ঋষিকে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, তুমি তাঁর কাছে দীক্ষা নিও।

সন্ধ্যা এই আদেশ মেনে নিলেন। বশিষ্ঠের কাছে দীক্ষা নিয়ে আবার কঠোর তপস্যায় রত হলেন। তপে তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু দেখা দিলেন, বললেন, বর নাও। ধনরত্ন রাজ্য যা চাও তাই পাবে।

সন্ধ্যা বললেন, ও সবে আমার প্রয়োজন নেই, আমি যেন একাগ্র চিত্তে পাতিব্রত্য ধর্ম পালন করতে পারি।

বিষ্ণু বললেন, তথাস্তু। পরের জন্মে তুমি সে সুযোগ পাবে। মেধাতিথি ঋষির যজ্ঞভূমিতে জন্ম লাভ করে পৃথিবীতে তুমি পাতিব্রত্যের আদর্শ স্থাপন করবে। মৃত্যুর পরেও তুমি স্বামীর সঙ্গে অনন্ত জীবন লাভ করে নক্ষত্রলোকে বাস করবে।

আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলামঃ অরুন্ধতীই কি সন্ধ্যা?

আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পাধ্যে বললেনঃ চন্দ্রভাগা নদীর তীরে মেধাতিথি ঋষি জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ করছিলেন। যজ্ঞান্তে হোমের ভস্ম সরিয়ে ঋষি একটি শিশু কন্যা পেলেন। তাকে

কোলে তুলে নিতেই আকাশবাণী হল, ইনি ব্রহ্মার মানস কন্যা, বশিষ্ঠের মন্ত্রশিষ্যা সন্ধ্যা, পৃথিবীতে পতিব্রতার মহিমা স্থাপনের জন্য এই জন্ম নিয়েছেন।

ঋষি এই কন্যার নাম রাখলেন অরুন্ধতী।

আমি বলে উঠলাম : অসম্ভব।

কেন ?

অরুন্ধতী কর্দম ঋষির কন্যা। সে বিষয়ে মতভেদ নেই।

পাধ্যে বললেন : মতভেদ আছে কিনা জানি না, তবে আমি বশিষ্ঠের স্ত্রীর অন্য এক নামও শুনেছি, অক্ষমালা। তিনি নাকি শূদ্রকন্যা ছিলেন, এবং নিজের পাতিব্রত্যে ও পতির সঙ্গগুণে সর্বজনের পূজনীয়া হয়েছিলেন।

আমি বললাম : এ আরও অসম্ভব কথা।

পাধ্যে হেসে বললেন : বশিষ্ঠের নিজের জন্মেও তো গোলমাল আছে। সে কথা গুরুজীর মুখেও শুনেছি। বেদে তিনি মিত্রাবরুণের পুত্র, পুরাণে ব্রহ্মার। তুমি কোন্‌টা মানবে ?

বললাম : বশিষ্ঠ নামে একাধিক ঋষি ছিলেন বললেই সব গোলমাল মিটে যায়।

তাহলে তো অরুন্ধতীর সমস্যাও মিটে গেল।

কেমন করে ?

এক এক বশিষ্ঠের পত্নী এক এক জন। কর্দম ঋষির কন্যা এক বশিষ্ঠের স্ত্রী, আর এক বশিষ্ঠের পত্নী মেধাতিথি ঋষির পালিতা কন্যা। শূদ্রকন্যা অক্ষমালাকে বিবাহ করেছিলেন আর একজন বশিষ্ঠ।

হেসে বললাম : ব্যাপারটা বেশ সহজ হয়ে গেল।

পাধ্যে গম্ভীর হয়ে বললেন : তামাসা নয়, এও একটা মত। ঋষিরা বেদের সত্য যুগ থেকে রামায়ণ ও মহাভারতের কাল ত্রেতা ও দ্বাপর যুগেও জীবিত আছেন, তা সম্ভব নয়। ঋষিরা বংশানুক্রমে

তাঁদের গোত্র দিয়ে পরিচিত হতেন বলে অনেকের বিশ্বাস। এ যুগেও তার প্রমাণ আছে। বশিষ্ঠ ভরদ্বাজ ভার্গব কৌশিক প্রভৃতি পারিবারিক নাম উত্তর ভারতে প্রচলিত আছে।

তর্কে আমার প্রবৃত্তি ছিল না, বললাম: আপনি অরুন্ধতীর কথা বলুন। গুরুর সঙ্গে শিষ্যার কী করে বিবাহ হল সেই কথা।

পাধ্যে বললেন: মেধাতিথি অরুন্ধতীকে সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করালেন। কাজেই বড় হয়ে তিনি শুধু রূপে লাবণ্যেই অসামান্যা হলেন না, জ্ঞানে ও গুণেও অদ্বিতীয়া হলেন। মেধাতিথি তাঁর বিবাহের জন্য উদ্বিগ্ন হলেন। এমন সময় এক দিন তাঁর আশ্রমে বশিষ্ঠ এসে উপস্থিত হলেন। তপস্যায় উদ্ভাসিত তেজোদীপ্ত ব্রাহ্মণকে দেখে মেধাতিথি সুখী হলেন, বশিষ্ঠকে দৈব প্রেরিত বলে মনে করলেন। আর অরুন্ধতীও বশিষ্ঠকে দেখে তাঁর প্রতি অনুরক্ত হলেন।

পাধ্যে সহাস্যে বললেন: প্রথম দর্শনেই প্রেম।

সে যুগে এই বস্তুটা বোধহয় সস্তা ছিল।

সবই সস্তা ছিল। এমন কি ধার্মিক পুণ্যাত্মা লোকও পথে ঘাটে মিলত।

চোর ডাকাত?

পাধ্যে বললেন: তারও যে অভাব ছিল না তা আমরা অণীমাণ্ডব্য মুনির গল্পেই জেনেছি। চোরদের সঙ্গে তাঁকেও তো শূলে দেওয়া হয়েছিল।

আমি বললাম: এ যুগে তা আর সম্ভব নয়।

পাধ্যে এ কথা মেনে নিলেন, বললেন: তাহলে সবাইকেই শূলে যেতে হবে।

তারপরেই বললেন: থাক এ যুগের কথা। আমরা অরুন্ধতীর কথাই বলি। অরুন্ধতী তাঁর মায়ের কাছে মনের কথা গোপন করলেন না, অকপটে সব কথা স্বীকার করলেন। কন্যার মনোভাব

জানতে পেরে মাও খুশী হলেন, সংবাদটা দিলেন স্বামীকে। আর দ্বিধা কিসের! মেধাতিথি বোধহয় এই রকমেরই কোন সংবাদের আশা করছিলেন। বশিষ্ঠের কাছে প্রস্তাব করলেন, বশিষ্ঠ সম্মত হলেন অরুন্ধতীর পাণিগ্রহণে। শুভ দিনে তাঁদের বিবাহ হয়ে গেল।

আমি বললাম: এ একেবারে সাজানো গল্প।

পাধ্যে অস্বীকার করলেন না, বললেন: অসম্ভব নয়। আমি এ গল্প রামায়ণ মহাভারতে পড়ি নি, মেধাতিথি নামও দেখি নি কোনখানে। 'ভারতের সতী' নামে একখানা বইএ এই গল্প পড়েছি।

বললাম: আমাদের দেশেও এই রকম বই আছে। পুরাণের ছোটখাট ঘটনা এমন রঙ ফলিয়ে লেখা যে কতটুকু আসল আর কতটা কল্পনা বোঝা কঠিন।

পাধ্যে বললেন: এই গল্পে আরও একটি ঘটনার উল্লেখ ছিল। বশিষ্ঠের শত পুত্র বিনষ্ট হবার পর বশিষ্ঠ এই পাপের জন্য বিশ্বামিত্রকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হয়েছিলেন। অরুন্ধতী তাঁকে নিবৃত্ত করেছিলেন, বলেছিলেন, ধৈর্য ধর, ক্ষমাই পরম ধর্ম। অভিশাপ দিয়ে নিজের শক্তি ক্ষয় ক'রো না। নিজের শোকের কথা ভুলে অরুন্ধতী স্বামীকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন।

বাগানের কাজে পাধ্যের আজ মন ছিল না। বললেন: একটা কথা মেনে নিতেই হবে। বশিষ্ঠ অরুন্ধতীর পারিবারিক সম্বন্ধ ছিল অতি মধুর। শুধু সংসার যাত্রায় নয়, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও অরুন্ধতী বশিষ্ঠের সহধর্মিণী ছিলেন। সেবায় ও সাহচর্যে তিনি বশিষ্ঠের জীবন কল্যাণময় করেছিলেন। বশিষ্ঠও তাঁকে সম্মান দিয়েছিলেন অপরিমিত। শুধু আশ্রমে নয়, তপস্যায় ও তীর্থ পর্যটনেও তাঁকে অন্যান্য ঋষির সঙ্গে সঙ্গী রূপে গ্রহণ করেছিলেন। মহর্ষি অত্রির সঙ্গে অনসূয়া ছিলেন না, কিন্তু বশিষ্ঠের সঙ্গে ছিলেন অরুন্ধতী।

পাধ্যের দৃষ্টিতে আমি এক অদ্ভুত জ্যোতি দেখলাম। অরুন্ধতীকে তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা করেন। সে কথা নিজেই স্বীকার করলেন,

বললেন : অরুন্ধতী সত্যই আদর্শ নারী। সার্থক আমাদের বিবাহের মন্ত্র। অরুন্ধতী নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে নববধূ যে প্রার্থনা করেন, বিবাহিত জীবনে তাই সব চেয়ে মহৎ প্রার্থনা।

পাধ্যের কণ্ঠে যেন আমি বেদনার ধ্বনি শুনলাম।

বারো

অরুন্ধতীর পর গুরুজী বশিষ্ঠের জ্যেষ্ঠপুত্র শক্তির কথা শুরু করেছিলেন। তাউজী বাধা দিয়ে বললেন: বশিষ্ঠর জন্ম সম্বন্ধে আপনি একটু সন্দেহ জাগিয়ে দিয়েছেন। বশিষ্ঠের জনক ব্রহ্মা না মিত্রাবরুণ সে সম্বন্ধে আপনার কী মত তা জানবার ইচ্ছা ছিল।

গুরুজী বললেন: আমার মত কেন, তাহলে রামায়ণের কথাই বলি। উত্তর কাণ্ডে একটা কৈফিয়ৎ আছে। বশিষ্ঠ ব্রহ্মার মানস পুত্র, আবার মিত্রাবরুণেরও পুত্র। কী করে তা সম্ভব হল সেই ঘটনা রাম লক্ষ্মণকে বলছেন। ইক্ষ্বাকুর দ্বাদশ পুত্র নিমি গৌতমের আশ্রমে এক বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করেন। যজ্ঞে যাজকতা করবার জন্য তিনি প্রথমে বশিষ্ঠকে ও পরে অত্রি অঙ্গিরা ও ভৃগুকে বরণ করেন। কিন্তু বশিষ্ঠ তাঁকে বলেন যে তুমি অপেক্ষা কর, ইন্দ্র আমাকে আগে বরণ করেছেন, আমি তাঁর যজ্ঞ শেষ করে তোমার কাছে আসব। কিন্তু নিমি তাঁর জন্য অপেক্ষা না করে গৌতমকে যজ্ঞের ভার দেন। বশিষ্ঠ ফিরে এসে দেখলেন যে গৌতম হোম করছেন। এই দৃশ্য দেখে বশিষ্ঠ ক্রুদ্ধ হলেন। নিমি তখন নিদ্রামগ্ন। তাঁকে অভিশাপ দিলেন, আমাকে অবজ্ঞার জন্য তোমার মৃত্যু হবে।

নিদ্রাভঙ্গের পর নিমি যখন এই শাপের কথা শুনলেন, তখন তিনিও অভিশাপ দিলেন, আপনি বিনা অপরাধে আমাকে শাপ দিয়েছেন। কাজেই আপনারও মৃত্যু হবে, কিন্তু আপনার দেহ দীর্ঘ কাল অবিকৃত থাকবে।

এর ফলে দুজনেরই মৃত্যু হল। বশিষ্ঠ ব্রহ্মার নিকটে গিয়ে

নিজের দুঃখের কথা নিবেদন করলেন, বললেন, দেহহীনের অনেক দুঃখ, আপনি আবার আমাকে দেহ দিন।

ব্রহ্মা বললেন, অযোনিজ দেহ লাভের জন্য তুমি মিত্রাবরুণের স্খলিত তেজে প্রবেশ কর।

বশিষ্ঠ বরুণালয়ে গিয়ে মিত্র ও বরুণকে এক সঙ্গে দেখলেন। সেখানে উর্বশীও আছেন। ক্রীড়ারত উর্বশীকে বরুণ যখন কাছে ডাকলেন, তখন উর্বশী বললেন যে মিত্র তাঁকে আগে ডেকেছেন। ক্ষোভে বরুণ এক কুম্ভে তাঁর তেজ ত্যাগ করলেন, সেই কুম্ভে মিত্রের তেজও ছিল। সেই কুম্ভ থেকেই প্রথমে অগস্ত্য উৎপন্ন হলেন, তারপর বশিষ্ঠ।

তাউজী বললেন ঃ এ গল্প আমার কাছে গোঁজামিল মনে হচ্ছে।

গুরুজী জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কেন ?

যে বশিষ্ঠ কোন দিন কাউকে অভিশাপ দেন নি, তিনি অকারণে নিমিকে অভিশাপ দিলেন, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

গুরুজী বললেন ঃ মার্কণ্ডেয় পুরাণে তাহলে আরও অবিশ্বাস্য ঘটনার উল্লেখ আছে।

কী রকম ?

হরিশ্চন্দ্রকে কঠোর পরীক্ষার জন্য বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। দুজনে দুজনকে শাপ দিয়ে পক্ষীতে পরিণত হন। তারপরেও বিবাদ করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মা এসে তাঁদের রক্ষা করেন।

তাউজী বললেন ঃ একেবারেই অবিশ্বাস্য। বশিষ্ঠ এমন কাজ করবেন, এ কথা আমি বিশ্বাস করতে পারব না।

গুরুজী হেসে বললেন ঃ এই সব প্রক্ষিপ্ত কথাই তো পুরাণে বিভ্রম সৃষ্টি করেছে। তাতে গোঁজামিল না দিয়ে একটা মত মেনে নেওয়াই উচিত। বশিষ্ঠকে আমরা ব্রহ্মার মানস পুত্র বলে নিঃসন্দেহে মেনে নিতে পারি। প্রজা সৃষ্টির জন্য তিনি দশজন

মানস পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন নিজের দেহ থেকে। বশিষ্ঠ তাঁদের অন্যতম।

বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি্র কথা আগেই বলা হয়েছে। একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে রাজা কল্মাষপাদের সঙ্গে বিবাদ করে তাঁদের একশো ভ্রাতার জীবন দিতে হয়েছিল। এই ঘটনায় বিশ্বামিত্রেরও একটু কৌশল ছিল। শক্তি্ বেদজ্ঞ ও ধর্মাত্মা ছিলেন। ত্রিশঙ্কুর সঙ্গে তাঁর ব্যবহারেই সে কথা বোঝা গিয়েছিল। অহংকার ও ক্রোধে তাঁর সর্বনাশ হল।

গল্পটি আমার মনে পড়ল। পথ ছেড়ে দেওয়া নিয়ে রাজার সঙ্গে ব্রাহ্মণের বিবাদ। সংকীর্ণ অরণ্যপথে দুজনের দেখা। রাজা ভাবলেন, আমি রাজা, আমি কেন পথ ছাড়ব! ব্রাহ্মণ ভাবলেন, আমি ব্রাহ্মণ, সকলের সম্মানের পাত্র। অহংকারী রাজা ব্রাহ্মণকে কশাঘাত করলেন, আর ব্রাহ্মণ শাপ দিলেন রাজাকে, তোমার রাক্ষসের মতো আচরণ, তুমি রাক্ষস হও। রাজা রাক্ষস হয়ে প্রথমেই ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করলেন। তারপর একে একে তাঁর সমস্ত ভাইকে। সবার শেষে বশিষ্ঠকে যখন খেতে এলেন, তখন তিনি কমণ্ডলুর জল ছিটিয়ে রাজাকে শাপমুক্ত করে দিলেন। সেই হল যথার্থ ব্রাহ্মণের কাজ।

গুরুজী বললেন ঃ বশিষ্ঠের বংশ লোপ হয় নি। শক্তি্র সন্তান ছিল তাঁর স্ত্রী অদৃশ্যন্তীর গর্ভে। দ্বাদশ বর্ষে সেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। তাঁর নাম রাখা হল পরাশর। পরাসু থেকে পরাশর। পুত্র শোকে বংশ লোপের আশংকায় বশিষ্ঠ জীবন বিসর্জনে কৃতসংকল্প হয়েছিলেন, সেই জন্যেই পরাশর নাম। বশিষ্ঠকেই পরাশর পিতা বলে মনে করতেন। একদিন মায়ের সামনে বশিষ্ঠকে পিতা সম্বোধন করলে অদৃশ্যন্তী পুত্রকে তাঁর ভুল বুঝিয়ে দেন। বলেন, ইনি তোমার পিতামহ, এক রাক্ষস তোমার পিতাকে ভক্ষণ করেছে।

পরাশর এই কথা প্রথম শুনলেন। ক্রোধে অধীর হয়ে স্থির

করলেন যে ত্রিলোকের রাক্ষস ধ্বংস করবেন। বশিষ্ঠ এই সংকল্পের কথা শুনে দুঃখিত হলেন, বললেন, এ মহা অন্যায় হবে। একজন রাক্ষসের অপরাধে এ কাজ অসঙ্গত। কিন্তু পরাশর কিছুতেই মানলেন না, বললেন, রাক্ষসদের আমি কিছুতেই রেহাই দেব না। বলে রাক্ষস সত্রের অনুষ্ঠান আরম্ভ করলেন।

অগ্নি প্রজ্বলিত হল, এবং তাতে রাক্ষসেরা এসে দগ্ধ হতে লাগল। পরাশরের হিংসা যজ্ঞে ত্রিলোক বিচলিত হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত পুলস্ত্য পুলহ প্রভৃতি ঋষিরা এসে পরাশরের সামনে উপস্থিত হলেন। বললেন, বৎস, তুমি একজন রাক্ষসের অপরাধে অসংখ্য নির্দোষ রাক্ষসকে বধ করছ। তারা তোমার পিতার মৃত্যুর সম্বন্ধে কিছুই জানে না। তুমি তোমার পিতামহকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি জানেন যে তোমার পিতা নিজেই তাঁর মৃত্যুর জন্য দায়ী, তিনিই রাজা কল্মাষপাদকে শাপ দিয়ে রাক্ষসে পরিণত করেছিলেন। এই জন্য নির্দোষ রাক্ষসদের হত্যা করা তোমার উচিত নয়। তুমি যজ্ঞ সম্পূর্ণ কর।

পরাশরের ক্রোধ প্রশমিত হল। তিনি রাক্ষস সত্র সমাপ্ত করে হিমালয়ের উত্তরে যজ্ঞের অগ্নি নিক্ষেপ করলেন।

পরাশরের গার্হস্থ্য জীবন সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না। কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর আজও অক্ষুণ্ণ আছে। তিনি বেদের কিছু মন্ত্র রচনা করেছেন, কিন্তু তার চেয়ে বড় কাজ তাঁর সংহিতা প্রণয়ন। কলিতে আমাদের পরাশর সংহিতা মানবারই নির্দেশ আছে।

তাউজীর দিকে তাকিয়ে বললেন : সংস্কৃত বলব ?

তাউজী বললেন : বলুন না।

কৃতে তু মানবো ধর্মস্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতৌ কলৌ পরাশরঃ স্মৃতঃ॥

সত্যযুগে মনুর ধর্ম, ত্রেতায় গৌতমের স্মৃতি, দ্বাপরে শঙ্খলিখিত

ও কলিযুগে পরাশরের স্মৃতি। মনুর সঙ্গে পরাশরের যেখানে বিরোধ, সেখানে পরাশরই গ্রহণীয়।

গুরুজী একটু থেমে বললেন: কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস পরাশরের পুত্র, তাঁর জননীর নাম মৎস্যগন্ধা সত্যবতী। মহাভারতের আদি পর্বে ও দেবী ভাগবতে এই জন্মবৃত্তান্ত আছে।

গুরুজী কিছু ভাবছিলেন।

তাউজী বললেন: এই জন্মবৃত্তান্ত কি আপনি বলবেন না?

গুরুজী বললেন: সেই কথাই ভাবছিলাম। অশ্লীলতার ভয়ে মুনিঋষিদের জন্মবৃত্তান্ত বাদ দিতে হলে পুরাণের অনেক কাহিনীই বাদ দিতে হয়। সে যুগে সত্যবতী সৎমা হয়ে ভীষ্মকে যে কথা বলতে সঙ্কোচ করেন নি, এ যুগে আমরা তা সর্বসাধারণকে বলতে দ্বিধা করছি। এ আমাদের দুর্বলতা ছাড়া আর কিছু নয়।

তাউজী বললেন: এ দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেবার কি কোন যুক্তি আছে!

গুরুজী বললেন: এখানে হয়তো নেই, কিন্তু সমাজে আছে। নীতিবোধ যখন শিথিল হয়ে আসে, তখন দুর্নীতির কাহিনী সমাজের ক্ষতি সাধন করে। তোমাদের সকলের যদি মহাভারত পড়া থাকে তাহলে এ গল্পটি বাদ দেওয়া যেতে পারে।

তাউজী বললেন: মহাভারতের সব কথা মনে থাকে না। আপনি সংক্ষেপে বলুন।

আমি চেনেলুর দিকে তাকালাম, তাকালাম সুপ্তির দিকেও। সুপ্তি স্থির হয়ে বসে ছিল, আর চেনেলু তাকাচ্ছিল সকলের মুখের দিকে।

গুরুজী আর ইতস্তত না করে বললেন: পরাশর তীর্থ পর্যটনে বেরিয়ে যমুনার তীরে পৌঁছলেন। খেয়াঘাটে নৌকো আনলেন মৎস্যগন্ধা সত্যবতী। তাঁর জন্মবৃত্তান্ত রহস্যময়। অদ্রিকা নামে এক অপ্সরা ব্রহ্মশাপে মৎস্য হয়েছিল। তারই কন্যা

সত্যবতী। এক ধীবর তাঁকে পালন করেছিল। পরাশর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, মাঝি কোথায় ?

সত্যবতী বললেন, তাঁর পুত্র নেই, আমি খেয়া পারাপার করি। আমিই আপনাকে পরপারে পৌঁছে দেব।

নৌকায় বসে ঋষি এই কন্যার রূপ দেখে মুগ্ধ হলেন। বললেন, আমার বংশধর নেই, তুমি আমাকে একটি পুত্র দাও।

সত্যবতী ভয়ে চমকে উঠলেন। তিনি কুমারী,ঋষির এ কি অদ্ভুত প্রস্তাব! ভয়ে ভয়ে বললেন, দিনের আলোয় লোকে কী বলবে!

ঋষি বললেন, ঠিক কথা, আমি কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করছি।

বলতে বলতেই চারি দিক তমসাচ্ছন্ন হল। সত্যবতী এবারে লজ্জা পেলেন, বললেন, আমার কন্যাভাব দূষিত হলে আমি ঘরে মুখ দেখাব কেমন করে!

ঋষি বললেন, সে ভয়ও তোমার নেই। কেউ কিছু জানতে পারবে না।

ঋষির প্রসাদে মৎস্যগন্ধা যোজনগন্ধা হলেন। যমুনার দ্বীপে তাঁর পুত্র হল। নাম কৃষ্ণ, দ্বীপে জন্ম বলে দ্বৈপায়ন। জন্মের পরেই মায়ের নিকট অনুমতি নিয়ে তিনি তপস্যা করতে চলে গেলেন। বেদবিভাগ করে তাঁরই নাম বেদব্যাস হয়েছিল।

এ গল্প আমার কাছে অশ্লীল মনে হল না। হয়তো অশ্লীলতা বর্জন করেই গুরুজী এ গল্প বলেছিলেন। আধুনিক উপন্যাসে আমরা এমন ঘটনা অনেক পড়েছি। এর চেয়ে মুখরোচক কাহিনীও দেখতে পাই। সে সব পড়ে বাঙলার পাঠকের কোন ভাবান্তর হয় না।

গুরুজী বলেছিলেন ঃ পরাশর তাঁর এই দুর্বলতাকে দৈব ঘটনা বলে বিশ্বাস করেছিলেন। স্বর্গের অপ্সরা দেখেও তাঁর চিত্তে কখনও বিকার হয় নি। অথচ এক ধীবর কন্যার প্রতি আকস্মিক আসক্তি তিনি সংযত করতে পারেন নি। তিনি মনে করেছিলেন

যে কোন দৈব শক্তি তাঁকে এই দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত করেছিল। দেবী ভগবতে আছে যে পরাশর সত্যবতীকে বলেছিলেন, বিষ্ণুর অংশে তাঁর পুত্র হচ্ছে, পুত্র তাঁর বেদবিভাগ ও পুরাণ রচনা করে ভারতবিখ্যাত হবে। পরাশরের এই ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হয়েছিল।

বেদব্যাস একজন অসাধারণ ঋষি। ভারতের সঙ্গে তাঁর নাম অক্ষয় ভাবে যুক্ত আছে। দিব্য চক্ষে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে যুগে যুগে ধর্মানুরাগ কমে যাচ্ছে, মানুষের শক্তি ও পরমায়ুও ক্ষীণ হয়ে আসছে। বেদকে রক্ষা করতে হলে এবং ধর্মশাস্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে এগুলি সংস্কার করা দরকার। যুগোপযোগী করে না বললে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তিনি বেদকে সাত শাখাযুক্ত চার ভাগে বিভক্ত করলেন, অষ্টাদশ মহাপুরাণ মহাভারত ও বেদান্ত দর্শন রচনা করে শিষ্যদের উপদেশ দিলেন। সুমন্ত জৈমিনি পৈল ও বৈশম্পায়ন তাঁর উপযুক্ত শিষ্য। তাঁর পুত্রের নাম শুকদেব, তিনিও তাঁর শিষ্যদের মতো সমান পারদর্শী হলেন।

শুকদেবের জন্মবৃত্তান্ত কিছু অস্বাভাবিক। এক অপ্সরাকে দেখে বেদব্যাস মোহিত হয়েছিলেন। অপ্সরা শুকপক্ষীর রূপ নিয়ে পালিয়ে যায়। বেদব্যাসের স্খলিত তেজ থেকে শুকদেবের জন্ম হল।

বেদব্যাসের গার্হস্থ্য জীবনের কোন পরিচয় আমাদের জানা নেই। ভূমিষ্ঠ হবার পরেই তিনি মাতাকে বলেছিলেন যে স্মরণ করা মাত্রই তিনি এসে উপস্থিত হবেন। সত্যবতীর বিবাহ হয়েছিল মহারাজা শান্তনুর সঙ্গে। তাঁদের পুত্রের নাম চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য। অম্বিকা ও অম্বালিকার সঙ্গে তাঁদের বিবাহ হয়েছিল। চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে সত্যবতী বংশ রক্ষার জন্য ভীষ্মকে অনুরোধ করেছিলেন। ভীষ্ম রাজী না হওয়ায় তিনি ব্যাসদেবকে স্মরণ করে আনলেন। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু ও বিদুরের জন্মের কথা তোমরা মহাভারতে পড়েছ।

মহাভারতে আমরা বারে বারে ব্যাসদেবকে দেখতে পাই। কৌরব ও পাণ্ডব দুই দলেরই তিনি হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তাঁরই বিধানে পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীকে বিবাহ করেছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় ধৃতরাষ্ট্রের জন্য তিনি সঞ্জয়কে দিব্য চক্ষু দিয়েছিলেন। দিব্য দৃষ্টির বলে সঞ্জয় যুদ্ধক্ষেত্রে অনুপস্থিত থেকেও সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করে ধৃতরাষ্ট্রকে বর্ণনা করেন। যুদ্ধের পর মৃত বীরদের তাঁদের পরিবারবর্গকে দর্শন করিয়েছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রকেও দিব্য দৃষ্টি দিয়েছিলেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত কৌরব ও পাণ্ডববর্গকে শান্তি দেবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন।

গুরুজী বললেন: অনেকে বলেন যে বেদব্যাস কোন ব্যক্তির নাম নয়, এটি বেদ বিভাগকারী ঋষিদের উপাধি। পুরাণকারদের মতে ব্যাস একজন নন। কূর্ম বায়ু ও বিষ্ণু পুরাণে আটাশ জন ব্যাসের নাম পাওয়া যায়। কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের পূর্বে কল্পে কল্পে তাঁরা ধর্মরক্ষার জন্য বিষ্ণুর অংশে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বেদ বিভাগ করেছেন বলে সকলেই তাঁরা ব্যাস নামে সম্মানিত হয়েছেন।

গুরুজী বললেন: কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের মহাভারত রচনার কাহিনীটি নিশ্চয়ই জান।

আমরা কোন উত্তর দিলাম না।

তাউজী বললেন: আপনি আবার বলুন।

বেদব্যাস মুখে মুখে মহাভারত রচনা করেছিলেন। তারপর শিষ্যদের কী করে শেখাবেন তাই নিয়ে বিপদে পড়লেন। এত বড় রচনা কি মুখে মুখে শেখানো যায়, না কেউ শিখতে পারে। ব্রহ্মা এসে পরামর্শ দিলেন, তুমি গণেশকে স্মরণ কর। তিনি তোমার লেখক হবেন।

বেদব্যাস গণেশকে স্মরণ করলে তিনি এসে উপস্থিত হলেন এবং মহাভারতের লেখক হতে রাজী হলেন। কিন্তু বললেন যে থামলে চলবে না, একবার থামলে তিনি আর লিখবেন না।

বেদব্যাস ভেবে দেখলেন যে এই কাব্যে আট হাজার আট শো কূট শ্লোক আছে, যা তিনি বোঝেন আর বোঝেন শুকদেব। তাই বললেন, বেশ, আপনিও আমার শ্লোকগুলি বুঝে বুঝে লিখবেন, না বুঝে কিছু লিখতে পারবেন না। গণেশ তাতে সম্মত হলেন।

তারপর মহাভারত লেখা শুরু হল। গণেশ অতি দ্রুত লিখছেন, আর ভাববার অবসরের জন্য বেদব্যাস এক একটি কূট শ্লোক রচনা করছেন। গণেশ যখন সেই শ্লোকের অর্থ বুঝবার জন্য সময় নিচ্ছেন, সেই সময়ে বেদব্যাস আরও অনেক শ্লোক রচনা করে ফেলছেন। এমনি করে ষাট লক্ষ শ্লোকে মহাভারত সংহিতা সমাপ্ত হল। তার মধ্যে ত্রিশ লক্ষ শ্লোক দেবলোকে, পনর লক্ষ পিতৃলোকে, চোদ্দ লক্ষ গন্ধর্বলোকে প্রচলিত হল। মনুষ্যলোকের মহাভারতে মাত্র এক লক্ষ শ্লোক। উপাখ্যান বাদ দিয়ে ব্যাসদেব চব্বিশ হাজার শ্লোকে মহাভারত সংহিতা রচনা করেন। এই গ্রন্থ তিনি নিজের পুত্র শুকদেবকে পড়িয়ে তারপর অন্যান্য শিষ্যদের শিখিয়েছিলেন।

দেবতারা নাকি তুলাদণ্ডে মহাভারত ওজন করেছিলেন। দেখেছিলেন যে চতুর্বেদের চেয়েও এই গ্রন্থ মহত্ত্বে ও ভারবত্তায় বেশি।

গুরুজী সহাস্যে বললেন ঃ বেদব্যাসের রচনা বলে যা প্রচলিত আছে, একজন মানুষের জীবনে তা রচনা করা সম্ভব কিনা সেই প্রশ্ন জাগে। সে যুগে জীবন এমন সংক্ষিপ্ত ছিল না। তাই তিনি এই অসাধ্য সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ যুগে যে তাঁর সমস্ত গ্রন্থগুলি পড়তে পারে, আমি ভাবব সেই অসাধ্য সাধন করেছে।

ঋষির কথা গুরুজী আজ এইখানেই শেষ করলেন। উঠবার আগে বললেন ঃ কাল আমরা বেদব্যাসের শিষ্য ও প্রশিষ্যদের কথা আলোচনা করব।

তেরো

আমি বুঝতে পাচ্ছিলাম যে আমাদের মধ্যে এত দিন যে অস্থিরতা ছিল, এখন তা স্থির হয়ে গেছে। সুপ্তি আর সংস্কৃত পড়ে না, চেনেলুও পাধ্যের কাছে যায় না সংস্কৃত পড়তে। আমি সময় পাই নে। এমন দ্রুত আমরা পড়ছি যে তা টুকে রাখতে গেলে সময়ের অভাব হচ্ছে। অষ্টাদশ মহাপুরাণের দিকে তাকাতে ভয় করে, রামায়ণ আর মহাভারত অবলম্বন করে অগ্রসর হচ্ছি। মাঝে মাঝে পাধ্যের কাছে গিয়ে বসি। সংস্কৃত সম্বন্ধে দু একটা কথা হয়। ব্যাকরণের কথা নয়, কাব্যের কথাও না। রামায়ণ ও মহাভারতের ছন্দ নিয়ে আলোচনা করি, আলোচনা করি ভাষা ও বাচনভঙ্গি নিয়ে। আমি এর মধ্যে কোন মহত্ত্ব খুঁজে পাই নে, যেমন পাই কালিদাসে। পুরাণেরও একই অবস্থা। আমাদের বাঙলার কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারতের অবস্থাও একই রকম। প্রতি পংক্তিতে মিল আছে, কিন্তু ছন্দের মাধুর্য নেই, ছন্দ পতন আছে অনেক ক্ষেত্রে। তাউজী বলেন যে তুলসীদাসের রামচরিতমানস অপূর্ব গ্রন্থ। যেমন ভাষা, তেমনি ভাব, ধ্বনিও তেমনি। সুর করে পড়তে পারলে গানের মতো মনে হয়।

দুপুর বেলায় আমি মহাভারতের পাতা উল্টে দেখছিলাম। বেদব্যাসের জীবনের কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা পাওয়া যায় কিনা তারই চেষ্টা। এমন সময় সুপ্তি এসে উপস্থিত হল।

চেনেলু এতক্ষণ দরজার দিকে মুখ করে শুয়ে বাহিরের আকাশ দেখছিল। এবারে মুখ ফিরিয়ে শুল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : খবর কী ?

সুপ্তি বলল : বাবা বলছিলেন যে এখন শুধু একজনের হাতে বই উঠতে বাকি আছে।

কার হাতে ?

সুপ্তি হাসল, কিন্তু কোন উত্তর দিল না।

বললাম : তোমার হাতেও তো আমি কোন দিন বই দেখি নি!

সুপ্তি এ কথারও উত্তর দিল না, বলল : মিসেস খুরানাও আজ বাবার কাছ থেকে বই নিয়ে গেলেন।

কী বই ?

মহাভারত।

মিসেস খুরানা যে এখানে পড়তে আসেন নি, সে কথা আমি জানি। এক দিন বেড়াতে বেরিয়ে আমাকে বলেছিলেন যে তাঁর স্বামী সরকারী পয়সায় বিদেশে গেছেন। তাঁর সময় কাটছিল না। তাই খবর পেয়ে এখানে এসেছেন। স্বীকারও করেছিলেন যে এখানে তাঁর ভাল লাগছে না। তাঁর হাতেও বই উঠেছে শুনে আমার ভারি আশ্চর্য লাগল। বললাম : পড়ছেন নাকি ?

পড়ছেন না! শকুন্তলাদির পাশের খাটে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ছেন। এমন মনোযোগ কারও দেখি নি।

কেন জানি না, আমার মনে হল যে মিসেস খুরানা মহাভারত পড়ছেন না। বেছে বেছে হয়তো কিছু অশ্লীল গল্প পড়ছেন। কেন এ কথা মনে হল, তার কারণ আমি নিজেই জানি না। মিসেস খুরানা যদি পুরুষ হতেন, তাহলে আমি নিজে গিয়ে দেখে আসতাম, কিংবা চেনেলুকে বলতাম দেখে আসতে। সুপ্তিকে সে কথা বলা যায় না।

সুপ্তি বলল : তাইতেই বাবা বলছিলেন যে আর একজন মাত্র বাকি রইল। তার হাতে বই উঠলেই গুরুজীর দুঃখ ঘুচবে।

গুরুজীর আবার দুঃখ কিসের !

দুঃখ নেই! সারা জীবন দুঃখ পেয়েছেন বলেই তো আজ আশ্রম খুলে আমাদের ডেকে এনেছেন। শাশ্বত ভারতের কথা কেউ জানতে চায় না, এই তাঁর দুঃখ।

চেনেলু শুয়ে শুয়ে তার পা দোলাচ্ছিল। আমাদের কথা তার কানে যাচ্ছে না, এই রকমের একটা ভাব। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: গুরুজীর দুঃখের কথা তোমাকে কে বলল?

শুনেছি।

দুঃখ কার নেই! আমার আছে, তোমার আছে, চেনেলুরও আছে।

চেনেলু গর্জন করে উঠল: খবরদার, আমার কথা তোমরা আলোচনা করবে না।

সুপ্তি খিলখিল করে হেসে উঠে পালিয়ে গেল।

সুপ্তি চলে যাবার পরেও আমি তারই কথা ভাবতে লাগলাম। গুরুজীর দুঃখের কথা সে হয়তো ঠিকই বলেছে, হয়তো শুনেছে তাঁর মুখে, কিংবা তাউজী বলেছেন। শাশ্বত ভারতের কথা আমরা জানতে চাই না, জানবার জন্য আমাদের কোন চেষ্টা নেই। পুরাণের গল্পকে আমরা ইতিহাসের মর্যাদা দিই না। কল্পনার সঙ্গে কতটা সত্য মিলিয়ে আছে, তাও উদ্ধারের চেষ্টা কেউ করে নি। দণ্ডপাণি ঠিকই বলেন যে এ আমাদের বিলাতি শিক্ষার ফল। পুরাণকে তাঁরা ইতিহাসের সম্মান দেন নি। কাজেই আমরা কী করে দিই! অথচ পুরাণে যে সমস্ত স্থানের বর্ণনা আছে—তীর্থ ও জনপদের, নদী ও অরণ্যের, সে সমস্ত এখনও আমরা প্রত্যক্ষ দেখছি। পরিবর্তন যা হয়েছে, তা কালের ব্যবধানে। আমার মনে হল যে কেউ যদি পুরাণ থেকে ইতিহাসের তথ্য আবিষ্কারের চেষ্টা করেন, তাহলে তিনি ব্যর্থ হবেন না। অতিশয়োক্তি অনেক আছে, অতিরঞ্জনের অন্ত নেই, কিন্তু সত্যও আছে। দলিল দস্তাবেজ ঘেঁটে আমরা ইতিহাসের তথ্য বার করি, আর পুরাণের

অতিশয়োক্তি বর্জন করে আমরা তাকে ইতিহাসে পরিণত করতে পারি না!

চেনেলু কখন উঠে বসেছিল আমি দেখতে পাই নি। বলল: অমন গভীর মনোযোগে কী ভাবছ?

পুরাণের কথা ভাবছি।

চেনেলু একটা ভেংচি কেটে বলল: সে আবার একটা ভাবনার কথা!

ভেবেছিলাম, আমি কোন প্রতিবাদ করব না। কিন্তু এই ভাবনা আমাকে পেয়ে বসেছিল। তাই বললাম: ঋষিদের কথায় অনেক অবিশ্বাস্য ঘটনা জড়িয়ে গেছে। সামান্য চেষ্টা করলেই তাকে বিশ্বাসযোগ্য করা যায়।

চেনেলু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি বললাম: একটা ছোট্ট ঘটনা নাও। বিশ্বামিত্রের একশো ছেলে একসঙ্গে বশিষ্ঠকে আক্রমণ করতে তেড়ে এল। এক হুঙ্কারে বশিষ্ঠ তাদের ভস্ম করে ফেললেন। বিশ্বামিত্র তখন রাজা। তার অনেক দিন পরের ঘটনা। বিশ্বামিত্র তপস্বী ঋষি। শুনঃশেফ তাঁর কাছে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে এলেন। তখনও আমরা বিশ্বামিত্রের শত পুত্রকে আবার জীবিত দেখতে পাই। এই ঘটনা থেকে যদি বলি যে বশিষ্ঠের হুঙ্কারে বিশ্বামিত্রের পুত্রেরা ভস্ম হয় নি, তারা পালিয়ে গিয়েছিল, তাহলে কোন অবিশ্বাসের প্রশ্নই ওঠে না।

চেনেলুর দৃষ্টিতে এবারে আমি বিস্ময় দেখলাম। কিন্তু আমি থামলাম না, বললাম: এই শত পুত্রের কথাই ধর। কথায় কথায় আমরা শত পুত্রের উল্লেখ পাই। বশিষ্ঠের শত পুত্র, ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র, কিন্তু নাম পাই কয়েকজনের, কখনও একজনের। যেমন বশিষ্ঠের পুত্র শক্ত্রি, পুত্রবধূ অদৃশ্যন্তী, আর কোন পুত্র বা পুত্রবধূর নাম আমরা পাই নে। এর থেকে যদি মনে করি যে বশিষ্ঠের

একজনই পুত্র ছিল এবং তারই মৃত্যুতে বশিষ্ঠ শোকে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন, তাহলে ক্ষতি কী!

বললাম: এমনি করেই আমরা আমাদের প্রাচীন ঋষিদের বাস্তব মানুষে পরিণত করতে পারি। শুধু একটু চিন্তার দরকার, একটু অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের প্রয়োজন। ঋষিরা মিথ্যা নন, মিথ্যা আমাদের সন্দেহ।

চেনেলু কোন কথা বলতে পারল না।

চোদ্দ

বেদব্যাসের পর গুরুজী শুকদেবের কথা বললেন।

শুকদেব অযোনিসম্ভূত ঋষি। তাঁর পিতা বেদব্যাস আকাশ বাতাস ভূমি ও অগ্নির মতো পবিত্র এক পুত্র লাভের জন্য সুমেরু পর্বতে মহাদেবের তপস্যা করেছিলেন। শতবর্ষ পরে মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বর দিয়েছিলেন যে তিনি একটি তেজস্বী ও কীর্তিমান পুত্র লাভ করবেন। এই বর পেয়ে ব্যাসদেব হৃষ্ট মনে নিজের আশ্রমে ফিরে এলেন।

গুরুজী বলেছিলেন যে ব্যাসদেবের গার্হস্থ্য জীবন যাপনের পরিচয় আমাদের জানা নেই। আমার মনে হল, তিনি বিবাহিত ছিলেন না। পত্নী থাকলে সন্তান সন্ততিও থাকত, পুত্র লাভের জন্য সুমেরু পর্বতে তপস্যা করতে যেতেন না। পরক্ষণেই মনে হল যে এমন নজির পুরাণে অনেক আছে। স্বামী স্ত্রীও বোধহয় এক সঙ্গে হিমালয়ে তপস্যা করেছেন উপযুক্ত পুত্রের কামনায়। এ সম্বন্ধে কেউ কোন প্রশ্ন করলেন না, আমিও নীরবে রইলাম।

গুরুজী বললেনঃ শুকদেবের জন্মবৃত্তান্তেও কিছু অসম্ভাব্যতা আছে, অশ্লীলতাও আছে। সুমেরু পর্বত থেকে নিজের আশ্রমে ফিরে বেদব্যাস হোম করতে বসলেন। অরণি কাষ্ঠ ঘষে তিনি আগুন জ্বালবেন, এমন সময় স্বর্গের অপ্সরা ঘৃতাচীকে দেখতে পেলেন। রূপে মুগ্ধ হলেন ঋষি, অরণিতে বীর্যপাত হল। ঋষির এই চাঞ্চল্য দেখে ভয়ার্ত অপ্সরা শুকপক্ষীর রূপ ধারণ করে পালিয়ে গেলেন। অগ্নির জন্য বেদব্যাস সেই অরণি মন্থন করতে লাগলেন, আর তার ফলে অগ্নির মতো জ্যোতির্ময় রূপে যিনি আবির্ভূত হলেন, তিনিই শুকদেব। শুকপক্ষী থেকে শুকদেব নাম।

শুকের জন্ম সময়ে অনেক দৈব ঘটনা ঘটেছিল। মূর্তিমতী গঙ্গা এসে শিশুকে স্নান করিয়েছিলেন। আকাশে নৃত্যগীত হয়েছিল অপ্সরাদের, বিদ্যাধর ও দেবতারা এসেছিলেন শিশুকে দেখতে, নারদ গান গেয়েছিলেন। সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে শিশু বাড়তে লাগল। অন্তরীক্ষ থেকে দণ্ড কমণ্ডলু ও কৃষ্ণসার মৃগচর্ম বর্ষিত হল, ব্যাসদেব যথাবিধানে তাঁর উপনয়ন সম্পন্ন করলেন এবং সাঙ্গোপাঙ্গ সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করালেন।

দেবী ভাগবতে ঘৃতাচীর গল্প একটু অন্যরকম। ঘৃতাচী এসেছিলেন বেদব্যাসের নিকটে। ঋষি ভাবলেন, এই দেবকন্যা তো আমার যোগ্য নয়, আমি এঁকে নিয়ে কী করব! এদিকে ঋষিকে চিন্তিত দেখে অপ্সরা ভাবলেন, বিপদ, বেদব্যাস হয়তো তাঁকে শাপ দেবেন। এই ভয়েই ঘৃতাচী শুকপক্ষীর রূপ ধারণ করে পালিয়ে গেলেন। বেদব্যাস এই ব্যাপার দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হলেন। দেবকন্যা পাখী হয়ে পালাল! তারপর সেই অপ্সরার রূপের কথা ভাবতে গিয়ে চঞ্চল হলেন। এইটুকুই তফাৎ।

শিক্ষার জন্য বেদব্যাস পুত্র শুকদেবকে দেবগুরু বৃহস্পতির নিকটে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে তিনি সকল শাস্ত্রের শিক্ষা সমাপ্ত করে গুরুদক্ষিণা দিয়ে গৃহে ফিরলেন।

বেদব্যাস প্রসন্ন মনে পুত্রকে গ্রহণ করে প্রথমেই উপদেশ দিলেন, বিবাহ কর। গার্হস্থ্যাশ্রমই সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ, কাজেই কোন সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করে সংসারী হও।

শুকদেবের তখনও সংসারে অনুরাগ জন্মে নি, বললেন, আপনি নিজে তপস্বী, ধর্মতত্ত্বে আপনার অবিদিত কিছু নেই। পরমার্থের কথা চিন্তা করে আপনি যা আদেশ করবেন, আমি তাই পালন করব।

বেদব্যাস বললেন, সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করে তুমিও জ্ঞানী হয়েছ, তোমাকে আমি আর কী বোঝাব! তুমি এখন যুবক, যৌবন একবার

গেলে আর তা ফিরে পাবে না। দারিদ্র্যের ভয়ে যদি তোমার বৈরাগ্য এসে থাকে, তাহলে তুমি নির্ভয় হও। আমি কোন রাজার কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে দেব, তোমার সংসারে কোন অভাব থাকবে না।

শুকদেব এ কথা মেনে নিতে পারলেন না, বললেন, ঋষিরা তো বলেন যে সংসার সুখ দুঃখে ভরা। পরাধীন জীবনে মুক্তির আনন্দ নেই। বেদ পড়ে দেখলাম তা কর্মমার্গের হিংসাময় শাস্ত্র। গুরু বৃহস্পতিরও দেখলাম ঘোর অবিদ্যাগ্রস্ত হৃদয়। এবারে আপনি আমাকে অবিদ্যার বন্ধন থেকে মুক্ত হবার উপদেশ দিন।

বেদব্যাস দেখলেন যে তাঁর পুত্র কিছুতেই সংসারাসক্ত হবে না। বললেন, তুমি আমার ভাগবত পড়।

কিন্তু এই ভাগবত পাঠ করেও শুকদেবের সন্দেহ দূর হল না। তখন বেদব্যাস শুকদেবকে রাজর্ষি জনকের নিকট পাঠালেন।

জনক যে সে যুগের একজন তত্ত্বজ্ঞানী রাজা ছিলেন, তা আমার জানা ছিল। ঋষির মতো তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান, তাই তিনি রাজর্ষি নামে অভিহিত। বৃহদারণ্যক উপনিষদে নাকি আছে যে এই জনক রাজার সভাতেই ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা হয়েছিল। তাতে যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন বচক্নু-কন্যা গার্গী। আশ্চর্য রাজা। এমন পণ্ডিত রাজার কথা ইতিহাসে আছে কিনা আমার জানা নেই।

গুরুজী বললেন ঃ শুকদেব জনকের সভায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। বললেন, আপনি জীবন্মুক্ত বলে পরিচিত, কিন্তু আপনাকে আমার ঘোরতর বিষয়ী বলে মনে হচ্ছে।

এ কথার উত্তরে জনক হেসে বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন যে আমি বিষয় ভোগ করি। কিন্তু কোন বিষয়ে বদ্ধ নই বলে আমার সুখের অভাব নেই। আপনার অন্তরে আছে অনেক সংশয়, তাই আপনাকে এত দূর দেশে ছুটে আসতে হয়েছে। যোগের

প্রথম অবস্থায় কোমল বৈরাগ্যে সমস্ত ইন্দ্রিয় বশীভূত হয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু মায়াবদ্ধ মানুষ খুব সহজে ইন্দ্রিয় নিগ্রহে সমর্থ হয় না। মহাপুরুষদেরও কখনও কখনও পথভ্রষ্ট হতে দেখা যায়। সেইজন্যই তাঁরা গার্হস্থ্যাশ্রমকেই শ্রেষ্ঠ আশ্রম বলেন, সেখানেই ইন্দ্রিয় নিগ্রহ সম্ভব।

রাজর্ষি জনকের সঙ্গে শুকদেবের অনেক তর্ক হল। রাজর্ষি বুঝিয়ে বললেন, নিঃসঙ্গ থাকা কোনখানেই সম্ভব নয়। বনে গেলে মৃগ আছে, আকাশ আছে, পঞ্চভূত আছে। আহারের চিন্তা আপনার যাবে না, আমার রাজ্য চিন্তার মতো আপনার দণ্ড ও অজিনের চিন্তাও সঙ্গে যাবে। তার চেয়ে আপনি সংসারী হয়ে সুখী হন। এই দেহ এই সংসার আমার, এ কথা ভাবলেই আপনি বদ্ধ ; আর আমার কিছুই নয়, এই বিশ্বাস জন্মালেই আপনি মুক্ত।

রাজর্ষি জনকের কথায় শুকদেবের সন্দেহ ভঞ্জন হল। আশ্রমে ফিরে গিয়ে তিনি পীবরী নামে এক কন্যাকে বিবাহ করে সংসারী হলেন। কালক্রমে তাঁর চার পুত্র ও এক কন্যা জন্মাল। তাদের নাম কৃষ্ণ গৌরপ্রভ ভূরি দেবশ্রুত ও কীর্তিমতী।

শুকদেব পরীক্ষিৎকে ভাগবত শুনিয়েছিলেন। তাতে তিনি ব্রহ্মশাপ থেকে মুক্তিলাভ করেন।

গুরুজী একটু থেমে বললেন ঃ শুকদেবের এই সংসারী হবার গল্প দেবী ভাগবতে আছে। কিছুদিন সংসার করবার পর তিনি কৈলাসে যান কঠিন তপস্যার জন্য।

মহাভারতের শান্তি পর্বে শুকদেবের কাহিনী কিছু অন্য রকম। তাঁর বিবাহ ও গার্হস্থ্যাশ্রমের কোন উল্লেখ নেই। পক্ষান্তরে তাঁর জিতেন্দ্রিয় অনাসক্তির কথা আছে। শুকদেব অন্তর্হিত হবার পর বেদ-ব্যাস যখন তাঁর পুত্রের সাধনস্থলে বসে তাঁর কথা চিন্তা করছিলেন, তখন তিনি মন্দাকিনী তীরে নগ্ন অপ্সরাদের দেখে বিস্মিত হলেন। তারা অত্যন্ত সহজ সাবলীল ভাবে ক্রীড়া করছিল। সহসা এই

বৃদ্ধ মহর্ষিকে দেখে তারা ত্রস্ত ও লজ্জিত হয়ে উঠল। কেউ জলে লীন হল, কেউ গুল্মের আড়ালে লুকলো, কেউ বা তার বসনের জন্য ত্বরান্বিত হল। বেদব্যাস যুগপৎ লজ্জিত ও প্রীত হলেন। তাঁর যুবক পুত্র কত নির্বিকার ছিল যে এই অপ্সরাগণ কোন দিন তাঁর উপস্থিতিকে গ্রাহ্য করে নি, অথচ তাঁর মতো বৃদ্ধকে দেখে এরা লজ্জা পাচ্ছে!

তাউজী বললেন: এ তো সামান্য প্রভেদ নয়, একটা মানুষের চরিত্র একেবারে অন্য রকম হয়ে গেল।

গুরুজী এ কথা মেনে নিলেন, বললেন: সত্যি কথা, এবং এই কাহিনীই আমার সত্য বলে মনে হয়।

তাউজী জিজ্ঞাসা করলেন: কেন?

গুরুজী বললেন: মহাভারতের কথা তাহলে প্রথম থেকেই বলি। শুকদেবের জন্মের পরেই মহাদেব পার্বতীর সঙ্গে এসে তাঁর উপনয়ন সংস্কার করেছিলেন। ইন্দ্র দিয়েছিলেন কমণ্ডলু ও দিব্যবস্ত্র।

আপাতদৃষ্টিতে এই সব ঘটনা অবিশ্বাস্য মনে হয়, কিন্তু মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে সাহস পাই নে। আমার মনে হয়েছে যে কোথাও একটু ফাঁক আছে, সেইটুকু না জানার জন্যেই এই সব ঘটনা বিশ্বাস করতে আমাদের কষ্ট হয়।

গুরুজী বললেন: শুকদেব পিতার নিকট মোক্ষধর্মের উপদেশ চেয়েছিলেন। পিতা তাঁকে নিখিল-যোগ ও কাপিল শাস্ত্র শিখিয়ে মিথিলায় জনকরাজার কাছে পাঠালেন। শুকদেব সুমেরু পর্বত থেকে যাত্রা করে ইলাবৃতবর্ষ হরিবর্ষ ও হৈমবর্তবর্ষ অতিক্রম করে চীন হূণ প্রভৃতি দেশ দেখে ভারতবর্ষে এলেন।

জনকের রাজপ্রাসাদেরও বর্ণনা আছে। দুই মহল অতিক্রম করে শুকদেব অমরাবতীর মতো তৃতীয় মহলে উপস্থিত হলেন। পঞ্চাশজন সুন্দরী বারাঙ্গনা তাঁকে অভ্যর্থনা করেছিল। পাদ্য অর্ঘ্যে

পূজা করে আহার্য নিবেদন করেছিল তাঁকে। তাদের সঙ্গে শুকদেব একরাত্রি যাপন করেছিলেন, কিন্তু নির্বিকার চিত্তে। জিতেন্দ্রিয় শুকদেবের কোন অসুবিধা হয় নি।

রাজর্ষি জনক পর দিন এসেছিলেন গুরুপুত্রের কাছে। আলোচনা হয়েছিল মোক্ষধর্মের উপর। শুক জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যার মনে কোন দ্বন্দ্ব নেই, শাশ্বত জ্ঞানলাভও হয়েছে, তাকেও কি ব্রহ্মচর্যের পর গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করতে হবে?

জনক বললেন, জ্ঞানের জন্য যেমন গুরুর উপদেশ চাই, তেমনি জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রয়োজন মোক্ষের জন্য। লোকাচার ও কর্মকাণ্ড প্রচলিত রাখবার জন্যই চতুরাশ্রম বিহিত হয়েছে। মোক্ষ লাভ হয় এই চার আশ্রমের ধর্ম পালনের পর।

শুক জিজ্ঞাসা করলেন, কারও ক্ষেত্রেই কি এর ব্যতিক্রম নেই?

জনক বললেন, আছে। বহু জন্মের সাধনার ফলে চিত্ত যাঁর শুদ্ধ হয়েছে, ব্রহ্মচর্যাশ্রমেই তাঁর মোক্ষ লাভ হতে পারে।

শুকদেব এই কথাই শুনতে এসেছিলেন। রাজর্ষি জনকের কাছে আরও অনেক উপদেশ নিয়ে বদরিকাশ্রমে পিতার নিকট ফিরে এলেন। বেদব্যাস তখন তাঁর চার শিষ্য সুমন্ত জৈমিনি পৈল ও বৈশম্পায়নকে বেদাধ্যয়ন করাচ্ছিলেন। শিষ্যরা শিক্ষা সমাপ্ত করে বিদায় নিলে বেদব্যাস দুঃখিত অন্তরে বসে ছিলেন। এমন সময় দেবর্ষি নারদ এসে উপস্থিত হলেন। এইবারে শুক নারদের নিকটে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করলেন। ভাবলেন, বিদ্যার্জনে যেমন বহু শ্রম, তেমনি স্ত্রীপুত্র পালনেও অনেক কষ্ট। তার চেয়ে কম আয়াসে কোন শাশ্বত স্থান লাভ করাই বাঞ্ছনীয়। তিনি স্থির করলেন যে যোগবলে দেহত্যাগ করে সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করবেন। করলেনও তাই। কৈলাসে গিয়ে যোগবলে সূর্যের দিকে যাত্রা করলেন, এবং আকাশেই ব্রহ্মত্বলাভ করলেন।

স্নেহকাতর বেদব্যাস পুত্রের অনুসরণ করে তাঁকে ডাকতে

লাগলেন। শূন্য থেকে শুক ভোঃ বলে উত্তর দিলেন। পাহাড়ে গিরিগহ্বরে তার প্রতিধ্বনি জাগল, মহাদেব এসে শোকার্ত পিতাকে সান্ত্বনা দিলেন, তোমাদের পিতাপুত্রের কীর্তি অক্ষয় হবে। আমার প্রসাদে তুমি তোমার পুত্রের ছায়া দেখবে সর্বত্র।

আজও আমরা আকাশে শুকতারা দেখি, আর পাহাড়ে শুনি তাঁর উত্তরের প্রতিধ্বনি। বেদব্যাসও অমর হয়েছেন লেখক রূপে। মহাদেবের আশীর্বাদ সার্থক হয়েছে।

পনর

গুরুজী খানিকক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন, তারপর বললেন: বশিষ্ঠের আর কোন বংশধরের কথা আমার জানা নেই। শুকদেবের পরে বলতে হয় বেদব্যাসের শিষ্যদের কথা—সুমন্ত পৈল জৈমিনী ও বৈশম্পায়নের কথা।

সুমন্তর কথা কিছু জানা যায় না, কিন্তু পৈল জৈমিনী ও বৈশম্পায়ন বিখ্যাত হয়েছিলেন। পৈল ঋগ্বেদকে দুইভাগে বিভক্ত করে এক ভাগ তাঁর শিষ্য ইন্দ্রপ্রমিতকে ও অন্য ভাগ বাস্কলকে শিক্ষা দেন। ইন্দ্রপ্রমিত ঋগ্বেদের একজন আচার্য। তাঁর সংহিতার এক অংশ পুত্র মাণ্ডুকেয়কে অধ্যয়ন করান। মাণ্ডুক্য এঁর পুত্র।

জৈমিনির কীর্তি তাঁর পূর্বমীমাংসা দর্শন, জৈমিনী-ভারত নামে একখানি সংহিতাও তিনি রচনা করেছিলেন। বেদব্যাস এঁকে সামবেদ ও যজুর্বেদ শিক্ষা দিয়েছিলেন।

গুরুজী একটু চিন্তা করে বললেন: জৈমিনীর জীবন সম্বন্ধে আমাদের বেশি কিছু জানা নেই। তাঁর মীমাংসা দর্শন নিয়েই আমরা মাতামাতি করি।

তাউজী জিজ্ঞাসা করলেন: মীমাংসা সম্বন্ধে কিছু বলবেন না?

গুরুজী বললেন: সে আলোচনা শাস্ত্রের কথায় বা দর্শনের কথায় প্রাসঙ্গিক হবে।

তাউজী তবু বললেন: মোটামুটি একটু পরিচয় দিলে মন্দ হত না।

গুরুজী হেসে বললেন: মীমাংসা ষড়্‌দর্শনের অন্তর্গত দর্শন শাস্ত্র। প্রয়োজন ব্যতিরেকে কেউ কোন কর্মে প্রবৃত্ত হয় না, ধর্ম

নিরূপণের উদ্দেশ্যে জৈমিনীর এই দর্শনের আরম্ভ। বৈদিক যাগ যজ্ঞের মীমাংসা করা হয়েছে বলেই মীমাংসা দর্শন। এর দুটি ভাগ। জৈমিনীর পূর্বমীমাংসা এবং বাদরায়ণের উত্তরমীমাংসা। উত্তরমীমাংসা বেদান্ত নামে পরিচিত বলে পূর্বমীমাংসাই মীমাংসা দর্শন।

তাউজীর দিকে চেয়ে গুরুজী সহাস্যে প্রশ্ন করলেনঃ সংস্কৃত শ্লোক বলব?

তাউজী উত্তর দিলেনঃ বলুন না।

গুরুজী বললেনঃ ধর্মাখ্যং বিষয়ং বক্তুং মীমাংসায়া প্রয়োজনম্। —ধর্মের লক্ষণ ও প্রমাণ নিরূপণ করাই মীমাংসা দর্শনের উদ্দেশ্য ও প্রতিপাদ্য, যেমন ব্রহ্মনিরূপণ বেদান্তের উদ্দেশ্য—অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।

এই পর্যন্ত বলেই গুরুজী আবার থামলেন। আমি ভেবেছিলাম যে মীমাংসার সম্বন্ধে তিনি আরও কিছু আলোচনা করবেন। কিন্তু তা করলেন না। বললেনঃ ঋষির কথায় দর্শনের কথা ভাল লাগবে না। তার জন্য অন্য রকম আবহাওয়া দরকার। বেদগান শুনলে ভাল লাগে, কিন্তু দর্শনের বক্তৃতা বিরক্তিকর। দর্শন অনুভবের জিনিষ। অনেক অধ্যবসায় নিয়ে অধ্যয়ন করলে কিছু অনুভব করা যায়, তপস্যায় হয় পূর্ণজ্ঞান।

গুরুজীর এই মত শুনে আমার মনে হল যে তিনি বোধ হয় দর্শনের আলোচনা আমাদের কাছে করবেন না। করলেও খুব সংক্ষেপে করবেন। দর্শন কঠিন শাস্ত্র, আর কঠিন সব কিছুর প্রতিই আমরা বিমুখ। যা আয়ত্ত করা কঠিন, এ যুগে তা আমরা বর্জন করছি। যা হাল্কা, তাই আমাদের কাম্য হয়েছে। তপস্যার কথা ভুলে গিয়ে আমরা বিলাসে মনোনিবেশ করেছি।

গুরুজী বললেনঃ বেদব্যাসের চতুর্থ শিষ্যের নাম বৈশম্পায়ন। বৈশম্পায়ন আমাদের নিকট পরিচিত নাম। বেদব্যাসের তিনি প্রিয়

শিষ্য, গুরুর কাছ থেকে তিনি যজুর্বেদ ও সংহিতা পেয়েছিলেন। আর গুরুর আদেশে রাজা জন্মেজয়কে তিনি মহাভারত কথা শুনিয়েছিলেন। তিনি ষট্ পৌরাণিকের অন্যতম, লোমহর্ষণ তাঁরই নিকট পুরাণ পাঠ শুনেছিলেন।

পুরাণে পাঁচজন ঋষি বজ্রধারক নামে পরিচিত। বজ্রবারক কথার মানে বোঝ ?

বলে তাউজীর দিকে তাকালেন।

তাউজী বললেন ঃ না।

গুরুজী বললেন ঃ এই পাঁচজন ঋষির নাম করলে বজ্রের ভয় দূর হয়। পুলস্ত্য পুলহ জৈমিনী সুমন্ত বৈশম্পায়ন।

তাউজীর দিকে তাকিয়ে সহাস্যে বললেন ঃ ইচ্ছে কর তো সংস্কৃত শ্লোকটা লিখে নিতে পার ঃ

জৈমিনিশ্চ সুমন্তশ্চ বৈশম্পায়ন এব চ।
পুলস্ত্যঃ পুলহশ্চৈব পঞ্চৈতে বজ্রবারকাঃ ॥

তাউজী কিছু লিখলেন না, তাই দেখে গুরুজী আবার একটু হাসলেন।

আমি এই হাসির অর্থ বুঝি। সংস্কৃত শ্লোকের প্রতি তাউজীর একটা দুর্বলতা আছে। দেবতার কথা বলবার সময় তিনি আমাকে অনেক শ্লোক শুনিয়েছিলেন। সত্যি বলতে কি, আমি একটু ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল যে সংস্কৃত না জানলে এই আশ্রমে আমি কিছুই শিখতে পারব না। সেই জন্যেই পাধ্যের কাছে সংস্কৃত শিখতে গিয়েছিলাম। সংস্কৃতের ভয় এখন আমার দূর হয়েছে। গুরুজী সংস্কৃত শ্লোক বলেন তাউজীর জন্য। এই দুর্বলতার কথা জানেন বলেই বোধহয় হাসেন। আমরা হাসি না, আমরা তাউজীকেও সম্মান করি।

গুরুজী বললেন ঃ বৈশম্পায়নের সম্বন্ধে একটি কাহিনী খুব

প্রচলিত আছে। সে তাঁর প্রায়শ্চিত্তের কাহিনী। যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে এই ঘটনা যুক্ত বলে আরও বেশি প্রসার লাভ করেছে।

তাউজী জিজ্ঞাসা করলেন: যাজ্ঞবল্ক্য কি বৈশম্পায়নের সমসাময়িক?

গুরুজী বললেন: বৈশম্পায়নের তিনি শিষ্য এবং আমার মনে হয়, গুরুকে অতিক্রম করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। বিশ্বামিত্রের মতো তেজস্বী ঋষি ছিলেন যাজ্ঞবল্ক্য।

তাউজী বললেন: প্রথমে আপনি বৈশম্পায়নের কথা শেষ করুন।

গুরুজী বললেন: দুজনের কথা একই সঙ্গে বলতে হবে। বৈশম্পায়ন যে রাগী প্রকৃতির ছিলেন তার দুটো প্রমাণ আমরা পেয়েছি। তিনি লাথি মেরে তাঁর ভাগিনেয়কে হত্যা করেছিলেন। হত্যা করব বলে নিশ্চয়ই করেন নি, রাগে অন্ধ হয়ে লাথি মারার পর দেখেছিলেন যে সে বেচারা মরে গেছে। তখন তিনি এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য ব্রহ্মবধ্যা যজ্ঞ করতে প্রবৃত্ত হন। তিনি তাঁর শিষ্যদের ডেকে বললেন, তোমরা এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। যাজ্ঞবল্ক্য গুরুকে বললেন, আমি একাই এই ব্রত সম্পন্ন করব, আপনার অন্য কোন শিষ্যের দরকার নেই। এই সঙ্গেই যোগ করলেন, এই কাজে আমি আপনাকে আমার তপস্যার ফল দেখাব।

বৈশম্পায়ন দ্বিতীয়বার রেগে উঠলেন, বললেন, এত গর্ব! এমন অহংকারী শিষ্যের আমার প্রয়োজন নেই। তুমি তোমার অধীত বিদ্যা আমাকে এখনি ফিরিয়ে দাও।

যাজ্ঞবল্ক্য বোধ হয় সত্যিই অহংকারী ছিলেন, কোন আপত্তি না করে সমস্ত যজুর্বেদ রক্তের সঙ্গে বমন করে ফিরিয়ে দিলেন। অন্যান্য শিষ্যেরা নিকটে ছিলেন। তাঁরা তিত্তিরী পক্ষীর রূপ ধারণ করে ভূমিতে পতিত সেই যজুর্বেদ সংগ্রহ করে নিলেন। বেদের যে অংশ এই ভাবে পাওয়া গিয়েছিল, তারই নাম তৈত্তিরীয়।

গুরুজী বললেন ঃ বৈশম্পায়নের কাহিনীর শেষ এইখানেই, আর এখান থেকেই শুরু যাজ্ঞবল্ক্যের গল্প। গুরুর কাছে অধীত বিদ্যার সবটুকু ফিরিয়ে দিয়েও যাজ্ঞবল্ক্য দমলেন না। সূর্যের তপস্যা আরম্ভ করলেন। তাঁর সাধনা সফল হল, সূর্য প্রীত হয়ে বললেন, বর নাও।

অভিমানী যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, আমার গুরু জানেন না, এমন বেদ-বিদ্যা আমাকে বর দিন।

সূর্য বাজী মানে অশ্বের রূপ ধারণ করে বেদবিদ্যা শিক্ষা দিলেন। এই সংহিতার নাম তাই বাজসনেয়ী, আর সূর্যের কাছ থেকে প্রাপ্ত বলে নাম শুক্ল—শুক্ল যজুর্বেদ। সপ্তদশ শাখায় বিভক্ত করে যাজ্ঞবল্ক্য এই বেদ তাঁর সতের জন শিষ্যকে শিক্ষা দেন, কণ্ব তাঁদের অন্যতম।

যাজ্ঞবল্ক্যের জন্ম সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানা নেই, কিন্তু তাঁর তেজস্বিতা সর্বজনবিদিত। মহাভারতে তাঁকে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত হতে দেখি, শতপথ ব্রাহ্মণে দেখি রাজর্ষি জনকের রাজসভায়। সমাজের রীতি নীতি ও ধর্মের ধারণাকে তিনি কঠিন ভাবে সমালোচনা করেছেন, ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতেও দ্বিধা করেন নি। আশ্রমের মধ্যে বানপ্রস্থকে তিনি সম্মান করেছেন, ও যোগাভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করেছেন উচ্চকণ্ঠে। যাজ্ঞবল্ক্যকেই আমরা যোগশাস্ত্রের স্রষ্টা বলে স্বীকার করি। ধর্মশাস্ত্রে তাঁর আরও বড় দান আছে—তিনি সংহিতাকার, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা তাঁর স্মৃতি গ্রন্থের নাম। শতপথ ব্রাহ্মণ ও বৃহদারণ্যক উপনিষৎ তিনিই সংগ্রহ করেছেন। যুগের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্ বলে তিনি সম্মানিত। জনকের রাজসভায় যে তর্কযুদ্ধ হয়েছিল, বৃহদারণ্যকে তা লিপিবদ্ধ আছে।

একটানা অনেকক্ষণ কথা বলবার পরে গুরুজী থামলেন। সেই সুযোগে তাউজী বললেন ঃ সেই তর্কযুদ্ধের কথা কিছু বলবেন না?

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে গুরুজী বললেন: ব্রহ্মবিদ্যা নিয়ে অনেক তর্ক হয়েছিল, সে কালের অনেক মুনি ঋষি এই তর্কে যোগ দিয়ে হেরে গিয়েছিলেন। সে সব কঠিন কথা তোমাদের ভাল লাগবে না। তবে—

গুরুজী থামতেই তাউজী বললেন: বলুন।

গুরুজী বললেন: রাজসভায় সেই তর্কযুদ্ধ কিছু কৌতুকের সৃষ্টি করেছিল সন্দেহ নেই।

অনেকক্ষণ থেকে আমরা কঠিন আলোচনা শুনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, কৌতুকের কথায় এবারে উৎসাহ পেলাম।

গুরুজী বললেন: মিথিলার রাজা জনক বিদ্যায় জ্ঞানে এবং ব্রাহ্মণসুলভ গুণাবলীর জন্য রাজর্ষি নামে অভিহিত ছিলেন। তাঁর সভায় শুধু রাজকার্য নয়, জ্ঞান বিজ্ঞান ও ধর্মালোচনাও হত। এইজন্য তিনি দেশ বিদেশের মুনি ঋষি ও ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করে আনতেন। এমনি একটি সভায় জনক ঘোষণা করলেন যে তিনি এই সভায় ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মিষ্ঠকে সম্মান দিতে চান। বাহিরে এক সহস্র গোধন আছে, তাদের শৃঙ্গ স্বুবর্ণমণ্ডিত। যো বো ব্রহ্মিষ্ঠঃ স এতা গা উদজতাম। সমবেত ব্রাহ্মণের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মতত্ত্ববিদ্ তিনি এই সমস্ত গাভী গ্রহণ করুন।

সভাস্থ সকলে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। একে অপরের দিকে তাকাতে লাগলেন, কিন্তু কেউই কোন উত্তর দিতে সক্ষম হলেন না। ঠিক এই সময়ে আমরা সেই গর্বিত যাজ্ঞবল্ক্যকে দ্বিতীয়বার দেখতে পাই। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে দৃঢ়কণ্ঠে তাঁর শিষ্যকে আদেশ করলেন, সামশ্রব, এই সহস্র গাভী তুমি আমার আশ্রমে নিয়ে যাও।

যাজ্ঞবল্ক্যের কথা শুনে ঋষিরা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। তারপরেই তাঁরা চীৎকার করে উঠলেন, তোমার এত স্পর্ধা, এমন অহংকার! অহংকারে তুমি নিজেকে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মিষ্ঠ বল!

তারপরেই তর্ক শুরু হয়ে গেল।

গুরুজী একটু থেমে বললেনঃ রাজর্ষি জনক ঠিক এইটেই চেয়েছিলেন। গোধন দান একটা উপলক্ষ্য, তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা শোনা। একে একে অনেক ঋষি তর্কে যোগ দিলেন—আর্তভাগ উদ্দালক অশ্বল এবং সকলের শেষে বচক্নু ঋষির ব্রহ্মবাদিনী কন্যা গার্গী।

গার্গীর নাম আমি শুনেছিলাম। এমন বিদুষী নারী ভারতের ইতিহাসে কম আছেন।

গুরুজীও এই কথাই বললেনঃ যে যুগে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল না, সেই যুগে গার্গীর বৈদগ্ধ্য ও বাগ্মিতা দেখে আমরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। আর্তভাগ উদ্দালক ও অশ্বল যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট অতি সহজে পরাস্ত হয়ে গেলেন, আর কোন ঋষি এই তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে সাহসী হলেন না। সভা যখন শান্ত নিস্তব্ধ, তখন উঠে দাঁড়ালেন ব্রহ্মবাদিনী গার্গী।

তাউজীর দিকে তাকিয়ে গুরুজী জিজ্ঞাসা করলেনঃ গার্গীর সম্বন্ধে কিছু জান?

তাউজী উত্তর দিলেনঃ যতটুকু বললেন, ততটুকুই জানি।

গুরুজী সকলের মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন। বোধহয় বুঝতে পারলেন যে এর বেশি কিছু কেউ জানেন না। বললেনঃ গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হলেন। সমানে সমানে তর্ক। গার্গী প্রশ্ন করছেন একটার পর একটা, আর যাজ্ঞবল্ক্য সে সবের উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন। এক সময় গার্গী তাঁর শেষ প্রশ্নে পৌঁছলেন, ব্রহ্মলোক কোথায় ওতপ্রোত?

যাজ্ঞবল্ক্য এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন না, বললেন, সাবধান গার্গী, আর প্রশ্ন নয়। যা প্রশ্নের অতীত, উত্তরেরও অতীত, তুমি সেই প্রশ্ন করে শাস্ত্রনীতি অতিক্রম করেছ। আর অগ্রসর হলে তোমার মাথা খসে পড়বে।

গার্গী বসে পড়লেন। কিন্তু উদ্দালক প্রশ্ন করলেন, কেন?

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, ব্রহ্ম অনতিপ্রশ্ন, প্রশ্নের অতীত, জ্ঞানের অতীত। তাঁকে কোন্ প্রশ্নের সীমার মধ্যে পাবে!

সভাস্থ অনেক ঋষি মনে করেছিলেন যে যাজ্ঞবল্ক্য ভয় দেখিয়ে গার্গীকে থামিয়ে দিলেন। তাই উদ্দালক থামলেন না। বললেন, অহংকারী যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি যদি সূত্রাত্মরূপী অন্তর্যামীকে না জেনেই আজ শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মিষ্ঠের প্রাপ্য এই গো-সহস্র নিয়ে যাও, তাহলে তোমার মাথাও এখুনি খসে পড়বে।

যাজ্ঞবল্ক্য শান্ত স্বরে উত্তর দিলেন, নিজের হৃদয় দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে তুমি অন্তর্যামীকে জান, যিনি নিজে দর্শনীয় নন অথচ সকলের দ্রষ্টা, শ্রবণীয় নন অথচ সকলের শ্রোতা, মননের অতীত অথচ সকলের মননকর্তা, বুদ্ধির অগম্য অথচ বিজ্ঞাতা, যাঁর অতিরিক্ত মন্তা নাই, বিজ্ঞাতা নাই, তিনি তোমার অবিনাশী আত্মা অন্তর্যামী।

তখন গার্গী আবার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এইবারে আমি আপনাকে আর দুটি প্রশ্ন করব।

এই কথা শুনে অনেক ঋষি খুশী হলেন, আর যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, বেশ।

গার্গী প্রশ্ন করলেন, যে সূত্র দ্যুলোক ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী এবং ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান স্বরূপ, সে সূত্র কোথায় ওতপ্রোত ভাবে পরিব্যাপ্ত?

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, সেই বায়ুরূপী সূত্র আকাশে পরিব্যাপ্ত। সূক্ষ্ম আকাশেই তার উৎপত্তি স্থিতি ও লয়।

গার্গী প্রশ্ন করলেন, সেই আকাশ কোথায় পরিব্যাপ্ত?

যাজ্ঞবল্ক্য এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না, বললেন, বিদুষী গার্গী, তুমি আবার সেই ব্রহ্মের সীমা নির্দেশের প্রসঙ্গ তুলছ। আমি তবে সেই নির্গুণ ব্রহ্মের কথা বলছি। যাঁর শাসনে চন্দ্র সূর্য নিয়মিত, স্বর্গ মর্ত্য স্থির নিয়ন্ত্রিত, দিবারাত্র ঋতু সম্বৎসর নিয়মিত,

তাঁরই নাম অক্ষর ব্রহ্ম। ইনি ব্যতীত জগতের অন্য কোন দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বিজ্ঞাতা নাই। তিনি অজর অমর স্থাণু নির্বিকার নিমিত্তাতীত।

গার্গী এইবারে স্বীকার করলেন যে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মিষ্ঠ।

তাউজী বললেন: যাজ্ঞবল্ক্য ও গার্গীর পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে কিছু বলবেন না?

যাজ্ঞবল্ক্যের কথা গুরুজী প্রথমে বললেন: যাজ্ঞবল্ক্যের জন্ম-বৃত্তান্ত আমাদের জানা নেই। কিন্তু তাঁর পারিবারিক জীবনের পরিচয় পাই বৃহদারণ্যক উপনিষদে। মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী তাঁর দুই স্ত্রী। ক্যাত্যায়নী তাঁর গৃহিণী ছিলেন, গৃহকর্ম ও স্বামিসেবায় ব্যস্ত থাকতেন। কিন্তু মৈত্রেয়ী তাঁর সহধর্মিণী। সংসারের কাজের ফাঁকে ফাঁকে ব্রহ্মবিদ্যারও অনুশীলন করেছিলেন।

বৃদ্ধ বয়সে যাজ্ঞবল্ক্য সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণে ইচ্ছুক হলেন। তিনি তাঁর দুই স্ত্রীকে ডেকে বললেন, আমার ধনসম্পদ তোমাদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে আমি বনে যেতে চাই, তোমরা আমাকে প্রসন্ন মনে অনুমতি দাও। কাত্যায়নী তাঁকে বাধা দিলেন না, কিন্তু প্রতিবাদ করলেন মৈত্রেয়ী। বললেন, জগতের সমস্ত ধনরত্ন পেলে কি আমি অমৃতত্ব লাভে সমর্থ হব—কথং তেনামৃতা স্যাম?

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, ধনদৌলতে অমৃতত্বলাভ হয় না। ধন পেয়ে তোমার জীবন হবে ধনীর মতন। পার্থিব ভোগে সুখ আছে, কিন্তু সেই সুখে গা ভাসিয়ে দিলে অমৃতের আস্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা আর থাকে না। ভোগে যে সুখ, মরণে তার শেষ পরিণতি। অমৃতের লোভ থাকলে ভোগের বাসনা মানুষকে ত্যাগ করতে হবে।

মৈত্রেয়ীর সত্যদর্শন হল। চিত্তে যদি অমৃতের কোন স্বাদ না থাকে, তবে কী হবে বিত্ত দিয়ে! বিত্তের মোহে সংসারে জড়িয়ে থেকে তাঁর কী লাভ হবে! পার্থিব সুখ আর মৃত্যুর প্রতীক্ষা!

জীবনে বিত্তের মোহ না ঘুচলে তো পরম সত্যের উপলব্ধি হবে না! মৈত্রেয়ী তাঁর কর্তব্য স্থির করতে বিলম্ব করলেন না। স্বামীকে বললেন, তোমার ধনরত্ন আমি চাই নে। যাতে অমৃত পাব না, তা নিয়ে আমি কী করব—যেনাহং নামৃতা স্যাং, কিমহং তেন কুর্যাম্! তার চেয়ে আপনি আমাকে অমৃতের সন্ধান দিন।

স্ত্রীর এই অনুরোধ শুনে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর সংকল্প ভুলে গেলেন। সংসার ত্যাগের বাসনা দূর হল, তিনি তাঁর ব্রহ্মবাদিনী স্ত্রীকে অমৃত ও অমরত্বের কথা শোনালেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদ রচিত হল।

চেনেলু আমার পাশে বসে ছিল। অত্যন্ত নম্র স্বরে আমাকে জিজ্ঞাসা করল: গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী নন?

উত্তরে আমি মাথা নেড়ে না বললাম।

চেনেলু বলল: আমি শুনেছিলাম গার্গীও যাজ্ঞবল্ক্যকে বিয়ে করেছিলেন।

আমি এ কথা শুনি নি।

গুরুজী বললেন: গার্গীর সম্বন্ধে আমরা কোন কথাই জানি নে। তিনি বচক্নু ঋষির কন্যা বলে তাঁর অন্য নাম বাচক্নবী। ব্রহ্মবাদিনী। যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে তাঁর তর্কে অসাধারণ প্রজ্ঞা ও বাগ্মিতা প্রকাশ পেয়েছে। আর বেদে তাঁর রচিত অনেক সূক্ত ও মন্ত্র পড়ে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। এর বেশি আর কিছু আমার জানা নেই।

গুরুজী উঠে দাঁড়ালেন। আমরাও উঠলাম।

রাতে বিছানায় শুয়ে আমি গার্গীর কথা ভাবছিলাম। গার্গী ঋষিকন্যা ছিলেন, কিন্তু তাঁর বিবাহের কথা আমরা জানি না। চেনেলু যা বলল, তা হয়তো সত্য নয়। তবে আমার মনে হল, এই রকমের একটা গল্প যেন আমিও কোথাও পড়েছি। যাজ্ঞবল্ক্যের পাণ্ডিত্য দেখে গার্গী মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর অনুরাগ জন্মেছিল মহর্ষির

প্রতি। যাজ্ঞবল্ক্যও এই ব্রহ্মবাদিনী ঋষিকন্যাকে অবহেলা করতে পারেন নি।

গার্গীর এই অনুরাগের কথা বুঝতে পেরে বচক্নু ঋষির শিষ্যরা গিয়েছিল যাজ্ঞবল্ক্যের কাছে, সবিনয়ে সব নিবেদন করেছিল। যাজ্ঞবল্ক্য প্রথমে আপত্তি করেছিলেন, তারপর বলেছিলেন তাঁর পত্নীদের অনুমতি নিতে। মৈত্রেয়ী কাত্যায়নীর কাছে তাদের পাঠিয়েছিলেন। আর কাত্যায়নী সম্মতি দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, আমি তো গৃহিণী, স্বামীর সহধর্মিণী হবার যোগ্যতা আমার নেই। গার্গী তাঁর উপযুক্ত সহধর্মিণী হবে।

মৈত্রেয়ী কী বলেছিলেন, আমার মনে পড়ছে না। তারপর কী হয়েছিল, তাও ভুলে গেছি। হয়তো এই কাহিনী একেবারেই কাল্পনিক। বাঙলা বইএ সত্যনিষ্ঠা সব সময় দেখি না। গুরুজীই ঠিক বলেছেন, গার্গীর সম্বন্ধে আর বেশি কিছু জানা যায় না।

ষোল

পরদিন অপরাহ্ণে আমি গঙ্গার ধারে একখানা পাথরের উপর এসে বসলাম। উন্মুক্ত আকাশের নিচে একটা মুক্তির আনন্দ বোধ করি। কলস্বনা গঙ্গার স্রোতেও এই আনন্দের প্রতিধ্বনি। পাহাড়ের জটিল বন্ধন থেকে নদী মুক্তিলাভ করেছে। কঠোর তপস্যা করে ভগীরথ পৃথিবীতে গঙ্গা এনেছিলেন। মহাদেব এই গঙ্গাকে ধারণ করে তাঁর জটার মধ্যে আবদ্ধ করেছিলেন। তারপর তাঁকে মুক্তি দিয়েছেন এইখানে। গঙ্গার ধারে এসে বসলে মুক্তির আনন্দে মন আমার ভরে যায়।

এক সময় চেনেলু নিঃশব্দে এসে আমার পাশে বসল। আমি কোন কথা বললাম না, সেও অনেকক্ষণ নীরবে বসে রইল। তারপর প্রশ্ন করল ঃ অমন মনোযোগ দিয়ে কী ভাবছ ?

বললাম ঃ কিছু ভাবব না বলেই এখানে এসে বসেছি।

চেনেলু বলল ঃ কিন্তু বন্ধু, তোমার মুখ দেখে যে অন্য কথা মনে হচ্ছে।

কী কথা ?

ভাবনার ভারে তুমি কাতর হয়ে পড়েছ।

বললাম ঃ ভুল কথা। মুক্তির আনন্দের আস্বাদ নিতে আমি বেরিয়েছিলাম। সামনের নদী আর পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে সেই কথাই ভাবছিলাম।

চেনেলু বলল ঃ আর কিছু ?

স্মরণ করে সে কথাও বললাম ঃ ভগীরথের তপস্যার কথা মনে এসেছিল, আর মহাদেবের জটায় গঙ্গার আবদ্ধ হবার কথা।

চেনেলু হেসে উঠল, বলল: এই কথাই আমি সন্দেহ করেছিলাম। তোমার আর মুক্তি নেই। পুরাণের জটায় তুমিও বন্দী হয়ে গেছ।

হয়তো তাই। আমি এ কথার প্রতিবাদ করলাম না।

চেনেলু এবারে অন্য প্রসঙ্গে এল। বলল: মিসেস খুরানার সঙ্গে তোমার কী কথা হয়?

গম্ভীর ভাবে বললাম: অনেক গোপন কথা।

সে গুড়ে বালি।

কেন?

মিসেস খুরানা বোকা নন, এখানে কারও সঙ্গে গোপন কথা বলবেন না। কার কুষ্ঠি কাটেন তাই জানতে চাইছি।

হেসে জিজ্ঞাসা করলাম: চালাক লোকে বুঝি পরের কুষ্ঠি কাটে?

চেনেলু এবারে ধমক দিল, বলল: কথা ঘোরাচ্ছ কেন? বল না, অমন চুপি চুপি তার সঙ্গে কী কথা হয়!

আমি তটস্থ হবার ভান করে বললাম: তোমার কথা। সুপ্তির সঙ্গে তোমার ঝগড়া হয়েছে কিনা, মিসেস খুরানা তাই জানতে চান।

এক গাল হেসে চেনেলু বলল: তুমি কী বললে?

আমি সত্যি কথাই বললাম, ও সবে আমাদের নাক গলানো উচিত নয়।

চেনেলু এবারে আরও জোরে হেসে উঠল।

আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে কোন কারণে তার মেজাজ আজ অনেক দিন পরে প্রসন্ন হয়েছে। কিন্তু সে কথা জিজ্ঞাসা করবার আগেই সে প্রশ্ন করল: আজকাল শকুন্তলাদির সঙ্গে তোমার বেশ ভাব হয়েছে দেখছি।

সংক্ষেপে বললাম: হ্যাঁ।

চেনেলু বলল : কী বলেন তিনি ?

তিনি যা বলেন, তা তোমার ভাল লাগবে না।

অমন দাম বাড়াচ্ছ কেন, বলই না শুনি।

বললাম : লেখার সম্বন্ধে তিনি নানা উপদেশ দেন।

চেনেলু বিরক্ত ভাবে বলল : তাঁর কিছু বলার থাকলে তিনি নিজে লিখলেই পারেন।

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম : তোমার মতটা আমি শকুন্তলাদিকে জানাব।

চেনেলু ক্ষেপে উঠল, বলল : এ কী অসভ্যতা !

আমি আশ্চর্য হবার ভান করে বললাম : কেন ?

চেনেলু বলল : আমি গোপনে তোমাকে একটা কথা বলছি, আর তুমি সেটা তাঁকে বলে দেবে !

তবে তোমার মন্তব্য শুনে আমি কী করব !

তুমি নিজেই তাঁকে বলবে যে অন্যকে পরামর্শ না দিয়ে আপনি নিজে লিখুন।

আমার কাছে তাঁর পরামর্শ যদি মূল্যবান হয় !

তবে আর কী, তাঁকে মাথায় তুলে নাচ।

কয়েক দিনেই চেনেলুর স্বভাব আমি বুঝতে পেরেছি। অল্পেই সে খুশী হয়, আবার অল্পেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তাকে সহজ হবার সুযোগ দেবার জন্যে বললাম : আজ মিসেস খুরানা আর শকুন্তলাদির জন্যে এমন ব্যস্ত হয়েছ কেন ! ওঁরা ছাড়া আশ্রমে কি আর মানুষ নেই !

চেনেলু বলল : তোমার সঙ্গে ভারি ভাব দেখছি কিনা, তাই জিজ্ঞেস করছি।

হেসে বললাম : ভাব তো আমার সুপ্তির সঙ্গেও, তার কথা কিছু জানতে চাইলে না ?

আমার দৃষ্টিতে কৌতুক দেখে চেনেলু এবারে হেসে ফেলল,

বলল: শুনেছ তো, সুপ্তি এখন আর ঐ বর্গিটার কাছে সংস্কৃত পড়তে যায় না।

চেনেলু এখনও পাধ্যেকে বর্গি বলে। তার মতে মহারাষ্ট্রের লোক হলেই সে বর্গি। বর্গির ভয় তো বাংলা দেশে ছিল, চেনেলুর দেশ অন্ধ্রে ছিল কিনা জানি না। তবে এতক্ষণে আমি তার প্রসন্নতার কারণ বুঝলাম। হেসে বললাম: সেই জন্যেই বুঝি এত আনন্দ!

চেনেলু আর রাগ করল না। একটা নুড়ি কুড়িয়ে গঙ্গার জলে ছুঁড়ে ফেলল।

সতেরো

সন্ধ্যা বেলায় উপাসনার মন্দিরে আমরা সমবেত হলাম। গুরুজী আজ কোন্ ঋষির কথা বলবেন জানি না। হিসাব করে দেখেছি যে সপ্তর্ষির কথা শেষ হয়ে গেছে। বশিষ্ঠ সপ্তর্ষির শেষ ঋষি। তাঁর পরে আর কোন নাম আমার মনে পড়ল না।

গুরুজী তাঁর আসন গ্রহণ করে এই প্রশ্নই করলেন: আজ কার কথা বলতে হবে?

তাউজী বললেন: দশজন প্রজাপতি ঋষির সাতজনের কথা শেষ হয়েছে। বাকি আছেন তিন জন। প্রচেতা ভৃগু ও নারদ।

তাউজীর কথা শুনেই আমার মনে পড়ল যে গুরুজী আমাদের আহ্নিক তত্ত্বের একটি শ্লোক শুনিয়েছিলেন। তাতেই আছে দশজন ঋষির নাম। আমি সে কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম।

গুরুজী বললেন: আজ তাহলে প্রচেতার কথা।

প্রচেতা নামে কোন ঋষির কথা আমি আগে কখনও শুনি নি। নামটি আমার কাছে একেবারে নূতন মনে হল। অনেকের কাছেই হয়তো নূতন। কিন্তু আমরা কেউই সাধারণত কথা বলি না। কথা বলেন শুধু তাউজী। তাও গুরুজী কোন প্রশ্ন করলে তারই উত্তর দেন। তাউজী বললেন: ঋষি হিসাবে প্রচেতার নাম খুব পরিচিত নয় বলে মনে হয়।

গুরুজী বললেন: ঠিক কথা। প্রচেতাকে আমরা ঠিক ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে পাই নে।

কেন?

কোথাও প্রচেতাকে দক্ষ নামে দেখি, কোথাও দেখি স্বতন্ত্র ঋষি রূপে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে দেখি প্রচেতা ব্রহ্মার মানস পুত্র, অন্যান্য

ঋষিদের সঙ্গে তাঁর দেহ থেকে উৎপন্ন হন। বিষ্ণুপুরাণে অন্য কাহিনী দেখি। পৃথুর প্রপৌত্র ও প্রাচীনবর্হির দশজন পুত্রের নাম প্রচেতা। তাঁরা দশ হাজার বৎসর সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত থেকে বিষ্ণুর কঠোর তপস্যা করে প্রজা সৃষ্টির বর লাভ করেন। কণ্ডুকন্যা মারিষাকে তাঁরা বিবাহ করেন। দক্ষ তাঁদের পুত্র।

ঋগ্বেদেও আমরা প্রচেতার নাম পাই। তিনিও একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি যে মন্ত্রগুলি রচনা করেছেন তা দুঃস্বপ্ন বা অমঙ্গল বিনাশের জন্য। তে অস্মূর্য প্রচেতসো বৃহস্পতে।

গুরুজী বললেন ঃ বিষ্ণুপুরাণের মত মেনে নিলে দেখি যে দক্ষ প্রজাপতি প্রচেতার পুত্র। মহাভারত ও হরিবংশেও একই কথা। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে দেখি যে দক্ষ ব্রহ্মার মানস পুত্র, তাঁর অঙ্গুষ্ঠ থেকে জন্ম হয়েছে বলে নাম দক্ষ। গরুড় পুরাণেও এই মত সমর্থিত হয়েছে। ব্রহ্মা তাঁর দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ থেকে দক্ষকে ও বাম অঙ্গুষ্ঠ থেকে দক্ষের স্ত্রীকে সৃষ্টি করেন। বিভিন্ন পুরাণে এই অসঙ্গতি লক্ষ্য করে অনেকে বলেন যে যিনি প্রচেতা তিনিই দক্ষ, দক্ষ প্রচেতারই নাম। ব্রহ্মার অন্যান্য মানস পুত্রের ন্যায় তিনিও প্রজা সৃষ্টির কাজে ব্রহ্মাকে সাহায্য করেছিলেন।

তাউজী বললেন ঃ প্রজা ও প্রজাপতি শব্দ সৃষ্টির কথায় বারে বারে ব্যবহৃত হয়েছে। এ সম্বন্ধে আপনি কিছু বলুন।

গুরুজী বললেন ঃ প্রজায়তে ইতি, এক কথায় প্রজা মানে হল সন্তান সন্ততি। আর প্রজানাং পতিঃ, যাঁরাই প্রজা সৃষ্টি করেছেন তাঁরাই প্রজাপতি। মনুসংহিতায় ব্রহ্মার উপাধি প্রজাপতি, তারপরে তাঁর দশ মানসপুত্র প্রজাপতি ঋষি নামে অভিহিত হয়েছেন। মনু নিজেই প্রজাপতি। মহাভারতে একুশজন প্রজাপতির উল্লেখ পাওয়া যায়। আর বেদে হিরণ্যগর্ভ সোম সাবিত্রী ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাকেও প্রজাপতি বলা হয়েছে। আশ্চর্যের কথা এই যে বেদে দক্ষ প্রজাপতিও দেবতার মতো স্তুত

হয়েছেন। সুজ্যোতিষঃ সূর্য দক্ষপিতৃননাগাস্তে সুমহো ব্রীহি দেবান্। হে জ্যোতিষ্মান্ সূর্য, দক্ষ যাঁদের পিতৃপুরুষ সেই জ্যোতিষ্ক দেবগণের নিকট আমাদের অনপরাধ প্রার্থনা ক'রো।

দক্ষের জীবন যাত্রা নিয়ে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। গরুড় পুরাণে দেখি যে ব্রহ্মা যেমন তাঁর দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ থেকে দক্ষকে সৃষ্টি করেন, তেমনি করে দক্ষের পত্নীকে সৃষ্টি করেন তাঁর বামাঙ্গুষ্ঠ থেকে। এই পুরাণেই আবার অন্যত্র দেখি যে দক্ষ বীরণ প্রজাপতির কন্যা অসিক্লীকে বিবাহ করেন। তাঁর ষাটটি কন্যা জন্মেছিল। তিনি তাদের দুটিকে অঙ্গিরার হাতে, দুটি কৃশাশ্বকে, দশটি ধর্মকে, তেরোটি কশ্যপকে আর সাতাশটি চন্দ্রকে সম্প্রদান করেন।

অন্যান্য পুরাণেও দক্ষের কাহিনী আছে। একটির সঙ্গে অপরটির অমিল আছে—পত্নীর নামের অমিল, পুত্র কন্যার হিসাবের গরমিল। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে দক্ষ মনুর কন্যা প্রসূতিকে বিবাহ করেছিলেন। আর তাঁর কন্যা জন্মেছিল ষোলটি। তার মধ্যে তেরটি ধর্মকে, একটি অগ্নিকে ও একটি পিতৃগণকে প্রদান করেন। ষোড়শ কন্যা সতীকে বিবাহ করেন মহাদেব।

তাউজী বললেন: কশ্যপ ও চন্দ্রকে যে তিনি কন্যা সম্প্রদান করেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই।

গুরুজী জিজ্ঞাসা করলেন: কেন?

তাউজী বললেন: দিতি অদিতি বিনতা কদ্রু প্রভৃতি তেরটি কন্যা তিনি কশ্যপকে দিয়েছিলেন, আর কৃত্তিকা ভরণী রোহিণী প্রভৃতি সাতাশটি কন্যা তিনি চন্দ্রকে সম্প্রদান করেছিলেন। তাদের নিয়ে পুরাণে কাহিনী আছে।

গুরুজী হেসে বললেন: বেশি কন্যা থাকলে যা হয়, তার হিসাব পুরাণকার গুলিয়ে ফেলেছেন।

তাউজী বললেন: যাক সে কথা। আপনি দক্ষের কথা বলুন।

গুরুজী বললেন: দক্ষ প্রজাপতিকে আমার অহংকারী ঋষি বলে মনে হয়েছে। এই অহংকারের জন্যই তাঁর পতন হয়েছিল।

গুরুজী একটু ভেবে বললেন: প্রথম জীবনে তাঁর এই দুর্বলতা আমরা দেখতে পাই নে। তখন তিনি মহামায়াকে কন্যারূপে পাবার জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন। তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে মহামায়া বলেছিলেন, বর নাও। দক্ষ চেয়েছিলেন, তুমি আমার কন্যা হয়ে জন্ম নাও, আর বিবাহ কর শিবকে।

দেবতার কথা বলবার সময় গুরুজী আমাদের এই কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন যে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু বিবাহিত দেবতা, শিব অবিবাহিত। মহাযোগী তিনি, কঠোর তপস্যায় কালাতিপাত করেন। তাইতেই দক্ষ দেবাদিদেব মহাদেবকে জামাতা করতে চেয়েছিলেন। আর মহামায়া বলেছিলেন, তথাস্তু। তবে একটি শর্ত আছে। আদরের অভাব ঘটলেই আমি দেহত্যাগ করব।

গুরুজী বললেন: মহামায়া সতী নামে দক্ষের কন্যা হয়ে জন্মালেন। শিবের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হল। কিন্তু তার পরেই দক্ষ যেন বদলে গেলেন। ভাবলেন, দেবতাদের চেয়ে তিনিই বা কম কিসে! এই মনোভাব তাঁর স্পষ্ট হয়ে উঠল বিশ্বস্রষ্টাদের যজ্ঞে। দেবতা ও ঋষিরা সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। এমন সময় দক্ষ এসে যজ্ঞে উপস্থিত হলেন। সবাই উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করলেন, কিন্তু ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর বসে রইলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণুর কথা আলাদা, কিন্তু শিব তো তাঁর জামাতা! শিবের উচিত ছিল তাঁকে সম্মান করা! অহংকারী দক্ষ এই কথা ভেবে শিবকে যা-তা বলে গালাগালি দিলেন। ব্রহ্মার কথায় একটা শ্মশানচারী পাগলের হাতে কন্যা দান করে তিনি নাকি নিতান্ত ভুল করেছেন। শিব এ সব কথার কোন উত্তর দিলেন না দেখে তিনি আরও রেগে গেলেন। অভিশাপ দিলেন যে দেবতাদের সঙ্গে শিব তাঁর যজ্ঞের ভাগ গ্রহণ করতে পারবেন না। শিবের

অনুচর নন্দী এই অপমান সহ্য করলেন না, দক্ষকে বললেন, যে মুখে তুমি আমার প্রভুকে শাপ দিলে সে মুখ তোমার ছাগলের মুখ হবে।

গুরুজী বললেন ঃ দক্ষযজ্ঞের কথা আমি আগেই বলেছি।

সে কথা আমার মনে আছে। দক্ষের শাপে শিব যজ্ঞের ভাগী হবেন না। তাই শিবকে বাদ দিয়ে কারও যজ্ঞ করার সাহস নেই। শিবহীন যজ্ঞ কে করবে! শেষ পর্যন্ত যজ্ঞ করাই বন্ধ হয়ে গেল। দক্ষ বললেন, বটে! আমি যজ্ঞ করব, ডাকো ত্রিভুবনকে।

প্রথম শিবহীন যজ্ঞের আয়োজন হল দক্ষালয়ে, হরিদ্বারের কনখলে।

গুরুজী থামেন নি, বললেন ঃ বৃহস্পতি যজ্ঞ। আটাশি হাজার ঋত্বিক এলেন, উদ্গাতা এলেন চৌষট্টি হাজার, দেবর্ষি নারদ প্রভৃতি ঋষিরা হলেন অধ্বর্যু ও হোতা। সকল দেবতার সঙ্গে বিষ্ণু এই যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা হলেন, ব্রহ্মা হলেন দেববিধি প্রদর্শক। নারদ তাঁর যজ্ঞের কাজ আরম্ভ করার আগে সতীকে এই সংবাদ দিয়ে এলেন—তাঁদের স্বামী স্ত্রীর নিমন্ত্রণ হয় নি, হবেও না।

পুরাণান্তরে পড়েছি যে ব্রহ্মা দক্ষকে সকল প্রজাপতির উপর আধিপত্য দিয়েছিলেন। এই ক্ষমতা লাভ করেই দক্ষের অহংকার আরও বৃদ্ধি পায়, এবং তারই ফলে দক্ষ বৃহস্পতি যজ্ঞের আয়োজন করেন।

বাপের বাড়িতে যজ্ঞ দেখতে যাবার জন্য সতীর প্রাণ উতলা হল। তিনি স্বামীর অনুমতি চাইলেন। সাদাসিধে সরল মানুষ শিবেরও আত্মসম্মান জ্ঞান আছে। তিনি বললেন, ত্রিভুবন যেখানে নিমন্ত্রিত সেখানে বিনা নিমন্ত্রণে যাওয়া যায় না।

তারপর সতী দশমহাবিদ্যার রূপ ধারণ করে শিবকে বিভ্রান্ত করে তাঁর মত আদায় করলেন। এই ঘটনাই দক্ষের কাল হল। সতী দক্ষালয়ে আসতেই দক্ষ তাঁকে দেখে জ্বলে উঠলেন। নিজের

কন্যা, কঠোর তপস্যা করে তিনি তাঁকে লাভ করেছেন, মহাদেবের সঙ্গে বিবাহ দিতে চেয়েছিলেন নিজেই। কিন্তু রাগে সে সব কথা তিনি ভুলে গেলেন। জামাতা তাঁকে বিশ্বস্রজের সত্রে সম্মান করেন নি, এই অপমানের জ্বালা তাঁর অন্তরে জ্বলছে। তাই যা মুখে এল তাই বলে তিনি সতীকে অপমান করলেন ও গালাগালি দিলেন শিবকে। সতী এসেছিলেন বাপের বাড়ির টানে, বাপের কাছে এ রকম অভ্যর্থনা পাবেন এমন আশঙ্কা স্বপ্নেও করেন নি। স্বামীর নিন্দাও তিনি সইতে পারলেন না, দেহত্যাগ করলেন।

নারদ আবার ছুটলেন কৈলাসে। শিবকে গিয়ে বললেন, সর্বনাশ হয়েছে, দক্ষের কথায় সতী দেহত্যাগ করেছেন।

ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন শিব, মাথার একটা জটা ছিঁড়ে মাটিতে ফেললেন, সেই জটা থেকে বীরভদ্রের জন্ম হল। বীরভদ্র ছুটল দক্ষালয়ে। সেখানে পৌঁছেই সে ভৃগুর দাড়ি ওপড়াল, পুষার দাঁত ভাঙল, আর দক্ষের মুণ্ড কেটে পুড়িয়ে ফেলল। যজ্ঞস্থল লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল।

পরে শিব অনুতপ্ত হয়ে ক্ষতি পূরণ করে দিয়েছিলেন। ছাগমুণ্ড দিয়ে দক্ষের জীবন ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রভুভক্ত নন্দীর শাপ সফল হল।

গুরুজী বললেন: দক্ষ প্রজাপতির আর একটি কাহিনী আমাদের জানা আছে। সেও তাঁর রাগের গল্প। নিজের জামাতা চন্দ্রকে যক্ষ্মাগ্রস্ত হবার শাপ দিয়েছিলেন। শিবকে অভিশাপ দেবার সাহস তাঁর হয় নি, বোধহয় ক্ষমতার প্রশ্ন ছিল। কিন্তু চন্দ্রকে শাপ দিতে দ্বিধা করেন নি। সে গল্প আমি তোমাদের দেবতার কথায় বলেছি।

সে গল্পও আমার মনে ছিল। দক্ষ প্রজাপতির সাতাশটি কন্যাকে চন্দ্র বিবাহ করেছিলেন। তাঁদের নাম কৃত্তিকা ভরণী আর্দ্রা মঘা অশ্লেষা রোহিণী ইত্যাদি। পত্নীদের মধ্যে রোহিণী চন্দ্রের বেশি

প্রিয় ছিলেন। এই দেখে অন্যান্য কন্যারা দক্ষের নিকট অভিযোগ করেন। দক্ষ চন্দ্রকে স্বামীর কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করে দিলেন, সতর্ক করলেন, ভয় দেখালেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না দেখে শাপ দিলেন যে চন্দ্র অপুত্রক থাকবে এবং ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হবে। কিন্তু কন্যারা কি পিতার কাছে এই চেয়েছিলেন! শাপের কথা শুনে তাঁরা ভয়ে অস্থির হলেন, ক্রুদ্ধ পিতাকে বললেন শাপ ফিরিয়ে নিতে। কিন্তু কন্যাদের কান্নায় দক্ষের মন নরম হল না। জামাতা তাঁর আদেশ পালন করেন নি, তাঁকে শাস্তি পেতেই হবে। কন্যাদের কল্যাণ নয়, তাঁর নিজের অহংকারই তাঁর কাছে বড় হয়ে উঠেছিল।

এদিকে চন্দ্র দিনে দিনে ক্ষয় হতে লাগলেন। সাতাশটি কন্যার অনেক চেষ্টা অনেক পরিশ্রম সবই ব্যর্থ হল। শেষ পর্যন্ত দেবতারাও ভয় পেলেন। তাঁরাও গিয়ে দক্ষকে ধরলেন, শাপ প্রত্যাহার করতে হবে। দক্ষ এবারে আত্মপ্রসাদ লাভ করে বললেন, ঠিক আছে, চন্দ্র যদি সব স্ত্রীকে সমান চোখে দেখতে পারে, তবে সরস্বতী যেখানে সমুদ্রে মিলেছে সেই প্রভাস তীর্থে স্নান করে মহাদেবকে তুষ্ট করুক। ক্ষয় তাকে হতেই হবে, তবে সে মাসের এক পক্ষ, দ্বিতীয় পক্ষে সে দিনে দিনে বেড়ে সম্পূর্ণ হবে। কিন্তু সাবধান, আর কখনও যেন সে ব্রাহ্মণ ও নারীকে হেয়জ্ঞান না করে।

গুরুজী থামতেই তাউজী বলে উঠলেন: একটা কথায় শুধু গোলমাল বেধেছে।

কোন্ কথায়?

আপনি বলেছিলেন, চন্দ্রের উপরে হুকুম হয়েছিল যে প্রভাস তীর্থে স্নান করে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করতে হবে। অথচ এই মহাদেবের সঙ্গেই দক্ষের প্রবল বিরোধ ছিল।

গুরুজী বললেন: ভাল প্রশ্ন করেছ। কিন্তু উত্তর বোধহয়

তোমার মনের মতো হবে না। কেননা পুরাণে এ কথার কোন উত্তর নেই।

তবু আমরা সেই উত্তর শোনবার জন্য কৌতূহলী হলাম।

গুরুজী বললেন : প্রথম জীবনে দক্ষ মহামায়াকে কন্যারূপে পাবার জন্য তপস্যা করেছিলেন। তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহামায়া যখন সামনে এলেন, তখন আরও একটি অনুরোধ করলেন। মহাদেবের সঙ্গে তিনি তাঁর বিবাহ দেবেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু বিবাহিত সন্দেহ নেই ; কিন্তু চন্দ্রকে যখন সাতাশটি কন্যা দিতে দক্ষের আপত্তি হল না, তখন ব্রহ্মা বিষ্ণুকেও তিনি কন্যাটিকে দিতে পারতেন। কিংবা অন্য কোন দেবতাকে। তা না করে মহাদেবকে পছন্দ করার এই কারণ হতে পারে যে তিনি তাঁকেই সে সময় দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করতেন।

তাউজী বললেন : এতে আমাদের সংশয় নেই। মহাদেবের সঙ্গে তাঁর বিরোধ হয়েছিল বিবাহের পরের এক ঘটনায়, সে কথা আপনি বলেছেন।

গুরুজী বললেন : তাহলে মনে করতে পার যে চন্দ্রের সঙ্গে এই বিরোধ হয়েছিল মহাদেবের সঙ্গে বিরোধ হবার আগে।

তাউজী বললেন : অসম্ভব নয়। অন্তত দক্ষযজ্ঞের পরে ছাগ-মুণ্ড নিয়ে আর এক জামাতাকে শাপ দেওয়া নির্লজ্জের কাজ হত।

আমি সুপ্তির দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে সে হাসছে। অন্য সকলেও তাউজীর কথায় কৌতুক বোধ করেছেন।

গুরুজীও সহাস্যে বললেন : আবার এও হতে পারে যে চন্দ্রকে দক্ষ শাপ দিয়েছিলেন অভ্যাসের দোষে। ছাগমুণ্ডের কথা তখন তাঁর মনে ছিল না।

তাহলেই সেই প্রশ্ন আসে—মহাদেবের তপস্যা কেন!

গুরুজী বললেন : আমি তার উত্তর দিতে চেয়েছিলাম। যজ্ঞ-

ক্ষেত্রে দক্ষের মুণ্ড কেটে দগ্ধ করেছিল বীরভদ্র, মহাদেব তাঁর জীবন দানের ব্যবস্থা করেছিলেন। নারদের মুখে সতীর দেহত্যাগের সংবাদ পেয়ে মহাদেব ক্রোধে উন্মত্ত হয়েছিলেন, এবং তাঁর ছিন্ন জটা থেকে বীরভদ্রের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু দক্ষ এই সব দেখতে পান নি। জীবন লাভের পর দক্ষ তাঁর জামাতাকে শোকে উন্মত্ত দেখেছিলেন, সতীর দেহ কাঁধে নিয়ে তিনি পৃথিবী পরিক্রমা করতে বেরিয়েছিলেন। তারপর শোকের উপশম হলে কঠোর তপস্যায় পুনরায় নিমগ্ন হলেন। এই যোগী তপস্বীকেই তিনি শ্রেষ্ঠ দেবতা বলে মনে করতেন।

গুরুজী একটু থেমে বললেন ঃ দক্ষ যদি এর আগের কথা স্মরণ করে থাকেন, তাহলেও দেখেছিলেন যে মহাদেব কত মহান্। বিশ্বস্রজের যজ্ঞে তিনি যখন উপস্থিত হলেন তখন দেবতা ও ঋষিরা উঠে দাঁড়িয়েছিলেন সত্য, কিন্তু ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহাদেব উঠে দাঁড়ান নি! ব্রহ্মা বিষ্ণুকে তিনি শাপ দেন নি, দিয়েছিলেন মহাদেবকে। মহাদেব নীরবে এই শাপ মেনে নিয়েছিলেন। শাপের উত্তর দেন নি প্রতিশাপ দিয়ে। কিন্তু মহাদেবের অনুচর নন্দী এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিলেন, বলেছিলেন দক্ষের ঐ মুখ ছাগমুণ্ডে পরিণত হবে। দক্ষ যদি সুস্থ মাথায় এই সব চিন্তা করে থাকেন, তবে মহাদেবকে আরও বেশি শ্রদ্ধা করবেন। এক জামাতাকে অন্য জামাতার আদর্শ নিতে বলবেন, তাতে সন্দেহ নেই।

দেবতার কথায় চন্দ্রের শাপের কথা আমরা শুনেছি। যে রোহিণীর প্রতি পক্ষপাতের জন্য চন্দ্র অভিশপ্ত হয়েছিলেন, তাঁকে নিয়েই চন্দ্র প্রভাসে নেমেছিলেন। সরস্বতী নদীর জলে স্নান করে তপস্যা করেছিলেন বার হাজার বছর। মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বাড়বার ক্ষমতা দিলেন, আর প্রভা দিলেন। চন্দ্র শাপমুক্ত হলেন, আর প্রভাস হল তীর্থে পরিণত।

দক্ষ প্রজাপতির আর কোন গল্প গুরুজী বললেন না।

আঠারো

দক্ষ প্রজাপতির পুত্র কন্যার গল্প গুরুজী খুব সংক্ষেপে বললেন।

হরিবংশের মতে দক্ষ বীরণ প্রজাপতির কন্যা অসিক্লীকে বিবাহ করেন। তাঁদের পাঁচ হাজার পুত্র জন্মে। এই পুত্ররাও প্রজা সৃষ্টির জন্য ব্যগ্র হয়েছিলেন। কিন্তু নারদের পরামর্শে তাঁরা নিরুদ্দিষ্ট হন। সংসার ধর্মে মন না দিয়ে তাঁরা পৃথিবী পর্যটন করতে লাগলেন।

গুরুজী বললেন ঃ সকল পুরাণে পুত্রদের সংবাদ নেই, কিন্তু তাঁর কন্যাদের নাম প্রায় সর্বত্রই আছে। তাঁর কন্যা অদিতির নাম বেদেও আছে। কশ্যপের সঙ্গে যে তেরটি কন্যার বিবাহ হয়েছিল, তাঁদের কথা আমি আগেই বলেছি। চন্দ্রের সঙ্গে যে সাতাশটি কন্যার বিবাহ হয়েছিল, তাদের কথাও বলেছি। সতীর কথা দেবতার কথায় শুনেছ।

তাউজী বললেন ঃ স্বাহাও তো দক্ষের কন্যা বলে শুনেছি।

গুরুজী বললেন ঃ ঠিকই শুনেছ। শ্রীমদ্ভাগবত মতে ইনি দক্ষের কন্যা। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের মতে ইনি প্রকৃতি দেবী, দেবতাদের প্রার্থনায় ইনি অগ্নির পত্নী হয়েছিলেন। আবার দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীতে দেখি যে ভগবতী দুর্গাই স্বাহা।—ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কার স্বরাত্মিকা। দেবগণের উদ্দেশ্যে অগ্নিতে হোম করতে হলে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিতে হয়।

তাউজী অনুরোধ করলেন ঃ আজ আপনি দক্ষকন্যা স্বাহার কথা বলুন। অগ্নির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল বলে জানি।

গুরুজী বললেন ঃ সে কোন সহজ সুন্দর সম্পর্ক নয়, তা না শুনলে কোন ক্ষতি হবে না।

তাউজী বললেন ঃ আপনি কি অশ্লীলতার কথা ভাবছেন ? সে কথাও মিথ্যা নয়।

জীবনে সেও তো সত্য। দেবতার কথায় পবিত্রতা রক্ষা করতে গিয়ে আপনি অনেক প্রয়োজনীয় কথা বাদ দিয়েছেন। তাতে অসম্পূর্ণতা থেকে যাবে।

গুরুজী বললেন ঃ এ কথা আমি অস্বীকার করি নে।

একটু থেমে তিনি বললেন ঃ মহাভারতের বনপর্বে এই স্বাহার কাহিনী আছে। মার্কণ্ডেয় ঋষি যুধিষ্ঠিরকে এই গল্প বলেছিলেন। দক্ষকন্যা স্বাহা চিরকাল অগ্নিকে কামনা করেছেন, কিন্তু অপ্রমত্ত অগ্নি কোন দিন তাঁর কামনাকে বোঝবার চেষ্টা করেন নি। স্বাহা তাঁর সংকল্পে স্থির ছিলেন। অগ্নিকে অনুসরণ করে ছলনায় তাঁকে অধিকার করেছিলেন। এই মিলনেই স্কন্দের জন্ম— দেবসেনাপতি ষড়ানন কার্তিকেয়।

সপ্তর্ষিরা তাঁদের আশ্রমে এক যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য বিশ্বামিত্রও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আর সোমরসের পিপাসায় দেবতারাও এসে সমবেত হয়েছিলেন। সেই যজ্ঞে আহুতি নেবার জন্য অগ্নিও উপস্থিত হলেন, এবং যথানিয়মে হব্য গ্রহণ করে দেবতাদের বিতরণ করলেন। তারপর সেখান থেকে প্রস্থানের সময় ঋষিপত্নীদের দেখতে পেলেন। তাঁদের রূপে মুগ্ধ হয়ে তিনি থমকে দাঁড়ালেন, মুহূর্তের জন্য তাঁর চিত্তে বিকার এল। তারপরেই সংযত হয়ে ভাবলেন, ছি-ছি, এই সতী-সাধ্বী ঋষিপত্নীরা কী ভাবলেন! তার চেয়ে প্রকাশ্যে তাঁদের না দেখে গোপনে তাঁদের দেখব। এই ভেবে অগ্নি তাঁদের গার্হপত্য আগুনে প্রবেশ করলেন।

গার্হপত্য আগুন আমি বুঝতে পারি নি। বোধহয় কেউই

পারে নি। গুরুজী তাই সন্দেহ করে বললেন: গার্হপত্য আগুন মানে রান্না ঘরের আগুন। সেই আগুনে প্রবেশ করে অগ্নি রন্ধনরতা ঋষিপত্নীদের রূপ দেখতে লাগলেন।

অগ্নির এই চিত্তবিকার দুজন লক্ষ্য করেছিলেন—বিশ্বামিত্র ও স্বাহা। বিশ্বামিত্র কাউকে কিছু বলেন নি, কিন্তু স্বাহা এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নিজের কামনা চরিতার্থ করেছিলেন। অগ্নি এই ভাবে অনেক দিন কাটিয়েছিলেন সপ্তর্ষির আশ্রমে। অগ্নির শিখা এমন উজ্জ্বল ভাবে জ্বলত যে মনে হত সেই শিখা ঋষিপত্নীদের স্পর্শ করছে। এই পর্যন্তই। এর বেশি কিছু পাবার আশা নেই জেনে মনের দুঃখে তিনি বনে গেলেন।

স্বাহা তখন অগ্নির ছিদ্রান্বেষণ করে বেড়াচ্ছিলেন। এইবারে অগ্নিকে কাবু করবার সুযোগ পেলেন। স্থির করলেন যে তিনি ঋষিপত্নীদের রূপ ধারণ করে অগ্নির কাছে যাবেন। তাতে অগ্নি কৃতার্থ হবেন। আর তাঁর নিজের কামনাও সার্থক হবে। স্বাহা তাই করলেন। এক প্রতিপদে অঙ্গিরার পত্নী শিবার রূপ ধারণ করে অগ্নির নিকট এসে উপস্থিত হলেন। বললেন, আমি অঙ্গিরার স্ত্রী শিবা, ঋষিপত্নীরা মন্ত্রণা করে আজ আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন।

অগ্নি আশ্চর্য হয়ে বললেন, আমার মনের কথা তোমরা কী করে জানলে?

স্বাহা সলজ্জায় বললেন, তুমি চিরকালই আমাদের অনুরাগ-ভাজন। এবারে ইঙ্গিতে তোমার অভিপ্রায় আমরা জেনেছি।

পরম পুলকে অগ্নি স্বাহার পাণিগ্রহণ করলেন। আর স্বাহা তাঁর পাণিতে আগ্নেয় তেজ গ্রহণ করলেন। তারপর সুপর্ণী পাখির রূপে স্বাহা সেই তেজ শ্বেত পর্বতে এক কাঞ্চন কুণ্ডে নিক্ষেপ করলেন।

একবার দুবার নয়, স্বাহা ছবার গেলেন অগ্নির কাছে ছয় ঋষি-পত্নীর রূপ ধারণ করে প্রতিপদ তিথিতে। আর প্রতিবারেই

আগ্নেয় তেজ নিয়ে গিয়ে শ্বেত পর্বতের কাঞ্চন কুণ্ডে নিক্ষেপ করে এলেন। সপ্তম বারে স্বাহা বশিষ্ঠের স্ত্রী অরুন্ধতীর রূপ গ্রহণে অসমর্থ হলেন। অরুন্ধতীর অসামান্য তপঃপ্রভাব ও অকৃত্রিম স্বামি-সেবার পুণ্যে স্বাহার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল।

সেই কাঞ্চনকুণ্ডে জন্ম হল স্কন্দের। ষড়ানন, তাঁর ছটি মাথায় বার চোখ, বার হাত, দেহ একটি। তাঁর জন্ম সময়ের বিশদ বর্ণনা আছে মহাভারতে। স্বাহার গল্পের জন্য সে সব কথা এখানে অবান্তর।

গুরুজী বললেন: স্কন্দের জন্মের কথা নানা ভাবে প্রচারিত হল। প্রাকৃতিক নানা উৎপাত দেখে সপ্তর্ষিরা উদ্বিগ্ন হলেন। চৈত্ররথ বনে যারা বাস করত, তারা বলল যে অগ্নির সঙ্গে ছয় ঋষিপত্নীর ব্যভিচারের জন্যই এই রকম হচ্ছে। কেউ বলল, না, কিছু দিন থেকে যে সুপর্ণীকে দেখা যাচ্ছে, তারই জন্য এই দুর্যোগ। এই সমস্ত কথা সপ্তর্ষিদেরও কানে গেল। তাঁরা নিজেদের স্ত্রীকে পরিত্যাগ করলেন। শুধু অরুন্ধতী রইলেন বশিষ্ঠের সঙ্গে।

ঋষিপত্নীদের দুর্গতি দেখে স্বাহার অনুতাপ হল। তিনি গিয়ে ঋষিদের কাছে সত্য কথা বললেন, স্কন্দ আমারই পুত্র। আপনাদের পত্নীরা নির্দোষ।

বিশ্বামিত্র সমস্ত ঘটনা জানতেন। তিনি স্বাহার কথা সমর্থন করলেন। তাঁর মুখে সব কথা শুনেও ঋষিদের সন্দেহ দূর হল না। তাঁরা তাঁদের স্ত্রীদের গ্রহণ করলেন না।

তাউজী বললেন: রামায়ণে আমরা অত্রি অনসূয়াকে একত্র বাস করতে দেখেছি। রামচন্দ্র যখন তাঁদের আশ্রমে এসেছিলেন, অনসূয়া তখন অতি বৃদ্ধা। তিনি সীতাকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, সে কথা আপনি আমাদের বলেছেন। অত্রি কি এই সপ্তর্ষির একজন নন?

গুরুজী বললেন: নিশ্চয়ই একজন।

তবে অত্রি কখন্ তাঁর স্ত্রীকে পরিত্যাগ করলেন ?

গুরুজী হেসে বললেন : এর চেয়েও কঠিন প্রশ্ন আছে। সেই প্রশ্নটি করলে আমি আরও বেশি খুশী হব।

সাধারণত তাউজী ছাড়া আর কেউ কোন প্রশ্ন করেন না। কিন্তু আজ দণ্ডপাণি একটা প্রশ্ন করলেন : পরে বোধহয় ঋষিরা তাঁদের ভুল বুঝতে পেরে তাঁদের স্ত্রীদের গ্রহণ করেছিলেন। তাই নয় কি ?

গুরুজী বললেন : না। মহাভারতেই আছে যে সেই ঋষি-পত্নীরা স্কন্দের নিকটে এসে তাঁদের দুর্গতির কথা জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আমাদের স্বামীদের কানে কেউ লাগিয়েছে যে আমরা তোমার জননী। সেই অপরাধে তাঁরা আমাদের পরিত্যাগ করেছেন। এখন তোমাকে আমরা পুত্র বলে গ্রহণ করছি। তুমি আমাদের পরিত্রাণের ব্যবস্থা কর।

দেবরাজ ইন্দ্র এই সময় উপস্থিত ছিলেন। বললেন, রোহিণীর অনুজা অভিজিৎ এখন তপস্যার জন্য বনে গেছেন। তাঁর জায়গায় নক্ষত্রের দরকার। স্কন্দ ব্রহ্মার সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তারপর ঋষিপত্নীরা স্বর্গে গিয়ে নক্ষত্র রূপে শোভা পেতে লাগলেন।

তাউজী জিজ্ঞাসা করলেন : স্বাহার কী হল ?

গুরুজী বললেন : স্বাহাও এলেন স্কন্দের নিকট। বললেন, তুমি আমার পুত্র, এবারে আমার জন্য কিছু কর।

স্কন্দ বললেন, আদেশ করুন।

পুত্রের নিকট স্বাহা তাঁর বাসনার কথা গোপন করলেন না। বললেন : আমি দক্ষকন্যা স্বাহা। চির দিনই অগ্নির অনুরাগী, কিন্তু তিনি এ কথা কোন দিনই জানতেন না। অগ্নির সঙ্গে আমি নিরন্তর একত্র বাস করতে চাই। তুমি তার ব্যবস্থা কর।

স্কন্দ বললেন, তাই হবে দেবী, এখন থেকে ব্রাহ্মণেরা স্বাহা বলে অগ্নিতে আহুতি দেবেন।

স্বাহার মিলন হল অগ্নির সঙ্গে।

গুরুজী এবারে তাউজীর দিকে তাকিয়ে বললেন : আর কোন অসঙ্গতি চোখে পড়ল না ?

তাউজী বললেন : না।

গুরুজী হেসে বললেন : দেবসেনাপতি স্কন্দ বা কার্তিকেয় শিব-পার্বতীর পুত্র বলে সর্বজনস্বীকৃত। মহাভারতে তাঁকে অগ্নি ও স্বাহার পুত্র বলে প্রচার করা হল। একটা গোঁজামিল দিতে হবে না ?

সত্যিই তো !

গুরুজী বললেন : মার্কণ্ডেয় ঋষি নিজেই গোঁজামিল দিলেন। বললেন, অগ্নির সঙ্গে স্বাহার মিলন হবার পরে ব্রহ্মা স্কন্দকে তাঁর পিতা মাতা শিব দুর্গার কাছে যেতে বললেন। বুঝিয়ে দিলেন যে লোকহিতার্থে মহাদেব অগ্নিতে ও পার্বতী স্বাহাতে সমাবিষ্ট হয়ে তোমার জন্ম দিয়েছেন।

দেবতার কথায় স্কন্দের জন্মকাহিনী আমার মনে পড়ল।

উনিশ

গুরুজী বললেন : দক্ষের পর ভৃগু। পুরাণে ভৃগু একটি বলিষ্ঠ নাম।

ঠিক এই মুহূর্তে আমার একটি গানের কলি মনে পড়ল— ভৃগুপদ চিহ্নিত বিশাল হিয়া মাঝে। বিষ্ণুর বুকে আছে ভৃগুর পায়ের চিহ্ন, বিষ্ণুর বুকে তিনি লাথি মেরেছিলেন। কিন্তু কেন এই হীন কাজ করেছিলেন, সে গল্প মনে পড়ল না। গুরুজী নিজেই এই গল্প বলবেন আশায় নীরবে বসে রইলাম।

গুরুজী বললেন : বলিষ্ঠ এই জন্যে বলছি যে অনেক ঋষির মতো ভৃগু নিজেতেই নিঃশেষ হয়ে যান নি, একটি গৌরবোজ্জ্বল বংশের প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন। চ্যবন ঋচীক জমদগ্নি পরশুরাম— এঁরা ভার্গব নামে পরিচিত। পরশুরামের মতো বীর ব্রাহ্মণ পুরাণে অদ্বিতীয়।

ভৃগুকে অনেকে সপ্তর্ষির মধ্যে গণনা করেন।

বাধা দিয়ে তাউজী বললেন : কিন্তু আমরা যে সপ্তর্ষির কথা শুনলাম, তার মধ্যে ভৃগুর নাম নেই।

গুরুজী বললেন : ঠিক কথা। আবার ভৃগু সপ্তর্ষির একজন নন, এ কথাও বলা যায় না।

তবে ?

তবে একটা কৈফিয়ৎ দিতে হয়। হরিবংশে এর কৈফিয়ৎ আছে। আমি যে সপ্তর্ষির নাম করেছি, সে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের সপ্তর্ষি। মনু চোদ্দজন, কাজেই এই চোদ্দ মন্বন্তরে সপ্তর্ষির নামও বদলেছে। কোন এক মন্বন্তরে ভৃগুও সপ্তর্ষির অন্যতম ছিলেন।

গুরুজী খানিকক্ষণ থেমে রইলেন। তারপরে বললেন :

এইখানে একটু বিজ্ঞানের কথা বললে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অল্পক্ষণের জন্য পুরাণকে যদি আমরা ভুলে যাই তাহলে দেখি যে সপ্তর্ষি একটি নক্ষত্রমণ্ডলীর নাম। সাতটি নক্ষত্রের আমরা সাতটি নাম রেখেছি, সাতটি ঋষির নাম। দীর্ঘ দিন তাঁরা একত্র থাকেন, বোধহয় এক মন্বন্তর। তারপর সামান্য পরিবর্তন হয়, একটি নক্ষত্রের বদলে আমরা আর একটি নক্ষত্র দেখি। হয় তো ক্রতুর বদলে ভৃগু। এখন সপ্তর্ষি মণ্ডলে আমরা যে সাতটি নক্ষত্র দেখতে পাচ্ছি, তাতে ভৃগু নেই। আছে আর একটি ছোট নক্ষত্র, বশিষ্ঠের পাশে অরুন্ধতী। বশিষ্ঠের পাশে বলেই নাম হয়েছে অরুন্ধতী, অত্রির পাশে হলে হয়তো অনসূয়া বলা হত। পতিভক্তিতে অনসূয়া কারও চেয়ে ছোট ছিলেন না। তাঁর সতীত্বের মর্যাদার কথা চির দিন সমুজ্জ্বল থাকবে। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে তিনি পুত্র রূপে লাভ করেছিলেন।

অনসূয়ার গল্প আমার মনে পড়ে গেল। গুরুজী সে গল্প আমাদের সবিস্তারে শুনিয়েছেন। আমি আশ্চর্য হলাম এই ভেবে যে এমন স্ত্রীকেও অত্রি সন্দেহ করে ত্যাগ করেছিলেন। স্বাহার স্বীকারোক্তি ও বিশ্বামিত্রের সমর্থনেও সে সন্দেহ তাঁর দূর হয় নি। এর চেয়ে বিস্ময়ের যেন আর কিছু নেই।

গুরুজী বললেন: বিবাহের সময় সপ্তর্ষি দর্শনের রীতির কথা বলেছি। অরুন্ধতী নক্ষত্র বশিষ্ঠের সঙ্গে পরিভ্রমণ করে, কখনও তাঁকে ছেড়ে যায় না। পুরাণে এই নিয়ে তাঁদের পৃথিবী পর্যটনের গল্প আছে। আর অরুন্ধতী এ দেশে সতীত্বের দৃষ্টান্ত হয়েছেন।

এক কালে বিবাহের সময় ধ্রুব দর্শনের বিধি ছিল। তখন একটি ছোট তারা ধ্রুব তারাকে প্রদক্ষিণ করত। সেই জন্যই ধ্রুব দর্শন। স্বামী স্ত্রী যেন এই দুটি তারার মতো একত্র থাকে, স্ত্রী স্বামীকে অনুবর্তন করে। বিবাহের পরে বর বধূকে বাহিরে নিয়ে গিয়ে আকাশের ধ্রুবতারা দেখিয়ে বলে, আমি ধ্রুব, পতিকুলে তুমি ধ্রুবা

হও। আকাশে এখন আর এই তারা দেখা যায় না বলেই অরুন্ধতী দর্শনের বিধান হয়েছে।

আমার মনে হল, আমি আমার একটি প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি। সপ্তর্ষির ছয় ঋষির পত্নীত্যাগ একটি রূপক মাত্র। সপ্তর্ষি মণ্ডলে একদা হয়তো আরও সাতটি ছোট ছোট তারা ছিল। তাদের মধ্যে এখন একটি মাত্র তারা আছে। বশিষ্ঠের পাশে অরুন্ধতী। আর ছটি তারা মিলিয়ে গেছে প্রখর আলোয়। অগ্নির তেজ তারই রূপক। সাতজন ঋষিপত্নীর নাম পাওয়া যায় পদ্মপুরাণে—অরুন্ধতী অনসূয়া সম্ভূতি সন্নতি প্রীতি লজ্জা ও ক্ষমা। এঁরা সকলেই লোকজননী।

গুরুজী আবার ভৃগুর প্রসঙ্গে ফিরে এলেন। বললেন: প্রতি দিন আমাদের ভৃগুর উদ্দেশে তর্পণ করতে হয়। গীতায় কৃষ্ণ বলেছেন যে মহর্ষিদের মধ্যে আমি ভৃগু। ভৃগু আবার শিবেরও নামান্তর।

বিষ্ণুপুরাণের মতে ভৃগু ব্রহ্মার মানস পুত্র। মনুসংহিতায় তাঁকে আমরা দশ জন প্রজাপতির অন্যতম রূপে দেখি। তিনি কর্দম ঋষির কন্যা খ্যাতিকে বিবাহ করেছিলেন। অনেকে বলেন, খ্যাতি দক্ষের কন্যা। তাঁর দুই পুত্রের নাম ধাতা ও বিধাতা এবং কন্যার নাম লক্ষ্মী। তিনি লক্ষ্মীর বিবাহ দিয়েছিলেন বিষ্ণুর সঙ্গে।

মহাভারতে আমরা ভৃগুকে যজ্ঞসম্ভব মহর্ষি রূপে দেখি। রুদ্র বারুণী মূর্তি পরিগ্রহ করে এক যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। ব্রহ্মা স্বয়ং সেই যজ্ঞ করেছিলেন। ভৃগুর জন্ম হয় যজ্ঞের অগ্নি থেকে।

এই পর্যন্ত বলে গুরুজী থামলেন, ভাবলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন: পুরাণকে যদি আমরা এই রকম করে বলি তাহলে অশ্লীলকে বর্জন করা সম্ভব হয়। কিন্তু তাহলে সত্যের মর্যাদা রক্ষা হয় কিনা জানি না। বিশদ ভাবে বলতে হলে খানিকটা সঙ্কোচের বাধা উপস্থিত হয়।

তাউজী বললেনঃ তা হোক।

গুরুজী বললেনঃ তোমার মত যত সহজে ব্যক্ত করতে পার, তোমাদের সকলের সামনে সমস্ত ঘটনা আমি তেমন সহজে বলতে পারি না। এ আমার দুর্বলতা সন্দেহ নেই, আমাদের সংস্কারের জন্যই এই দুর্বলতা আমরা ত্যাগ করতে পারি না।

গুরুজী আর একটু ইতস্তত করে বললেনঃ এই যজ্ঞ দেখবার জন্য অনেকে এসে সমবেত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে দেবকন্যারাও ছিলেন। এই দেবকন্যাদের দেখে ব্রহ্মা চঞ্চল হন। অগ্নিতে পতিত তাঁর বীর্য থেকে ভৃগুর জন্ম। এই সঙ্গে আরও দুজনের জন্ম হয়েছিল—অগ্নির শিখা থেকে ভৃগু, সধূম অঙ্গার থেকে অঙ্গিরা ও নির্ধূম অঙ্গার থেকে কবি। এঁদের পিতৃত্ব নিয়ে বিবাদ বেধেছিল তিন দেবতার মধ্যে। রুদ্র বললেন, যজ্ঞ আমার, কাজেই এরা আমার পুত্র। অগ্নি বললেন, আমার অঙ্গ থেকে জন্ম বলে আমারই অপত্য এরা। কিন্তু ব্রহ্মা শাস্ত্র বাক্য শোনালেন, বীজ যার ফসলও তার। দেবতারা মধ্যস্থ হয়ে এই বিবাদ মেটালেন। মহাদেব ভৃগুকে পেলেন, অগ্নি অঙ্গিরাকে এবং ব্রহ্মা কবিকে।

তাউজী বললেনঃ অঙ্গিরাকেও তো আমরা ব্রহ্মার মানস পুত্র বলে জানি।

গুরুজী বললেনঃ মানস পুত্র বলে পুরাণকার সব সময় নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। কোন অলৌকিক উপায়ে জন্ম দেখাতে না পারলে যেন তাঁদের তৃপ্তি হত না। কাউকে বড় বলতে হলে তার জন্ম বৃত্তান্তে খানিকটা অবিশ্বাস্য ঘটনার সমাবেশ চাই। যেমন দেবতাদের ক্ষেত্রে তেমনি মুনি ঋষি ও রাজাদের ক্ষেত্রেও পুরাণ-কারদের এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। থাক সে কথা, আমরা ভৃগুর কথা বলি।

খ্যাতির গর্ভে ভৃগুর ধাতা ও বিধাতা নামে যে দুই পুত্র জন্মে, ভৃগু তাঁদের বিবাহ দেন মেরুর আয়তি ও নিয়তি নামে দুই কন্যার

সঙ্গে। এঁদের পুত্র মৃকণ্ডু ও প্রাণ। এঁরাই ভৃগু বংশ বিস্তার করেন। কিন্তু এঁদের সম্বন্ধে পুরাণে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না।

ভৃগুর যে পুত্রেরা পুরাণে নন্দিত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে প্রথম হলেন চ্যবন। চ্যবনের মায়ের নাম পুলোমা। তিনি দৈত্যরাজ বৈশ্বানরের কন্যা।

গুরুজী বললেন: সে যুগে দেবতা দৈত্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ে যে অবাধে অবলীলায় বিবাহ হত, পুরাণে তার অসংখ্য প্রমাণ আছে। তার জন্য সমাজে কোন কথা উঠত না। এর মধ্যেও একটি জিনিস লক্ষ্য করবার বিষয়। দৈত্যরা দেবকন্যা বা ব্রাহ্মণকন্যা হরণের চেষ্টা করেছে, কোন দেবতা বা ব্রাহ্মণ স্বেচ্ছায় নিজের কন্যাকে কোন দৈত্যের হাতে সম্প্রদান করেন নি। তেমনি ক্ষত্রিয়রাও কোন ব্রাহ্মণ কন্যার পাণি গ্রহণে সক্ষম হতেন না। এর থেকেই মনে হয় যে যারা উচ্চ বর্ণের তাদের স্বাধীনতা ছিল নিম্ন বর্ণে বিবাহের, নিম্ন বর্ণের জাতির সে স্বাধীনতা ছিল না।

মহাভারতে আমরা ভৃগুপত্নী পুলোমার একটি কাহিনী পাই। তিনি দৈত্যকন্যা, এবং বিবাহের পূর্বে পুলোমা নামে এক রাক্ষস তাঁর অনুরক্ত ছিল। কিন্তু বৈশ্বানর পুলোমার হাতে কন্যাকে সম্প্রদান না করে ভৃগুর সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিয়েছিলেন। স্বজাতি পুত্রকে প্রত্যাখ্যান করে ব্রাহ্মণের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ কেন দিয়েছিলেন জানা যায় না। সমাজে তাতে কন্যার পিতার প্রতিষ্ঠা বাড়ত কিনা, তাও জানবার উপায় নেই। শুধু এইটুকু লেখা আছে যে পুলোমা রাক্ষস এই ব্যবস্থায় মোটেই খুশী হয় নি, এবং পরবর্তী কালে তার প্রণয়ীকে ভৃগুর আশ্রম থেকে হরণ করবার চেষ্টা করেছিল।

গুরুজী বললেন: মহাভারতের আদি পর্বে পুলোমা হরণের বর্ণনা আছে। দুজনেরই নাম পুলোমা। ভৃগুপত্নী পুলোমাকে হরণ করেছিল রাক্ষস পুলোমা। রাক্ষস একদিন ভৃগুর আশ্রমে

এসে উপস্থিত হয়েছিল। ভৃগু তখন স্নানের জন্য বাহিরে গিয়েছিলেন। আশ্রমে ছিলেন তাঁর অন্তঃসত্ত্বা পত্নী পুলোমা। রাক্ষস তাঁর রূপ দেখে মুগ্ধ হল, এবং তাঁকে চিনতেও তার বিলম্ব হল না। ঋষিপত্নী যখন সমাদরে বনের ফলমূল দিয়ে অতিথি সংকার করছিলেন, তখন রাক্ষসও মনে মনে তার কর্তব্য স্থির করে ফেলেছে। আজ সে অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবে, হরণ করবে তার প্রথম অনুরাগের পাত্রীকে। সে যখন এই নারীকে প্রথমে বরণ করেছে, তখন এ নারী তারই প্রাপ্য। কন্যাকে তার হাতে সম্প্রদান না করে তার পিতা অন্যায় করেছেন। এই পুরাতন ক্ষোভ তার মনে আজ গভীর হয়ে দেখা দিল।

অগ্নিশরণের প্রজ্বলিত অগ্নিকে রাক্ষস জিজ্ঞাসা করল, তুমি এর বিচার কর। তুমি বল, এই রূপসী কার স্ত্রী। আমি যে কন্যাকে আগে বরণ করেছিলাম, তাকে আমার হাতে না দিয়ে তার পিতা ভৃগুকে দান করেছিলেন। এই কি সেই কন্যা নয়? হে অগ্নি, তুমি সকলের প্রাণের পাপপুণ্যের সাক্ষী। তুমি সত্য বল, ভৃগু আমার পত্নীকে হরণ করেছে কিনা এবং ধর্ম মতে আমি তাকে হরণ করতে পারি কিনা!

রাক্ষসের এই প্রশ্ন শুনে অগ্নি ভয় পেলেন। হয় মিথ্যা বলতে হবে, নয় ভৃগুর শাপ মেনে নিতে হবে। ভয়ে ভয়ে তিনি বললেন, তুমি একে আগে বরণ করেছিলে সত্য, কিন্তু মন্ত্রপাঠ করে বিবাহ কর নি। এঁর পিতা বর লাভের আশায় ভৃগুকে কন্যাদান করেন এবং ভৃগু আমার সামনে বেদ বিধি অনুসারে এঁকে বিবাহ করেছেন।

রাক্ষস জিজ্ঞাসা করল, তবে কি ইনি আমার পত্নী হতে পারেন না?

আরও ভয় পেয়ে অগ্নি বললেন, আমি মিথ্যা বলব না। তুমি এঁকে আগে বরণ করেছিলে বলে বিচার মতে ইনি তোমার পত্নী হতে পারেন।

অগ্নির বিচারে রাক্ষস আনন্দে লাফিয়ে উঠল। চক্ষের নিমেষে সে বরাহ রূপ ধারণ করে পুলোমাকে নিয়ে পালিয়ে গেল।

ওধার থেকে দণ্ডপাণির কণ্ঠ শোনা গেল। বললেনঃ যদি অনুমতি দেন তো একটা প্রশ্ন করি।

গুরুজী হেসে বললেনঃ কর।

দণ্ডপাণি জিজ্ঞাসা করলেনঃ পুলোমাকে হরণ করবার জন্য বরাহ রূপ ধারণের কি কোন প্রয়োজন ছিল?

না।

তবে এরা অন্য রূপ কেন ধারণ করত?

গুরুজী বললেনঃ আমার মনে হয় তা করত না। করা সম্ভবও নয়। ঋষিপত্নীকে হরণ করা একটি নিন্দনীয় কাজ, এই কাজ কোন ঘৃণিত প্রাণীর রূপেই করা সম্ভব। 'বরাহের মতো' বোঝাতে পুরাণকার 'বরাহের রূপ ধারণ করে' বলে থাকবেন।

তাউজী বললেনঃ তারপর?

তারপর চ্যবনের জন্ম হল। হরণকালে শিশু পুলোমার গর্ভচ্যুত হয়েছিল বলে এই পুত্রের নাম চ্যবন হল। তার তেজে রাক্ষস ভস্ম হয়ে গেল। নবজাত পুত্রকে কোলে নিয়ে পুলোমা আশ্রমের দিকে ফিরতে লাগলেন। তাঁর দু চোখে জলের ধারা নামল। ব্রহ্মা এলেন পুত্রবধূকে সান্ত্বনা দিতে। পুলোমার চোখের জলে যে নদীর ধারা হল, ব্রহ্মা তার নাম বধূসরা রাখলেন।

স্নান আহ্নিক সেরে ভৃগু যখন আশ্রমে ফিরলেন, তখন স্ত্রীপুত্রকে দেখে সবই জানলেন। তাঁর ক্রোধের সীমা রইল না। পুলোমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাক্ষসকে তোমার পরিচয় কে দিল?

পুলোমা বললেন, অগ্নি।

ভৃগু অগ্নিকে বললেন, এত বড় দুঃসাহস তোমার! আমি তোমাকে শাপ দিলাম, তুমি সর্বভুক্ হবে।

অগ্নি বললেন, রাক্ষসকে আমি সত্য কথা বলেছি, তুমি আমাকে

তাউজী বললেনঃ তা হোক।

গুরুজী বললেনঃ তোমার মত যত সহজে ব্যক্ত করতে পার, তোমাদের সকলের সামনে সমস্ত ঘটনা আমি তেমন সহজে বলতে পারি না। এ আমার দুর্বলতা সন্দেহ নেই, আমাদের সংস্কারের জন্যই এই দুর্বলতা আমরা ত্যাগ করতে পারি না।

গুরুজী আর একটু ইতস্তত করে বললেনঃ এই যজ্ঞ দেখবার জন্য অনেকে এসে সমবেত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে দেবকন্যারাও ছিলেন। এই দেবকন্যাদের দেখে ব্রহ্মা চঞ্চল হন। অগ্নিতে পতিত তাঁর বীর্য থেকে ভৃগুর জন্ম। এই সঙ্গে আরও দুজনের জন্ম হয়েছিল—অগ্নির শিখা থেকে ভৃগু, সধূম অঙ্গার থেকে অঙ্গিরা ও নির্ধূম অঙ্গার থেকে কবি। এঁদের পিতৃত্ব নিয়ে বিবাদ বেধেছিল তিন দেবতার মধ্যে। রুদ্র বললেন, যজ্ঞ আমার, কাজেই এরা আমার পুত্র। অগ্নি বললেন, আমার অঙ্গ থেকে জন্ম বলে আমারই অপত্য এরা। কিন্তু ব্রহ্মা শাস্ত্র বাক্য শোনালেন, বীজ যার ফসলও তার। দেবতারা মধ্যস্থ হয়ে এই বিবাদ মেটালেন। মহাদেব ভৃগুকে পেলেন, অগ্নি অঙ্গিরাকে এবং ব্রহ্মা কবিকে।

তাউজী বললেনঃ অঙ্গিরাকেও তো আমরা ব্রহ্মার মানস পুত্র বলে জানি।

গুরুজী বললেনঃ মানস পুত্র বলে পুরাণকার সব সময় নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। কোন অলৌকিক উপায়ে জন্ম দেখাতে না পারলে যেন তাঁদের তৃপ্তি হত না। কাউকে বড় বলতে হলে তার জন্ম বৃত্তান্তে খানিকটা অবিশ্বাস্য ঘটনার সমাবেশ চাই। যেমন দেবতাদের ক্ষেত্রে তেমনি মুনি ঋষি ও রাজাদের ক্ষেত্রেও পুরাণকারদের এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। থাক সে কথা, আমরা ভৃগুর কথা বলি।

খ্যাতির গর্ভে ভৃগুর ধাতা ও বিধাতা নামে যে দুই পুত্র জন্মে, ভৃগু তাঁদের বিবাহ দেন মেরুর আয়তি ও নিয়তি নামে দুই কন্যার

সঙ্গে। এঁদের পুত্র মৃকণ্ডু ও প্রাণ। এঁরাই ভৃগু বংশ বিস্তার করেন। কিন্তু এঁদের সম্বন্ধে পুরাণে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না।

ভৃগুর যে পুত্রেরা পুরাণে নন্দিত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে প্রথম হলেন চ্যবন। চ্যবনের মায়ের নাম পুলোমা। তিনি দৈত্যরাজ বৈশ্বানরের কন্যা।

গুরুজী বললেন ঃ সে যুগে দেবতা দৈত্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ে যে অবাধে অবলীলায় বিবাহ হত, পুরাণে তার অসংখ্য প্রমাণ আছে। তার জন্য সমাজে কোন কথা উঠত না। এর মধ্যেও একটি জিনিস লক্ষ্য করবার বিষয়। দৈত্যরা দেবকন্যা বা ব্রাহ্মণকন্যা হরণের চেষ্টা করেছে, কোন দেবতা বা ব্রাহ্মণ স্বেচ্ছায় নিজের কন্যাকে কোন দৈত্যের হাতে সম্প্রদান করেন নি। তেমনি ক্ষত্রিয়রাও কোন ব্রাহ্মণ কন্যার পাণি গ্রহণে সক্ষম হতেন না। এর থেকেই মনে হয় যে যারা উচ্চ বর্ণের তাদের স্বাধীনতা ছিল নিম্ন বর্ণে বিবাহের, নিম্ন বর্ণের জাতির সে স্বাধীনতা ছিল না।

মহাভারতে আমরা ভৃগুপত্নী পুলোমার একটি কাহিনী পাই। তিনি দৈত্যকন্যা, এবং বিবাহের পূর্বে পুলোমা নামে এক রাক্ষস তাঁর অনুরক্ত ছিল। কিন্তু বৈশ্বানর পুলোমার হাতে কন্যাকে সম্প্রদান না করে ভৃগুর সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিয়েছিলেন। স্বজাতি পুত্রকে প্রত্যাখ্যান করে ব্রাহ্মণের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ কেন দিয়েছিলেন জানা যায় না। সমাজে তাতে কন্যার পিতার প্রতিষ্ঠা বাড়ত কিনা, তাও জানবার উপায় নেই। শুধু এইটুকু লেখা আছে যে পুলোমা রাক্ষস এই ব্যবস্থায় মোটেই খুশী হয় নি, এবং পরবর্তী কালে তার প্রণয়ীকে ভৃগুর আশ্রম থেকে হরণ করবার চেষ্টা করেছিল।

গুরুজী বললেন ঃ মহাভারতের আদি পর্বে পুলোমা হরণের বর্ণনা আছে। দুজনেরই নাম পুলোমা। ভৃগুপত্নী পুলোমাকে হরণ করেছিল রাক্ষস পুলোমা। রাক্ষস একদিন ভৃগুর আশ্রমে

শাপ দিয়ে অন্যায় করলে। তবে নিশ্চিন্ত থাক, আমি তোমাকে প্রত্যভিশাপ দেব না। ব্রাহ্মণকে আমি সম্মান করি।

তারপর অগ্নি বললেন ঃ কী করে আমি সর্বভুক্ হব তাই বল। যোগবলে আমি অনেক মূর্তিতে অধিষ্ঠান করি, দেবতারা যে আমাতে প্রদত্ত আহুতিই গ্রহণ করেন!

এ কথার উত্তর নেই। ব্রাহ্মণের যজ্ঞ থেকে অগ্নি অন্তর্হিত হলেন। ঋষি ও দেবতারা উদ্বিগ্ন হয়ে ব্রহ্মার কাছে গেলেন। ব্রহ্মা তাঁদের সমস্যার সমাধান করে দিলেন, অগ্নিকে বললেন ঃ তুমি সর্বদা পবিত্র। সর্ব শরীর দিয়ে তুমি সর্বভুক্ হবে না, তোমার অপান দেশের শিখাই শুধু সর্বভুক্ হবে।

গুরুজী থামতেই তাউজী একটা প্রশ্ন করলেন ঃ যত দূর মনে পড়ে ইন্দ্রাণী শচীর পিতার নাম আপনি পুলোমা বলেছিলেন। তিনি কোন্ পুলোমা ?

গুরুজী বললেন ঃ তিনি দৈত্যরাজ পুলোমা, কশ্যপের পুত্র। বোধ হয় মনে আছে যে দৈত্যরা কশ্যপের পত্নী দিতির সন্তান। তবে কোন পুরাণে পড়েছি বলে মনে পড়ছে যে পুলোমা বা পুলোমন নামে একজন ঋষিও ছিলেন। শচী তাঁরই কন্যা। রাবণের পুত্র মেঘনাদ যখন মায়াবলে রণক্ষেত্র আচ্ছন্ন করে ইন্দ্রের পুত্র জয়ন্তকে বিপদে ফেলে, তখন এই পুলোমা তাঁর দৌহিত্রকে নিয়ে পালিয়ে যান। আরও পড়েছি যে এঁর মত নিয়ে অনুহ্লাদ শচীকে হরণ করেন। এই রাগে ইন্দ্র পুলোমা ও অনুহ্লাদ দুজনকেই হত্যা করেন।

তাউজী বললেন ঃ এ ভারি বিপদের কথা হল।

কেন ?

শচী ঋষির কন্যা না রাক্ষসের—তা সঠিক জানা গেল না।

গুরুজী বললেন ঃ ঋষির কন্যা তিনি নন। পুলোমা কশ্যপমুনির পুত্র বলে কেউ হয়তো পুলোমাকেও ঋষি ভেবেছেন। শচী যে দৈত্য

পুলোমার কন্যা তাতে সন্দেহ নেই। রামায়ণেও এ কথার প্রমাণ আছে।

গুরুজী খানিকক্ষণ ভেবে বললেন ঃ ভৃগুর কথা আমরা এখনও শেষ করি নি।

তাউজী বললেন ঃ সবে শুরু করেছি।

গুরুজী হেসে বললেন ঃ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য ভৃগুর আর এক পুত্র। রামায়ণে আছে যে এক সময় পিতা পুত্র দুজনেই তপস্যা করতে গেছেন। দৈত্যদের কল্যাণের জন্য শুক্রাচার্য তপস্যা করছেন, এই অবকাশে দেবতারা দৈত্যদের আক্রমণ করলেন। দৈত্যরা এসে শুক্রাচার্যের মায়ের নিকট আশ্রয় নিল। কিন্তু দেবতারা সেখানেও এসে উপস্থিত হলেন, এবং বিষ্ণু অসুর বধের জন্য যে চক্র নিক্ষেপ করেন, তাতে শুক্রাচার্যের মায়ের মাথা কাটা যায়। ভৃগু এই সংবাদ পেয়ে বিষ্ণুকে শাপ দেন যে পত্নী বিয়োগের দুঃখ তাঁকেও ভোগ করতে হবে। সীতার বিরহে রামের দুঃখের কথা অমর হয়ে আছে।

একবার ভৃগু এক ক্ষত্রিয় রাজাকে ব্রাহ্মণত্ব দান করেন। মহাভারতে আমরা বীতহব্য ও রাজা দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দনের শত্রুতার কথা পড়েছি। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বীতহব্য প্রাণের ভয়ে ভৃগুর আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছিলেন। প্রতর্দন এসে বললেন, মহর্ষি, বীতহব্যকে আপনি ত্যাগ করুন। শরণাগতকে রক্ষার জন্য ভৃগু বললেন, এখানে সকলেই ব্রাহ্মণ, কোন ক্ষত্রিয় আমার আশ্রমে নেই। ভৃগুর কথাতেই বীতহব্য ব্রাহ্মণত্ব লাভ করলেন। প্রতর্দন অবশ্য খুশী হয়েই চলে গেলেন, বীতহব্যকে আমি জাতিত্যাগে বাধ্য করেছি, এতেই আমার আনন্দ।

গুরুজী বললেন ঃ শুনে তোমরা আশ্চর্য হবে যে ধনুর্বেদ বিদ্যার প্রবর্তক হলেন ভৃগু। একজন তপস্বী ব্রাহ্মণ কী করে এই বিদ্যা আয়ত্ত করে প্রচার করলেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। তিনি যুদ্ধ

করেন নি, যুদ্ধে সাহায্যও করেন নি কাউকে, শুধু যে শখ করে এই কাজ করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

এর পরে গুরুজী আমাদের সেই গল্পটি বললেন। বিষ্ণুর বুকে লাথি মারার গল্প। খানিকটা শুনতেই আমার সেই বহুপ্রচলিত গল্পটি মনে পড়ে গেল। গুরুজী বললেন: ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের মধ্যে কোন্ দেবতার পূজা প্রশস্ত, ভৃগু একবার এই মীমাংসায় প্রবৃত্ত হলেন। প্রথমে ব্রহ্মলোকে গিয়ে ব্রহ্মাকে সম্মান করলেন না। পিতামহ এতে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। ভৃগু কোন রকমে তাঁকে শান্ত করে কৈলাসে মহাদেবের কাছে উপস্থিত হলেন। তাঁকেও সম্মান করলেন না বলে শিব ক্রুদ্ধ হয়ে ভৃগুকে বধ করতে উদ্যত হলেন। ভৃগু স্তবস্তুতি করে তাঁকে শান্ত করলেন। তার পরে গেলেন গোলোকে বিষ্ণুর কাছে। বিষ্ণু ঘুমচ্ছিলেন, নিদ্রা ভাঙছে না দেখে ভৃগু তাঁর বুকে পদাঘাত করলেন। বিষ্ণু জেগে উঠে নিজের কথা ভাবলেন না, ঋষির পায়ে আঘাত লেগেছে ভেবে তাঁর পদসেবা করলেন। সন্তুষ্ট হয়ে ভৃগু বললেন, দেবতাদের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ, তোমার পূজাই প্রশস্ত।

শৈশবে এই গল্প শুনে আমার অন্য কথা মনে হয়েছিল। সাদাসিধে সরল প্রকৃতির শিব সম্মান না পেয়ে মারতে উঠেছিলেন। কিন্তু চক্রী বিষ্ণু সব জেনে শুনে ছলনা করেছিলেন ভৃগুকে। বিষ্ণুর ছলনা ঋষি বুঝতে পারেন নি।

কুড়ি

গুরুজী বললেনঃ সুকন্যার গল্প দিয়ে চ্যবনের কথা শুরু করা যায় না। সে তাঁর যৌবনের কাহিনী নয়, চ্যবনের সঙ্গে সুকন্যার দেখা হয়েছিল তাঁর জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ বয়সে। তপস্যারত ঋষির ক্ষীণ দেহ তখন বল্মীকে ঢাকা, সুকন্যা তাঁকে মানুষ বলে চিনতে পারেন নি। কাজেই সুকন্যার কথা আমরা পরে বলব।

মহাভারতে চ্যবনের আরও দুটি কাহিনী আছে। চ্যবন ও নহুষের কথা, চ্যবন ও কুশিকের কথা। আমার মনে হয় চ্যবন ও কুশিকের কথাই চ্যবনের জীবনের প্রথম দিকের ঘটনা। ঋষির বয়স যে তখন কম ছিল তা তাঁর ব্যবহারেই প্রকাশ পেয়েছে। সেই গল্পই প্রথমে বলা যাক।

চ্যবন জানতে পেরেছিলেন যে অদূর ভবিষ্যতে ভৃগু বংশে ক্ষত্রাচার সংক্রামিত হবে, এবং তা আসবে কুশিক রাজবংশ থেকে। এই অন্যায় রোধ করার জন্য তিনি কুশিক বংশ দগ্ধ করা উচিত মনে করলেন। কিন্তু বিনা অপরাধে তা করা যায় না। তাই ছিদ্রান্বেষণের জন্য তিনি কুশিকের প্রাসাদে গিয়ে বললেন, মহারাজ, আমি তোমার সঙ্গে বাস করতে এসেছি। তুমি ও তোমার রাণী আমার পরিচর্যা কর।

তারপর রাজারাণীর কঠিন পরীক্ষা শুরু হল। একুশ দিন নিরন্তর তাঁরা ঋষির পদসেবা করলেন। তারপর আবার একুশ দিন। ক্ষুধাতৃষ্ণায় শ্রান্ত ক্লান্ত রাজা নীরবে ঋষির সেবায় নিরত হয়ে রইলেন। তারপর এক রথে আরোহণ করে ঋষি বললেন, তোমরা দুজনে এই রথ টানো।

দুর্বাসার কথা আমার মনে পড়ল। সেই পাগল ঋষিও কৃষ্ণ

করেন নি, যুদ্ধে সাহায্যও করেন নি কাউকে, শুধু যে শখ করে এই কাজ করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

এর পরে গুরুজী আমাদের সেই গল্পটি বললেন। বিষ্ণুর বুকে লাথি মারার গল্প। খানিকটা শুনতেই আমার সেই বহুপ্রচলিত গল্পটি মনে পড়ে গেল। গুরুজী বললেনঃ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের মধ্যে কোন্ দেবতার পূজা প্রশস্ত, ভৃগু একবার এই মীমাংসায় প্রবৃত্ত হলেন। প্রথমে ব্রহ্মলোকে গিয়ে ব্রহ্মাকে সম্মান করলেন না। পিতামহ এতে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। ভৃগু কোন রকমে তাঁকে শান্ত করে কৈলাসে মহাদেবের কাছে উপস্থিত হলেন। তাঁকেও সম্মান করলেন না বলে শিব ক্রুদ্ধ হয়ে ভৃগুকে বধ করতে উদ্যত হলেন। ভৃগু স্তবস্তুতি করে তাঁকে শান্ত করলেন। তার পরে গেলেন গোলোকে বিষ্ণুর কাছে। বিষ্ণু ঘুমচ্ছিলেন, নিদ্রা ভাঙছে না দেখে ভৃগু তাঁর বুকে পদাঘাত করলেন। বিষ্ণু জেগে উঠে নিজের কথা ভাবলেন না, ঋষির পায়ে আঘাত লেগেছে ভেবে তাঁর পদসেবা করলেন। সন্তুষ্ট হয়ে ভৃগু বললেন, দেবতাদের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ, তোমার পূজাই প্রশস্ত।

শৈশবে এই গল্প শুনে আমার অন্য কথা মনে হয়েছিল। সাদাসিধে সরল প্রকৃতির শিব সম্মান না পেয়ে মারতে উঠেছিলেন। কিন্তু চক্রী বিষ্ণু সব জেনে শুনে ছলনা করেছিলেন ভৃগুকে। বিষ্ণুর ছলনা ঋষি বুঝতে পারেন নি।

কুড়ি

গুরুজী বললেন: সুকন্যার গল্প দিয়ে চ্যবনের কথা শুরু করা যায় না। সে তাঁর যৌবনের কাহিনী নয়, চ্যবনের সঙ্গে সুকন্যার দেখা হয়েছিল তাঁর জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ বয়সে। তপস্যারত ঋষির ক্ষীণ দেহ তখন বল্মীকে ঢাকা, সুকন্যা তাঁকে মানুষ বলে চিনতে পারেন নি। কাজেই সুকন্যার কথা আমরা পরে বলব।

মহাভারতে চ্যবনের আরও দুটি কাহিনী আছে। চ্যবন ও নহুষের কথা, চ্যবন ও কুশিকের কথা। আমার মনে হয় চ্যবন ও কুশিকের কথাই চ্যবনের জীবনের প্রথম দিকের ঘটনা। ঋষির বয়স যে তখন কম ছিল তা তাঁর ব্যবহারেই প্রকাশ পেয়েছে। সেই গল্পই প্রথমে বলা যাক।

চ্যবন জানতে পেরেছিলেন যে অদূর ভবিষ্যতে ভৃগু বংশে ক্ষত্রাচার সংক্রামিত হবে, এবং তা আসবে কুশিক রাজবংশ থেকে। এই অন্যায় রোধ করার জন্য তিনি কুশিক বংশ দগ্ধ করা উচিত মনে করলেন। কিন্তু বিনা অপরাধে তা করা যায় না। তাই ছিদ্রান্বেষণের জন্য তিনি কুশিকের প্রাসাদে গিয়ে বললেন, মহারাজ, আমি তোমার সঙ্গে বাস করতে এসেছি। তুমি ও তোমার রাণী আমার পরিচর্যা কর।

তারপর রাজারাণীর কঠিন পরীক্ষা শুরু হল। একুশ দিন নিরন্তর তাঁরা ঋষির পদসেবা করলেন। তারপর আবার একুশ দিন। ক্ষুধাতৃষ্ণায় শ্রান্ত ক্লান্ত রাজা নীরবে ঋষির সেবায় নিরত হয়ে রইলেন। তারপর এক রথে আরোহণ করে ঋষি বললেন, তোমরা দুজনে এই রথ টানো।

দুর্বাসার কথা আমার মনে পড়ল। সেই পাগল ঋষিও কৃষ্ণ

ও তাঁর পত্নী রুক্মিণীকে দিয়ে রথ টানিয়েছিলেন। কুশিকও টানলেন। শুধু যে শাপের ভয়ে তাঁরা এ রকম অত্যাচার সহ্য করতেন, তা মনে হয় না। বোধহয় আরও কোন কারণ ছিল।

গুরুজী বললেনঃ রাজারাণী-বাহিত রথের পিছনে চলল শোকার্ত পুরবাসিগণ। ঋষির কশাঘাতে যখন রাজা ও রাণীর দেহ ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল, তখন প্রজাবৃন্দের দুঃখের আর সীমা ছিল না। কিন্তু প্রতিবাদ করবার উপায় নেই। ঋষি ক্রুদ্ধ হলে অনর্থ হবে। শেষ পর্যন্ত এই পরীক্ষাতেও কুশিক উত্তীর্ণ হলেন। রাজার অজস্র ধনরত্ন দান করে ঋষি সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, বর নাও।

তারপরে দুজনের দেহ হাত দিয়ে স্পর্শ করলেন। তাঁদের শ্রান্তি ও বেদনা নিমেষে দূর হয়ে গেল।

রাজা বললেন, আর আমাদের প্রার্থনার কিছু নেই।

চ্যবন বললেন, তোমরা দুঃখিত হয়ো না। কাল সকালে তোমরা গঙ্গার তীরে আমার সঙ্গে দেখা করতে এস।

পরদিন সকালে রাজা ও রাণী গঙ্গার তীরে গিয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন। দেখলেন, সেখানে গন্ধর্ব নগরের মতো অপরূপ সুন্দর এক নগর, পর্বত ও সরোবরে প্রাসাদ ও উদ্যানে মনোহরণ করছে। কুশিক ভাবলেন, আমি কি অমরাবতীতে এসেছি, না স্বপ্ন দেখছি! তারপরেই সব অদৃশ্য হয়ে গেল। পড়ে রইল সেই গঙ্গার নির্জন তীর। রাজা তাঁর রাণীকে বললেন, তপোবলেই এই কাজ সম্ভব, তপস্যাই শ্রেষ্ঠ। রাজ্যলাভের চেয়ে ব্রাহ্মণত্ব লাভই বেশি দুর্লভ।

চ্যবন তাঁদের ডেকে বললেন, পরীক্ষায় তোমরা উত্তীর্ণ হয়েছ, এবারে বর নাও।

রাজা কুশিক বললেন, আপনার ক্রোধে আমরা দগ্ধ হই নি, এতেই আমরা কৃতার্থ। শুধু এইটুকুই জানবার বাসনা যে কী অভিপ্রায়ে এই পরীক্ষা নিলেন।

চ্যবন সত্য কথা স্বীকার করলেন, বললেন, আমি ব্রহ্মার কাছে শুনেছিলাম যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বিরোধের ফলে কুল বর্ণসংকর হবে। তাই তোমার বংশ দগ্ধ করবার জন্য ছিদ্রান্বেষণে এসেছিলাম। কিন্তু তোমাদের উৎপীড়ন করে ব্যর্থ হয়েছি, আর গুণে মুগ্ধ হয়েছি। তোমাদের জন্য স্বর্গসুখের ব্যবস্থা করেছিলাম। এবারে আশীর্বাদ করছি, তোমার মনোরথ পূর্ণ হবে, তোমার বংশে জন্ম গ্রহণ করে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করবেন। এই বলে চ্যবন তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়লেন।

তাউজী বললেনঃ আপনার কথায় একটা নতুন জিনিষ জানলাম।

গুরুজী জিজ্ঞাসা করলেনঃ কী?

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বিরোধের কথা।

গুরুজী বললেনঃ পরবর্তী কালে এই বিরোধ খুবই প্রবল হয়ে উঠেছিল। কৃতবীর্য রাজার বংশধরেরা ভার্গবদের হত্যা করে। ভৃগুর মতো তাঁর বংশে ঋচীকও ক্ষত্রিয় দমনের জন্য ধনুর্বেদ বিদ্যা আয়ত্ত করেন। তারপর কার্তবীর্যের সঙ্গে পশুরামের যুদ্ধ। তাঁর পুত্রদের হাতে জমদগ্নির হত্যাকাণ্ড, এবং এই রাগে পরশুরামের একুশ বার ক্ষত্রিয় দমন আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। এই সব ঘটনা থেকে মনে হয় যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বিরোধ এক সময় দীর্ঘকাল ধরে চলেছিল, এবং তারই জন্য ব্রাহ্মণদের অস্ত্র শিক্ষা করতে হয়েছিল। পরে আমরা সে কথায় আসব।

গুরুজী চ্যবনের গল্পই বলতে লাগলেন। চ্যবন ও নহুষের গল্প। বললেনঃ চ্যবন বারো বৎসর গঙ্গা-যমুনার জলে বাস করে তপস্যা করেছিলেন। সে সময় তিনি সকল প্রাণীর এমন বিশ্বাসভাজন হয়েছিলেন যে মৎস্যরা নির্ভয়ে তাঁর মুখের কাছে আসত। একদিন ধীবররা জাল ফেলে অনেক মাছ তুলল, তার সঙ্গে ঋষিও জালে আটকা পড়লেন। তাঁর জটা-শ্মশ্রুর পিঙ্গল রঙ, দেহ শৈবাল

ও তাঁর পত্নী রুক্মিণীকে দিয়ে রথ টানিয়েছিলেন। কুশিকও টানলেন। শুধু যে শাপের ভয়ে তাঁরা এ রকম অত্যাচার সহ্য করতেন, তা মনে হয় না। বোধহয় আরও কোন কারণ ছিল।

গুরুজী বললেন: রাজারাণী-বাহিত রথের পিছনে চলল শোকার্ত পুরবাসিগণ। ঋষির কশাঘাতে যখন রাজা ও রাণীর দেহ ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল, তখন প্রজাবৃন্দের দুঃখের আর সীমা ছিল না। কিন্তু প্রতিবাদ করবার উপায় নেই। ঋষি ক্রুদ্ধ হলে অনর্থ হবে। শেষ পর্যন্ত এই পরীক্ষাতেও কুশিক উত্তীর্ণ হলেন। রাজার অজস্র ধনরত্ন দান করে ঋষি সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, বর নাও।

তারপরে দুজনের দেহ হাত দিয়ে স্পর্শ করলেন। তাঁদের শ্রান্তি ও বেদনা নিমেষে দূর হয়ে গেল।

রাজা বললেন, আর আমাদের প্রার্থনার কিছু নেই।

চ্যবন বললেন, তোমরা দুঃখিত হয়ো না। কাল সকালে তোমরা গঙ্গার তীরে আমার সঙ্গে দেখা করতে এস।

পরদিন সকালে রাজা ও রাণী গঙ্গার তীরে গিয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন। দেখলেন, সেখানে গন্ধর্ব নগরের মতো অপরূপ সুন্দর এক নগর, পর্বত ও সরোবরে প্রাসাদ ও উদ্যানে মনোহরণ করছে। কুশিক ভাবলেন, আমি কি অমরাবতীতে এসেছি, না স্বপ্ন দেখছি! তারপরেই সব অদৃশ্য হয়ে গেল। পড়ে রইল সেই গঙ্গার নির্জন তীর। রাজা তাঁর রাণীকে বললেন, তপোবলেই এই কাজ সম্ভব, তপস্যাই শ্রেষ্ঠ। রাজ্যলাভের চেয়ে ব্রাহ্মণত্ব লাভই বেশি দুর্লভ।

চ্যবন তাঁদের ডেকে বললেন, পরীক্ষায় তোমরা উত্তীর্ণ হয়েছ, এবারে বর নাও।

রাজা কুশিক বললেন, আপনার ক্রোধে আমরা দগ্ধ হই নি, এতেই আমরা কৃতার্থ। শুধু এইটুকুই জানবার বাসনা যে কী অভিপ্রায়ে এই পরীক্ষা নিলেন।

চ্যবন সত্য কথা স্বীকার করলেন, বললেন, আমি ব্রহ্মার কাছে শুনেছিলাম যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বিরোধের ফলে কুল বর্ণসংকর হবে। তাই তোমার বংশ দগ্ধ করবার জন্য ছিদ্রান্বেষণে এসেছিলাম। কিন্তু তোমাদের উৎপীড়ন করে ব্যর্থ হয়েছি, আর গুণে মুগ্ধ হয়েছি। তোমাদের জন্য স্বর্গসুখের ব্যবস্থা করেছিলাম। এবারে আশীর্বাদ করছি, তোমার মনোরথ পূর্ণ হবে, তোমার বংশে জন্ম গ্রহণ করে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করবেন। এই বলে চ্যবন তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়লেন।

তাউজী বললেনঃ আপনার কথায় একটা নতুন জিনিষ জানলাম।

গুরুজী জিজ্ঞাসা করলেনঃ কী?

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বিরোধের কথা।

গুরুজী বললেনঃ পরবর্তী কালে এই বিরোধ খুবই প্রবল হয়ে উঠেছিল। কৃতবীর্য রাজার বংশধরেরা ভার্গবদের হত্যা করে। ভৃগুর মতো তাঁর বংশে ঋচীকও ক্ষত্রিয় দমনের জন্য ধনুর্বেদ বিদ্যা আয়ত্ত করেন। তারপর কার্তবীর্যের সঙ্গে পশুরামের যুদ্ধ। তাঁর পুত্রদের হাতে জমদগ্নির হত্যাকাণ্ড, এবং এই রাগে পরশুরামের একুশ বার ক্ষত্রিয় দমন আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। এই সব ঘটনা থেকে মনে হয় যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বিরোধ এক সময় দীর্ঘকাল ধরে চলেছিল, এবং তারই জন্য ব্রাহ্মণদের অস্ত্র শিক্ষা করতে হয়েছিল। পরে আমরা সে কথায় আসব।

গুরুজী চ্যবনের গল্পই বলতে লাগলেন। চ্যবন ও নহুষের গল্প। বললেনঃ চ্যবন বারো বৎসর গঙ্গা-যমুনার জলে বাস করে তপস্যা করেছিলেন। সে সময় তিনি সকল প্রাণীর এমন বিশ্বাসভাজন হয়েছিলেন যে মৎস্যরা নির্ভয়ে তাঁর মুখের কাছে আসত। একদিন ধীবররা জাল ফেলে অনেক মাছ তুলল, তার সঙ্গে ঋষিও জালে আটকা পড়লেন। তাঁর জটা-শ্মশ্রুর পিঙ্গল রঙ, দেহ শৈবাল

ও শম্বুক মণ্ডিত। মাছের জন্য মুনির দুঃখ দেখে জেলেরা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল, বলল: আমরা আপনার কী প্রিয় কার্য করতে পারি বলুন।

চ্যবন বললেন: এই মৎস্যদের সঙ্গে আমি বাস করেছি, আমি এদের ত্যাগ করতে পারব না। এদের সঙ্গে তোমরা আমাকেও বিক্রয় কর, নতুবা আমাকে এদের সঙ্গেই প্রাণত্যাগ করতে হবে।

জেলেরা ভয় পেয়ে রাজা নহুষের নিকট গিয়ে সমস্ত ঘটনা জানাল। নহুষ তখনি তাঁর পুরোহিত ও অমাত্যদের সঙ্গে চ্যবনের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। বললেন: আপনার কী প্রিয়কার্য করতে পারি আদেশ করুন। ঋষি বললেন, এই শ্রান্ত মৎস্যজীবীদের তুমি মৎস্যের মূল্য দাও। আমারও মূল্য দিও।

নহুষ জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার জন্য কত মূল্য দেব? সহস্র মুদ্রা, লক্ষ মুদ্রা, কোটি মুদ্রা, সমগ্র রাজ্য?

চ্যবন বললেন, না, আমার যোগ্য মূল্য হল না।

এই সময় এক তপস্বী ব্রাহ্মণ এসে বললেন, মহারাজ, গো-ব্রাহ্মণ অমূল্য। আপনি এই ব্রাহ্মণের মূল্য একটি গাভী দিন।

এই মূল্য পেয়ে চ্যবন সন্তুষ্ট হলেন। নহুষকে আশীর্বাদ করে নিজের আশ্রমে ফিরে গেলেন।

শকুন্তলাদির দিকে তাকিয়ে গুরুজী বললেন: এ সব গল্প টুকে নেবার কোন প্রয়োজন নেই। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে বিস্তারিত ভাবে লেখা আছে।

আমি তাকিয়ে দেখলাম যে শকুন্তলাদি কিছু টুকে রাখছিলেন। গুরুজীর কথায় মুখ তুলেই যেন লজ্জা পেলেন। কোন উত্তর না দিয়ে খাতা বন্ধ করে ফেললেন।

গুরুজী বললেন: চ্যবন ও সুকন্যার গল্প আছে বনপর্বে। নর্মদার নিকট বৈদূর্য পর্বতে চ্যবন দীর্ঘ কাল ধরে তপস্যা করছিলেন।

তাঁর দেহ বল্মীক ও লতায় আবৃত হয়ে গিয়েছিল। তাঁকে দেখে আর চেনা যাচ্ছিল না। এমন সময় একদিন সেখানে রাজা শর্যাতি তাঁর চার হাজার স্ত্রীকে নিয়ে বিহার করতে এলেন। সঙ্গে সুন্দরী কন্যা সুকন্যা। বেড়াতে বেড়াতে সুকন্যা সেই বল্মীক স্তূপ দেখতে পেলেন, তার ভিতর থেকে দুটি উজ্জ্বল বস্তু দেখা যাচ্ছে। কৌতূহল বশে সুকন্যা একটি কাঁটা দিয়ে সে দুটি বিদ্ধ করলেন। সে দুটি অন্য কিছু নয়, চ্যবনের দুই চক্ষু। যন্ত্রণা পেয়ে ঋষি ক্রুদ্ধ হলেন এবং রাজার সৈন্যদের মলমূত্র রুদ্ধ করে দিলেন। সকলের কষ্ট দেখে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, চ্যবন মুনির কেউ অপকার করেনি তো? সেই বৃদ্ধ ক্রোধী ঋষি এখানে তপস্যা করেন।

গুরুজী বললেন: রাজার এই প্রশ্নে আমরা চ্যবনের চরিত্রের একটা পরিচয় পাই। বৃদ্ধ বয়সেও চ্যবন ক্রোধী ছিলেন। কুশিককে যখন পরীক্ষা করেছিলেন, তখন তাঁকে দুর্বাসার মতো খামখেয়ালী মনে হয়েছিল। তাঁর ক্রোধকে সবাই ভয় পেত। শুধু রাজা ও রাণী নন, পুরবাসীরাও রাজারাণীর দুঃখ দেখেও কোন প্রতিবাদ করতে সাহসী হয় নি। বৃদ্ধ বয়সেও আমরা তাঁর রাগ দেখতে পাই। রাজা শর্যাতি তাঁর রাগের কথা অবহিত আছেন। সৈন্যদের কষ্ট দেখে প্রথমেই তাঁর চ্যবনের কথা মনে হয়েছে।

তাউজী বললেন: রাগ তো ব্রাহ্মণের গুণের কথা নয়।

গুরুজী বললেন: কিন্তু ব্রাহ্মণের রাগই যেন আমরা বেশি দেখতে পাই। এই রাগের ভয়ে আর সকলে তটস্থ হয়ে থাকত। ব্রাহ্মণের রাগ থেকে শুধু রাজা নয় দেবতারাও রেহাই পান নি। থাক সে কথা।

তারপর বললেন: রাজার কথা শুনে সুকন্যা ভয় পেলেন বললেন, বল্মীক স্তূপে আমি একজোড়া খদ্যোত দেখেছিলাম। তাতে আমি কাঁটা বিঁধিয়ে দিয়েছি।

রাজা বললেন, সর্বনাশ! চল ঋষির কাছে।

তারপর চ্যবনের কাছে গিয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন, বললেন, আমার বালিকা কন্যা না জেনে আপনাকে কষ্ট দিয়েছে, তাকে আপনি ক্ষমা করুন।

ঋষি বললেন, তোমার কন্যা অহংকারে ও অবজ্ঞায় এমন কাজ করেছে। আমার হাতে তাকে সম্প্রদান করলে আমি ক্ষমা করতে পারি।

ঋষির প্রস্তাব শুনে রাজা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। মুখ লুকিয়ে কাঁদলেন সুকন্যার মা। কিন্তু রাজী না হয়ে উপায় নেই, ঋষির ক্রোধে সর্বনাশ হয়ে যাবে। মনের ভাব গোপন করে রাজা শর্যাতি বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত চ্যবন ঋষির হাতেই নিজের প্রাপ্তযৌবনা সুন্দরী কন্যা সমর্পণ করলেন।

গুরুজী বললেন : সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে তপস্বী স্বামী লাভ করে সুকন্যা সুখী হয়েছিলেন। রাজৈশ্বর্য ত্যাগ করে দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে বৃদ্ধ পতির পরিচর্যায় তিনি ডুবে গেলেন। তাঁর অন্তরে যে কোন অতৃপ্তি ছিল না তার পরিচয় আমরা পেয়েছি। সে বড় কঠিন পরীক্ষা, এমন পরীক্ষার জন্য খুব কম নারীকেই মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়।

একদিন স্বর্গ থেকে অশ্বিনীকুমারদ্বয় চ্যবনের আশ্রমের নিকট বেড়াতে এসেছিলেন। বিশ্ববিদিত তাঁদের রূপের খ্যাতি। কিন্তু সুকন্যার রূপ দেখে তাঁরা মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সুকন্যা তখন স্নানান্তে নগ্নদেহে ছিলেন। অশ্বিনীকুমারেরা তাঁর নিকটে গিয়ে পরিচয় জেনে নিলেন। তারপর এক অদ্ভুত প্রস্তাব করলেন, বললেন : তোমার এই অপরূপ রূপ যৌবন কেন ব্যর্থ হতে দিচ্ছ! বৃদ্ধ দরিদ্র ঋষি তোমাকে কিছুই দিতে পারবেন না, তুমি আমাদের একজনকে বরণ কর।

অহল্যার মতো সুকন্যার মতিভ্রম হল না। স্বামীর সেবায় চিত্ত তাঁর স্থির হয়ে আছে। দৃঢ় ভাবে বললেন, তা হয় না। আমার

স্বামীতেই আমি অনুরক্তা। অশ্বিনীকুমারেরা তাঁর দৃঢ়তা দেখে বললেন, তবে এক কাজ কর। আমরা স্বর্গের চিকিৎসক, তোমার স্বামীকে আমরা নবযৌবন দান করব, তারপর তুমি আমাদের একজনকে গ্রহণ ক'রো।

সুকন্যা চ্যবনকে এই প্রস্তাবের কথা নিবেদন করলেন। এক কথায় ঋষি রাজী হয়ে গেলেন।

তাউজী আশ্চর্য হয়ে বললেন ঃ সে কি! এ তো কোন শাস্ত্র-সম্মত প্রস্তাব নয়!

গুরুজী বললেন ঃ তা নয় বলেই তো জানি।

তাউজী জোর দিয়ে বললেন ঃ নিশ্চয়ই নয়। একজনের বিবাহিত পত্নী আর একজনকে কিছুতেই গ্রহণ করতে পারে না। চন্দ্র যখন বৃহস্পতির পত্নী তারাকে হরণ করে নিয়ে গেলেন, তখন তারার মতামত কেউই জানতে চান নি। স্বামীকে পরিত্যাগ করে অন্য পুরুষের কাছে যাবার অধিকার হিন্দু নারীর কোন কালে ছিল না।

তাউজী বোধ হয় উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। তাই দেখে গুরুজী হাসলেন, বললেন ঃ ভয় নেই। সুকন্যা অশাস্ত্রীয় কাজ কিছুই করেন নি। অশ্বিনীকুমারদের প্রস্তাবে চ্যবন রাজী হতেই তাঁরা ঋষিকে নিয়ে সরোবরের জলে ডুব দিলেন। পরের মুহূর্তেই যখন তাঁরা জল থেকে উঠলেন, তখন তিনজনেরই এক রূপ এক বেশ, চ্যবনকে আর চেনবার উপায় নেই। তাঁরা বললেন, এবারে আমাদের একজনকে বরণ কর।

কিন্তু কী আশ্চর্য! সুকন্যা তাঁর স্বামীকে চিনে তাঁকেই বরণ করলেন।

অশ্বিনীকুমারদেরও হতাশ হতে হল না। ঋষি প্রসন্ন হয়ে বললেন, আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আপনারা আমাকে রূপ যৌবন দিয়েছেন, আমার স্ত্রীকেও হারাতে হল না। কাজেই

প্রতিদানে আমি আপনাদের সোমপায়ী করব। ইন্দ্রের সামনেই আপনারা সোমপান করবেন।

তাউজী বললেন ঃ ইন্দ্রের সামনে সোমপান কি একটা সম্মানের কাজ ?

গুরুজী হেসে বললেন ঃ রাজার সঙ্গে একসঙ্গে বসে মদ খাবে, সে তো সম্মানেরই ব্যাপার। ইন্দ্রের এতে মহা আপত্তি ছিল। সে কথা এখনি বলছি।

জামাতা চ্যবনের অনুরোধে রাজা শর্যাতি এক বিরাট যজ্ঞ করলেন। দেবতাদের সঙ্গে অশ্বিনীকুমাররাও এলেন। সেইখানে চ্যবন যখন সোমরসের পাত্র অশ্বিনীকুমারদের দেবার জন্য হাতে নিলেন, তখন ইন্দ্র আর নীরব থাকতে পারলেন না। বলে উঠলেন, এঁরা সোমপানের অধিকারী নন, দেবতাদের চিকিৎসক ও আমার কর্মচারী মাত্র। মর্ত্যে মানুষের মধ্যে এঁরা বিচরণ করে বেড়ান।

দেবরাজের দিকে তাকিয়ে চ্যবন একটুখানি অবজ্ঞার হাসি হাসলেন, কিন্তু নিজের কাজে নিরস্ত হলেন না। ইন্দ্র তখন বজ্র নিক্ষেপের জন্য উদ্যত হলেন ; কিন্তু সবিস্ময়ে দেখলেন যে তাঁর বাহু স্তম্ভিত হয়ে গেছে, উদ্যত বজ্র তিনি নিক্ষেপ করতে পারলেন না।

চ্যবন মন্ত্রপাঠ করে অগ্নিতে আহুতি দিলেন। অগ্নি থেকে তখনই এক মহাকায় কৃত্যা উত্থিত হল।

কৃত্যা কী ?

অভিচার ক্রিয়ার জন্য দেবতা বিশেষ। কিন্তু ঘোর দর্শন। এই কৃত্যার নাম মদ। মুখব্যাদান করে মদাসুর ইন্দ্রকে গ্রাস করতে গেল। ইন্দ্র ভয় পেয়ে নিজের ঠোঁট চাটলেন। তাঁর হাত নাড়বার ক্ষমতা নেই। কাজেই চ্যবনকে মিনতি করে বললেন, আপনি প্রসন্ন হয়ে আমাকে রক্ষা করুন। আজ থেকে অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ও সোমপানের অধিকারী হবেন।

সন্তুষ্ট হয়ে চ্যবন ইন্দ্রের বাহু মুক্ত করলেন। আর মদাস্থরকে বিভক্ত করে সুরা নারী দ্যূত ও মৃগয়ায় স্থাপিত করলেন। শর্যাতির যজ্ঞ শেষ হল। সুকন্যাকে নিয়ে চ্যবন আবার অরণ্য আশ্রমে ফিরে গেলেন।

দেবতার উপরে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য এই কাহিনীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এর পরে রুরু ও প্রমদ্বরার কাহিনী। মহাভারতের আদি পর্বে ফিরে যেতে হবে।

চ্যবন ও সুকন্যার পুত্র প্রমতি। তাঁর পুত্র রুরু। রুরুর মায়ের নাম ঘৃতাচী। স্থূলকেশ ঋষির আশ্রমে প্রমদ্বরা নামে এক কন্যাকে দেখে রুরু মুগ্ধ হয়েছিলেন। প্রমদ্বরার জন্মবৃত্তান্ত শকুন্তলার মতো। তিনিও অপ্সরা মেনকার কন্যা, গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসু তাঁর পিতা। কন্যার জন্মের পরে সেই নির্লজ্জ অপ্সরা তাকে নদীর তীরে পরিত্যাগ করে পালিয়ে যায়। স্থূলকেশ ঋষি এই শিশুটি দেখতে পেয়ে নিজের আশ্রমে এনে মানুষ করলেন। রূপে গুণে ও স্বভাবে সকল প্রমদার শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠলেন বলে ঋষি তাঁর নাম রাখলেন প্রমদ্বরা। রুরুর মনোভাব জানতে পেরে তাঁর পিতা প্রমতি স্থূলকেশের নিকট প্রস্তাব আনলেন। স্থূলকেশ রুরুকে তাঁর কন্যা দানে সম্মত হলেন।

কিন্তু বিবাহের কিছু পূর্বে এক দুর্ঘটনা ঘটল। সখীদের সঙ্গে খেলার সময় প্রমদ্বরা একটি সুপ্ত সর্পের দেহে পা দিয়ে ফেলেছিলেন। সেই সাপের দংশনে তাঁর মৃত্যু হল। বনবাসী ব্রাহ্মণেরা সবাই কাঁদতে লাগলেন। আর শোকার্ত রুরু গভীর অরণ্যে গিয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। বললেন, ধর্মে যদি আমার মতি থাকে, যদি আমি গুরুজনের সেবা ও ব্রত পালন করে থাকি, যদি আমার তপস্যায় কোন ফললাভ হয়ে থাকে, তবে প্রমদ্বরার যেন জীবনলাভ হয়।

দেবতাদের দয়া হল, তাঁরা রুরুর নিকট দূত পাঠালেন। দেবদূত বললেন, বৎস, প্রমদ্‌বরার আয়ু শেষ হয়েছে বলেই তার মৃত্যু হয়েছে। তুমি যদি তোমার অর্ধেক আয়ু তাকে দান কর, তাহলে সে জীবন পেতে পারে।

রুরু তখনই সম্মত হয়ে বললেন, আমি তাই দিলাম।

প্রমদ্‌বরার পিতা বিশ্বাবসু এই প্রস্তাব নিয়ে যমের কাছে গেলেন। যম রাজী হলেন। তারপরেই প্রমদ্‌বরা যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠলেন। রুরুর বিবাহ হল প্রমদ্‌বরার সঙ্গে।

রুরুর গল্প এইখানেই শেষ হয় নি। সাপের উপর তাঁর মহা আক্রোশ জন্মেছিল। যেখানে সেখানে তিনি সাপ মেরে বেড়াতেন। একদিন একটি ডুণ্ডুভ সাপ দেখে তাকে মারতে উঠলেন।

গোখরো কেউটে প্রভৃতি সাপের নাম আমি শুনেছি, কিন্তু ডুণ্ডুভ নাম কখনও শুনি নি। গুরুজীকে কোন প্রশ্ন করবার সাহস আমার নেই। কিন্তু তাউজী বোধহয় আমাদের জন্যেই জিজ্ঞাসা করলেন : ডুণ্ডুভ আবার কোন্ জাতের সাপ?

গুরুজী যে বর্ণনা দিলেন, তার মানে বুঝলাম ঢোঁড়া সাপ।

বললেন : সেই বৃদ্ধ ঢোঁড়া সাপকে মারবার জন্য লাঠি তুলতেই সাপ বলে উঠল, আমাকে আপনি কোন্ অপরাধে মারছেন?

পরে এই সাপের পরিচয় পাওয়া গেল। রুরুর প্রশ্নের উত্তরেই সাপ বলল, একদা আমি সহস্রপাৎ নামে ঋষি ছিলাম। খগম নামে আমার এক বন্ধু ব্রাহ্মণের শাপে আজ আমার এই দশা। আমারও দোষ ছিল। ব্রাহ্মণ যখন হোম করছিলেন, আমি তখন তাঁকে একটি তৃণের সর্প দেখিয়েছিলাম। ভয়ে তিনি মূর্ছা যান। তারপর জ্ঞান হলে আমাকে শাপ দিলেন, নির্বিষ সাপ নির্মাণ করে তুমি যেমন আমাকে ভয় দেখালে, তেমনি তুমি এক নির্বিষ সাপে পরিণত হবে। আমি তাঁকে শাপ প্রত্যাহার করবার জন্য অনুনয়-

বিনয় করতে লাগলাম, বললাম, বন্ধু বলেই আমি এই পরিহাস করেছি। তখন তিনি আমাকে বললেন যে রুরুর সঙ্গে সাক্ষাতের পর আমি শাপমুক্ত হব। আজ আমার মুক্তির দিন।

তারপর শাপমুক্ত হয়ে সহস্রপাৎ রুরুকে উপদেশ দিলেন।

অহিংসা পরমোধর্মঃ সর্বপ্রাণভৃতাং স্মৃতঃ।

অহিংসাই সর্ব প্রাণীর পরম ধর্ম।

একুশ

পরদিন দুপুর বেলায় সুপ্তি আমার সামনে এসে বসল। আমি তখন মহাভারতখানা উল্টেপাল্টে দেখছিলাম। প্রথমটায় তাকে দেখতে পাই নি, তার কথা শুনে মুখ তুলে তাকালাম। সুপ্তি বলল : তোমাকে আর বিনায়ক বলে ডাকা চলবে না।

কেন ?

বিনায়কদা বলতে হবে।

চেনেলু তার খাটে শুয়ে চোখ বুজে পা দোলাচ্ছিল, এবারে পা দোলানো বন্ধ করে স্থির হয়ে শুল।

জিজ্ঞাসা করলাম : কারও হুকুম, না নিজের খেয়াল ?

সুপ্তি বলল : আশ্রমের নিয়ম হল, যারা লিখছে তাদের খাতির করতে হবে।

আর যারা লিখছে না ?

তাদের ?

বলে সুপ্তি তার দুটো হাত মুঠো করে কিল মারার ভঙ্গি করল।

আমি চেনেলুর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সে আড়চোখে সুপ্তির এই ভঙ্গিটা দেখে নিয়েছে। সুপ্তিও খুশী হয়েছে তার কৌতূহল দেখে। বলল : তুমি কী করছ তাই দেখতে এলাম।

এও কি আশ্রমের নিয়ম নাকি !

কে পড়ছে, আর কে পড়ছে না, তা দেখতে হবে তো !

তার পরে কী করতে হবে ?

সুপ্তি সকৌতুকে উত্তর দিল : যারা শুধু পড়ে পড়ে ঘুমোয় তাদের নামে রিপোর্ট করতে হবে।

তাউজীর কাছে তো !

উহুঁ।

তবে?

মাষ্টার সাহেবের কাছে।

পাধ্যে আমাদের সংস্কৃতের মাষ্টার। কিন্তু চেনেলু তার নাম শুনলেই চটে যায়। আজ সে ঘুমের ভান করে শুয়ে রইল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম: তাউজী কী করছেন?

সুপ্তি সংক্ষেপে বলল: গুরুজীর ঘরে।

কী করছেন জিজ্ঞেস করছি।

ঋষিদের নামের তালিকা করছেন।

সে আবার কী?

যাঁদের কথা বলা হয় নি, তাদের নামের তালিকা। তোমরা তো নিজেরা খাটবে না, শোনা কথা লিখবে, আর না হয় খাটে শুয়ে পা দোলাবে।

মনে মনে আমি স্বীকার করলাম যে তাউজী এখন খুব প্রয়োজনীয় কাজ করছেন। আমরা এখন ভৃগুবংশের কথা শুনছি। শুক্রাচার্য ভৃগুর এক পুত্র। ঋচীক জমদগ্নি পরশুরামের জন্মও এই বংশে। এঁদের কথা শেষ হলে নারদের কথা। নারদের কথা আমরা দেবতার কথাতেও শুনেছি। তাঁর বংশ নেই, তিনি বিবাহ করেন নি। তারপর যে সব ছোট বড় ঋষি আছেন, তাঁদের মধ্যে অগস্ত্য ও বাল্মীকির নাম আমার মনে পড়ছে। আর কে কে আছেন, তা বলতে পারব না।

সুপ্তি বলল: তোমাদের সঙ্গে আর পারি না। সুযোগ পেলেই তোমরা ঘুমিয়ে পড়।

আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। কথাটা সে আমাকেই বলে উঠে গেল।

আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলাম যে চেনেলু আবার পা দোলাতে

শুরু করেছে। বলল ঃ দেখলে তো, কী সাংঘাতিক মেয়ে। বাপের কাছে সব লাগাবে।

বললাম ঃ তাতে কার কী এসে যায়! আমরা তো পরীক্ষা পাস করবার জন্যে আসি নি, এসেছি কিছু জানবার জন্যে। সন্ধ্যাবেলায় উপাসনার মন্দিরে বসে যেটুকু জানা যায়, তাতেই আমি সন্তুষ্ট।

চেনেলু বলল ঃ তোমার কথা আলাদা, তুমি তো লিখতে শুরু করেছ। আমাকে হয়তো একদিন এরা তাড়িয়ে দেবে।

কেন তাড়াবে ?

আমার মতো অমনোযোগী ছাত্রের প্রয়োজন তাদের নেই।

চেনেলুকে আজ আবার বিষণ্ণ মনে হল। আনন্দের প্রতিচ্ছবি তার মুখ থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। কেন হয়েছে, তার কারণ আমি জানতে পারি নি।

সন্ধ্যাবেলায় গুরুজী যে শুক্রাচার্যের কথা বলবেন, তা আমাদের জানা ছিল। বৃহস্পতির প্রসঙ্গে শুক্রাচার্যের অনেক কথাই আমরা শুনেছি। সে সময় আমার ধারণা হয়েছিল যে বৃহস্পতির চেয়ে তিনি কোন অংশে ছোট ছিলেন না। বৃহস্পতি দেবতাদের গুরু ছিলেন, কিন্তু দেবতাদের রক্ষার জন্য তাঁকে কোন চেষ্টা করতে হত না। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তাঁদের সহায় ছিলেন, সকল রকমের বিপদ থেকে সবাইকে রক্ষা করতেন। কিন্তু অসুরদের সহায় কেউ ছিলেন না। গুরু শুক্রাচার্যকেই সব দিক সামলাতে হত। শিষ্যদের জন্য তিনি বারে বারে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত অসুরদের বাঁচাবার জন্য তিনি মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র লাভ করেছিলেন। শিষ্যদের কল্যাণের জন্য তিনি চিন্তা করতেন, তাদের সুখ দুঃখ নিজের বলে ভাবতেন। এমন গুরু পেয়ে অসুররা ধন্য হয়েছিল।

গুরুজী বললেনঃ শুক্রাচার্য ছিলেন তপস্বী পুরুষ। ভৃগুর উপযুক্ত পুত্র। পুলোমা তাঁর মাতা ছিলেন বলে আমি মনে করি। পুলোমা দৈত্যের কন্যা, গুরুর অবর্তমানে দৈত্যরা তাঁরই কাছে এসে আশ্রয় নিত। একবার এই রকম আশ্রয় দেবার জন্য দেবতারা শুক্রাচার্যের মায়ের আশ্রমে এসে দৈত্যদের আক্রমণ করলেন। বিষ্ণু তাঁর সুদর্শন চক্র নিক্ষেপ করেছিলেন, তাতে দৈত্যগুরুর মাতা নিহত হলেন। শুক্রাচার্য তখন তপস্যা করতে গিয়েছিলেন। স্ত্রীর মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে ভৃগু এসে উপস্থিত হলেন এবং শাপ দিলেন বিষ্ণুকে, সাতবার তোমার নরজন্ম হবে এবং তোমাকেও পত্নীর বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। তারপরে নিজের স্ত্রীকে তিনি বাঁচিয়ে তুললেন।

একটু থেমে গুরুজী বললেনঃ বিষ্ণু ভৃগুর জামাতা, এবং এই সূত্রে শুক্রাচার্য তাঁর শ্যালক। কিন্তু এঁদের মধ্যে কোন ঘনিষ্ঠতা আমরা দেখতে পাই নে। তার একমাত্র কারণ আমি এই অনুমান করি যে বিষ্ণুর স্ত্রী লক্ষ্মী ও শুক্রাচার্য এক মায়ের সন্তান নন। লক্ষ্মী খ্যাতির কন্যা, আর শুক্র পুলোমার পুত্র। খ্যাতি ঋষির কন্যা, আর পুলোমা দৈত্যকুলোদ্ভবা। দৈত্যরা শুক্রাচার্যের মাতৃকুল। শুক্রাচার্য যখন তপস্যায় যেতেন তখন তারা এসে তাঁর মায়ের কাছে আশ্রয় নিত। শুক্রাচার্যের দৈত্যপ্রীতি স্বাভাবিক, কিন্তু দেবদ্বেষী হয়েছিলেন বিষ্ণুর জন্য। বিষ্ণুর নারীহত্যা তিনি কোনদিন সমর্থন করতে পারেন নি।

এই ঋষির নাম শুক্র কেন হয়, তার একটি কাহিনী আছে। তিনি একদিন যোগবলে কুবেরকে বন্ধ করে তাঁর ধনরত্ন হরণ করেন। কুবের মহাদেবের নিকট গিয়ে নালিশ করলেন। শূল নিয়ে মহাদেব এলেন ঋষিকে বধ করতে। আত্মরক্ষার জন্য ঋষি শূলের অগ্রভাগে আশ্রয় নিয়েছিলেন, কিন্তু মহাদেব তাঁকে ধরে গ্রাস করে ফেললেন। এর পরে মহাদেব তপস্যা আরম্ভ করলেন।

শুরু করেছে। বলল : দেখলে তো, কী সাংঘাতিক মেয়ে। বাপের কাছে সব লাগাবে।

বললাম : তাতে কার কী এসে যায়! আমরা তো পরীক্ষা পাস করবার জন্যে আসি নি, এসেছি কিছু জানবার জন্যে। সন্ধ্যাবেলায় উপাসনার মন্দিরে বসে যেটুকু জানা যায়, তাতেই আমি সন্তুষ্ট।

চেনেলু বলল : তোমার কথা আলাদা, তুমি তো লিখতে শুরু করেছ। আমাকে হয়তো একদিন এরা তাড়িয়ে দেবে।

কেন তাড়াবে?

আমার মতো অমনোযোগী ছাত্রের প্রয়োজন তাদের নেই।

চেনেলুকে আজ আবার বিষণ্ণ মনে হল। আনন্দের প্রতিচ্ছবি তার মুখ থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। কেন হয়েছে, তার কারণ আমি জানতে পারি নি।

সন্ধ্যাবেলায় গুরুজী যে শুক্রাচার্যের কথা বলবেন, তা আমাদের জানা ছিল। বৃহস্পতির প্রসঙ্গে শুক্রাচার্যের অনেক কথাই আমরা শুনেছি। সে সময় আমার ধারণা হয়েছিল যে বৃহস্পতির চেয়ে তিনি কোন অংশে ছোট ছিলেন না। বৃহস্পতি দেবতাদের গুরু ছিলেন, কিন্তু দেবতাদের রক্ষার জন্য তাঁকে কোন চেষ্টা করতে হত না। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তাঁদের সহায় ছিলেন, সকল রকমের বিপদ থেকে সবাইকে রক্ষা করতেন। কিন্তু অসুরদের সহায় কেউ ছিলেন না। গুরু শুক্রাচার্যকেই সব দিক সামলাতে হত। শিষ্যদের জন্য তিনি বারে বারে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত অসুরদের বাঁচাবার জন্য তিনি মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র লাভ করেছিলেন। শিষ্যদের কল্যাণের জন্য তিনি চিন্তা করতেন, তাদের সুখ দুঃখ নিজের বলে ভাবতেন। এমন গুরু পেয়ে অসুররা ধন্য হয়েছিল।

গুরুজী বললেনঃ শুক্রাচার্য ছিলেন তপস্বী পুরুষ। ভৃগুর উপযুক্ত পুত্র। পুলোমা তাঁর মাতা ছিলেন বলে আমি মনে করি। পুলোমা দৈত্যের কন্যা, গুরুর অবর্তমানে দৈত্যরা তাঁরই কাছে এসে আশ্রয় নিত। একবার এই রকম আশ্রয় দেবার জন্য দেবতারা শুক্রাচার্যের মায়ের আশ্রমে এসে দৈত্যদের আক্রমণ করলেন। বিষ্ণু তাঁর সুদর্শন চক্র নিক্ষেপ করেছিলেন, তাতে দৈত্যগুরুর মাতা নিহত হলেন। শুক্রাচার্য তখন তপস্যা করতে গিয়েছিলেন। স্ত্রীর মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে ভৃগু এসে উপস্থিত হলেন এবং শাপ দিলেন বিষ্ণুকে, সাতবার তোমার নরজন্ম হবে এবং তোমাকেও পত্নীর বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। তারপরে নিজের স্ত্রীকে তিনি বাঁচিয়ে তুললেন।

একটু থেমে গুরুজী বললেনঃ বিষ্ণু ভৃগুর জামাতা, এবং এই সূত্রে শুক্রাচার্য তাঁর শ্যালক। কিন্তু এঁদের মধ্যে কোন ঘনিষ্ঠতা আমরা দেখতে পাই নে। তার একমাত্র কারণ আমি এই অনুমান করি যে বিষ্ণুর স্ত্রী লক্ষ্মী ও শুক্রাচার্য এক মায়ের সন্তান নন। লক্ষ্মী খ্যাতির কন্যা, আর শুক্র পুলোমার পুত্র। খ্যাতি ঋষির কন্যা, আর পুলোমা দৈত্যকুলোদ্ভবা। দৈত্যরা শুক্রাচার্যের মাতৃকুল। শুক্রাচার্য যখন তপস্যায় যেতেন তখন তারা এসে তাঁর মায়ের কাছে আশ্রয় নিত। শুক্রাচার্যের দৈত্যপ্রীতি স্বাভাবিক, কিন্তু দেবদ্বেষী হয়েছিলেন বিষ্ণুর জন্য। বিষ্ণুর নারীহত্যা তিনি কোনদিন সমর্থন করতে পারেন নি।

এই ঋষির নাম শুক্র কেন হয়, তার একটি কাহিনী আছে। তিনি একদিন যোগবলে কুবেরকে বন্ধ করে তাঁর ধনরত্ন হরণ করেন। কুবের মহাদেবের নিকট গিয়ে নালিশ করলেন। শূল নিয়ে মহাদেব এলেন ঋষিকে বধ করতে। আত্মরক্ষার জন্য ঋষি শূলের অগ্রভাগে আশ্রয় নিয়েছিলেন, কিন্তু মহাদেব তাঁকে ধরে গ্রাস করে ফেললেন। এর পরে মহাদেব তপস্যা আরম্ভ করলেন।

এক আধ দিনের তপস্যা নয়, দশ কোটি বৎসর মহাহ্রদের জলের মধ্যে তপস্যা করলেন। মহাদেবের পেটের মধ্যে বাস করে ঋষিও তপস্যার ফল পেলেন। এখন মুক্তির উপায়? পেটের ভিতর থেকে ঋষি কাতর প্রার্থনা করতে লাগলেন। মহাদেবের ক্রোধ তখন শান্ত হয়ে গেছে। বললেন, আমার শিশ্ন দিয়ে তুমি নির্গত হও। ঋষি তাই করলেন। সেই থেকে তাঁর নাম হল শুক্র।

শুক্রের প্রাণ ছিল শিষ্যগত। তাদের জন্য তিনি অনেক কষ্ট স্বীকার করেছিলেন। প্রহ্লাদের পৌত্র বলি যখন ত্রিলোকের অধিকারী, তখন বিষ্ণু বামন রূপে বলির যজ্ঞে এসে উপস্থিত হলেন। বলির গুরু শুক্রাচার্য বিষ্ণুর এই ছলনা বুঝতে পেরেছিলেন। বিষ্ণুর প্রতি বিদ্বেষ তাঁর তখনও জন্মায় নি। তার কারণ শুক্রের মাতাকে বিষ্ণু পরে হত্যা করেছিলেন। তবু শিষ্যকে রক্ষা করা তাঁর ধর্ম। সেই ধর্ম রক্ষা করতে গিয়ে তাঁর একটি চোখ অন্ধ হল।

তাউজী বললেন: গল্পটা বলবেন না?

গুরুজী বললেন: দেবতার কথায় এই গল্প বলেছি। বামন অবতারের গল্প।

তাউজী বললেন: তা বলেছেন, তবু এই প্রসঙ্গে আর একবার বললে মন্দ হত না।

গুরুজী হেসে বললেন: এ যে শিশুদের মতো কথা হল। একই রূপকথা ঠাকুমাকে বার বার বলতে হবে।

তাউজী বললেন: আপনার রূপকথা একবার শুনে মনে রাখা একেবারেই অসম্ভব।

গুরুজীও হেসে বললেন: বামনরূপী বিষ্ণু এসেছেন দৈত্যরাজ বলির যজ্ঞস্থলে। অশ্বমেধ যজ্ঞ শেষ করে বলি তখন দুহাতে দান করছেন। বামন বলির অনেক প্রশংসা করে ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করলেন, তাও নিজের পায়ের মাপের তিন পা। বলি বললেন, তোমার কথাগুলি প্রবীণ লোকের মতো, কিন্তু প্রার্থনা বড়ই সামান্য।

তুমি অনেক জমি এবং অনেক ধন চাও। আমি চাই না যে তোমাকে আর কখনও কারও কাছে প্রার্থী হয়ে যেতে হয়।

বামন বললেন, আমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু চাই না।

বলি বললেন, তবে তাই নাও।

শুক্রাচার্য বোধহয় এই সময়ে বুঝতে পারলেন যে এই বামন সাধারণ মানুষ নন, বিষ্ণু নিজে এসেছেন বামনরূপে বলিকে ছলনা করতে। বলিকে তিনি তিরস্কার করে বললেন, তুমি মূর্খ, তাই তুমি এই বামনের কথায় সম্মত হলে। যদি নিজের ভাল চাও তো এখনও বিরত হও।

বলি বললেন, কেন ?

শুক্রাচার্য বললেন, এই দান তুমি দিতে পারবে না। তারপর মিথ্যা বলার জন্য তোমার নরক ভোগ হবে। তার চেয়ে আমি যা বলি, তাই কর। পরিহাস-বৃত্তিরক্ষার মতো নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য মিথ্যা বললেও দোষ হয় না। তুমি এই দান অস্বীকার কর।

বলি বললেন, গুরুদেব, আপনার কথায় আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সংকল্প রক্ষা আমাকে করতেই হবে। ইনি আমাকে অন্যায় ভাবে ছলনা করতে পারেন, কিন্তু আমি সত্যভ্রষ্ট হতে পারব না।

শুক্রাচার্য এবারে ক্রুদ্ধ হলেন, বললেন, পাণ্ডিত্যাভিমানের জন্য তুমি আমার উপদেশ অমান্য করছ, অচিরে তুমি শ্রীভ্রষ্ট হবে।

বলি বললেন, প্রভু আপনার অভিশাপ আমি মাথা পেতে নিলাম।

তারপর তিনি বামনকে ভূমিদানের জন্য উদ্যত হলেন।

শিষ্যের কল্যাণের জন্য শুক্রাচার্য শান্ত থাকতে পারলেন না। মক্ষিকারূপে ভৃঙ্গারে প্রবেশ করে জল রোধ করলেন। বামন শুক্রাচার্যের অভিসন্ধি বুঝতে পেরে ভৃঙ্গারে কুশ চালিয়ে দিলেন। মক্ষিকারূপী শুক্রাচার্যের একটি চোখ কুশবিদ্ধ হয়ে নষ্ট হয়ে গেল।

এই পর্যন্ত বলে গুরুজী থেমেছিলেন। তাউজী বললেনঃ তারপর?

গুরুজী বললেনঃ শুক্রাচার্যের কথা এইখানেই শেষ, কিন্তু বলির কথার শেষ নয়। বলি যখন জলস্পর্শ করে বামনকে ভূমি দান করলেন, তখন বামনের রূপ পরিবর্তন হতে লাগল। তাঁর দেহ এমন বিরাট হল যে বলি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। তাঁর এক পদে বলির সমস্ত ভূমি আক্রান্ত হল, দ্বিতীয় পদে স্বর্গ হল অধিকৃত, তৃতীয় পদ রাখবার আর জায়গা রইল না। বামন বলিকে বললেন, বল এইবারে তৃতীয় পদ আমি কোথায় রাখব।

নির্বিকার চিত্তে বলি বললেন, প্রভু, আমি মিথ্যা বলি না। আপনি আমার সঙ্গে কপটতা করে থাকতে পারেন, কিন্তু আমি সত্যভ্রষ্ট হতে রাজী নই। আমি আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করব, আপনার তৃতীয় পদ আপনি আমার মাথায় রাখুন। বলে তাঁর মাথা নত করলেন। বামন তাঁর তৃতীয় পদ বলির মাথায় রাখলেন। বলি আশ্রয় পেলেন পাতালে।

গুরুজী খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেনঃ এই ঘটনায় কয়েকটি সত্য প্রকাশ পেয়েছে। প্রথম সত্য, ইন্দ্রের দুর্বলতা। বলি দশ যুগ স্বর্গরাজ্য অধিকার করে আছেন, তাঁকে দমন করার জন্য বিষ্ণুকে ছলনার আশ্রয় নিতে হল। দ্বিতীয় সত্য, দৈত্যরাজ বলির সত্যনিষ্ঠা, এই ছলনায় তাঁর চরিত্রই মহত্তর হয়ে উঠেছে। আর তৃতীয় সত্য, শুক্রাচার্যের শিষ্যপ্রীতি। বলিকে রক্ষা করবার জন্য তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সচেষ্ট ছিলেন। এবং এই ঘটনার পরেই শুক্রাচার্য কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হন।

বলি প্রহ্লাদের পৌত্র, তাঁর পিতার নাম বিরোচন। বাণ বলির পুত্র, তাঁর শত পুত্রের মধ্যে তিনিই জ্যেষ্ঠ। বলির পতনের পর ইন্দ্র আবার স্বর্গরাজ্য অধিকার করলেন। দেবতাদের শক্তি খর্ব করবার জন্য শুক্রাচার্য কৃতসংকল্প হলেন। তাঁর এমন কোন মন্ত্র

চাই যা দেবগুরু বৃহস্পতির অজ্ঞাত, সেই মন্ত্রের সাহায্যে তিনি অসুরদের জয় সুনিশ্চিত করবেন। শুক্রাচার্যের অক্লান্ত তপস্যা দেখে মহাদেব বললেন, সহস্র বৎসর ব্রহ্মচারী হয়ে অধোমুখে শুধু কুণ্ডের ধূমপান করে তপস্যা করতে হবে, তবেই তাঁর বাসনা পূর্ণ হতে পারে।

দৃঢ়চেতা শুক্রাচার্য বললেন, তাই করব।

তাঁর তপস্যা দেখে দেবতারা ভয় পেলেন। তাঁরা ভাবলেন, শুক্রাচার্য মন্ত্রলাভ করে ফেরবার আগেই অসুরদের শেষ করতে হবে। করলেনও তাই। দেবতারা অসুরদের আক্রমণ করলেন। গুরুর অভাবে অসুররা গুরুর মাতার নিকট গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। একটু আগেই আমি এই গল্প বলেছি। আশ্রমে ঢুকতে না পেরে বিষ্ণু সুদর্শন চক্রে নারীহত্যা করে অভিশপ্ত হলেন।

ওদিকে শুক্রাচার্যের তপস্যার কাল শেষ হয়ে আসছে। ইন্দ্র উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। এবং শেষ পর্যন্ত ঋষিকে ভোলাবার জন্য নিজের কন্যা জয়ন্তীকে তাঁর নিকট পাঠালেন। অনলস সেবায় জয়ন্তী শুক্রাচার্যের মন ভোলালেন। কিন্তু তপস্যার বিঘ্ন ঘটাতে পারেন নি। মহাদেবের নিকট তিনি প্রার্থিত বর লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। আর জয়ন্তীর অনুরোধে দশ বৎসর অদৃশ্য হয়ে তাঁর সঙ্গে সংসার করেছিলেন।

একটু বিশ্রাম নিয়ে গুরুজী বললেন: তপস্বী শুক্রাচার্যের স্ত্রীপুত্র পরিবার নিয়ে সংসার যাত্রার কোন সংবাদ আমাদের জানা নেই। দেবগুরু বৃহস্পতির কথা জানা আছে। আর জানা আছে দেবযানীর কথা। জয়ন্তীর সঙ্গে শুক্রাচার্য যে দশ বৎসর একত্র বাস করেছিলেন, সেই সময় এই কন্যার জন্ম হয়। শুক্রাচার্য তাঁকে মানুষ করেছিলেন। কচের কথায় দেবযানীর কথা বলেছি। যযাতির সঙ্গে বিবাহের কথাও বলেছি। মেনকা বিশ্বামিত্র তাঁদের কন্যা শকুন্তলাকে পরিত্যাগ করেছিলেন; কিন্তু শুক্রাচার্য তা

করেন নি, অপরিসীম স্নেহে কন্যা দেবযানীকে মানুষ করেছিলেন।

গুরুজী বললেন: দেবগুরু বৃহস্পতি শুক্রাচার্যের রূপ পরিগ্রহ করে যে ছলনা করেছিলেন, সে কথা আগে বলেছি।

আমাদের মনে সেই কথা ছিল। তাউজীও তাঁকে আর একবার এ গল্প বলবার জন্য অনুরোধ করলেন না।

গুরুজী বললেন: এক জায়গায় আমরা শুক্রাচার্যের রূপের বর্ণনা পেয়েছি। তাঁর দেহের বর্ণ ছিল হিমকুন্দ মৃণালের মতো। অবশ্য এই বর্ণনা পড়ে আমরা তাঁর রূপের কোন কল্পনা করতে পারি না।

শুক্রাচার্যের ক্রোধ আমরা অনেকবার দেখেছি। বলি তাঁর আদেশ অমান্য করায় তাঁকে তিনি শাপ দিয়েছেন, বৃহস্পতির ছলনায় অসুররা যখন তাঁকে চিনতে পারে নি তখনও তাদের শাপ দিয়েছেন, এমন কি কন্যা দেবযানীর অভিযোগে জামাতাকেও শাপ দিয়েছেন। কিন্তু প্রত্যেকবারই আমরা তাঁর স্নেহের পরিচয় পেয়েছি। বলির পতনের পর তিনি অন্যায়ের প্রতিকারের চেষ্টা করেছেন, শিষ্যদের দোষ নেই জেনে তাদের ক্ষমা করেছেন, আবার জামাতাকেও তিনি শাপমুক্ত হবার পথ বলে দিয়েছিলেন।

বিশ্বামিত্র বয়সে তাঁর চেয়ে ছোট, কিন্তু দুজনের মিল আছে অনেক জায়গায়। চরিত্রের দৃঢ়তায় ও কঠিন তপশ্চরণেই সবচেয়ে বেশি মিল। বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য যা করেছিলেন, শুক্রাচার্য তাঁর শিষ্যদের কল্যাণের জন্য তার চেয়ে কিছু কম করেন নি। ঋষিদের মধ্যে শুক্রাচার্য একটি বলিষ্ঠ নাম।

বাইশ

গুরুজী বললেন: শুক্রাচার্যে ভৃগু বংশ শেষ হয়ে যায় নি। ঔর্ব ঋচীক জমদগ্নি ও পরশুরামে এই বংশ আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তবে ঋচীক মুনিকে নিয়ে বিপদ বেধেছে। মহাভারতে আমরা তাঁকে ভৃগুর পুত্র রূপে দেখি, কালিকাপুরাণে দেখি ঔর্ব তাঁর পিতা। মহাভারতের আদি পর্বে আমরা ঔর্বের জন্মবৃত্তান্ত পাই।

ভার্গবরা ছিলেন কৃতবীর্য নামে এক রাজার পুরোহিত। তিনি তাঁদের প্রচুর ধনরত্ন দান করতেন। রাজার মৃত্যুর পরে তাঁর বংশধরদের অর্থাভাব উপস্থিত হল। তাঁরা ভার্গবদের কাছে গিয়ে প্রার্থী হলেন। বিপদ দেখে ভার্গবরা অনেকেই তাঁদের ধনরত্ন লুকিয়ে ফেললেন এবং সাহায্য করতে অপারক বলে জানালেন। একজন ক্ষত্রিয় এক ভার্গবের বাড়ির জমি খুঁড়ে ধন দেখতে পেয়ে বিপদ বাধালেন। বেপরোয়া ভাবে ব্রাহ্মণদের বধ করতে লাগলেন। ভয় পেয়ে ব্রাহ্মণীরা আত্মরক্ষার জন্য হিমালয়ে পালিয়ে গেলেন।

ক্ষত্রিয়দের আচরণ তখন অত্যন্ত নিষ্ঠুর আকার ধারণ করেছিল। গর্ভস্থ সন্তান তারা নষ্ট করবে ভয়ে এক ব্রাহ্মণী তাঁর গর্ভ উরুদেশে গোপন করলেন। ক্ষত্রিয়রা এ কথা জানতে পেরে যখন তাঁকে আক্রমণ করতে এল, তখন ব্রাহ্মণীর উরুভেদ করে এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হল। মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো দীপ্তিমান শিশুর তেজে ক্ষত্রিয়রা অন্ধ হয়ে গেল। এই শিশুরই নাম ঔর্ব। অন্ধ ক্ষত্রিয়রা তাঁর অনুগ্রহ ভিক্ষা করলে ঔর্ব তাদের দৃষ্টিশক্তি দান করেন।

বড় হয়ে তিনি তাঁর পিতৃপুরুষদের হত্যার প্রতিশোধ নেবার

জন্য তপস্যা আরম্ভ করেন। সকলে ভয় পেলেন যে তাঁর ক্রোধে পৃথিবী ধ্বংস হবে। তাই তাঁর পিতৃপুরুষেরা তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন যে তাঁদের মৃত্যুর জন্য ক্ষত্রিয়রা দায়ী নয়। ইচ্ছা করলে তাঁরা ক্ষত্রিয়দের রোধ করতে পারতেন। স্বর্গে যাবার জন্য তাঁরা ব্যস্ত হয়েছিলেন। আত্মহত্যায় স্বর্গলাভ সম্ভব নয় বলেই ক্ষত্রিয়দের হাতে তাঁরা জীবন দিয়েছেন। এঁদের অনুরোধেই ঔর্ব তাঁর ক্রোধাগ্নি সমুদ্রে নিক্ষেপ করলেন।

গুরুজী বললেন ঃ কালিকা পুরাণ কিংবা হরিবংশে পড়েছি যে ঋচীক এই ঔর্বের পুত্র।

তারপরেই তাউজীর দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ তোমরা ভাল করে দেখে নিও। তবে এ কথা থাকলেও সত্য বলে মেনে নেবার বাধা আছে। মহাভারতের বনপর্বে ঋচীকের যে কাহিনী আছে সেটিই আমার ঠিক বলে মনে হয়েছে।

তাউজী প্রশ্ন করলেন ঃ কেন ?

গুরুজী একটু ভেবে উত্তর দিলেন ঃ বিশ্বামিত্রের কথায় বোধহয় আমি আলোচনা করেছি। ঋচীক ঔর্বের পুত্র ধরে নিলে মানতে হয় যে তিনিই সন্তানলাভের জন্য চরু প্রস্তুত করেছিলেন। তাহলে তিনি নিজের স্ত্রী ও শাশুড়ীর জন্য এক সঙ্গে এ কাজ করতেন না এবং ভুল হবার সম্ভাবনাও থাকত না। পুরাণে আর কোন ঋষি নিজের স্ত্রীর জন্য চরু প্রস্তুত করেন নি। ভৃগু তাঁর পুত্রবধূর জন্য চরু প্রস্তুত করেছেন, এর মধ্যে আমি বেশি যুক্তি দেখি।

তাউজী বললেন ঃ ঋচীকের কাহিনী আপনি গোড়া থেকেই বলুন।

গুরুজী বললেন ঃ শুক্রাচার্যের মতো ঋচীকের জন্মবৃত্তান্তও আমরা কিছু পাই নে। ঋচীককে আমরা প্রথম দেখি সত্যবতীর পাণিপ্রার্থীরূপে। কান্যকুব্জের রাজা গাধির কন্যা সত্যবতী অপ্সরার মতো রূপবতী। ঋচীক সেই কন্যাকে বিবাহের প্রস্তাব

নিয়ে রাজার নিকট উপস্থিত হলেন। এই ব্যাপারে আমরা একটি সামাজিক রীতির কথা জানতে পারি। ঋষিকে রাজা বললেন, কৌলিক রীতি রক্ষার জন্য আপনি আমাকে এক সহস্র অশ্ব দিন। তাদের দেহ পাণ্ডু বর্ণ ও কানের এক দিক শ্যাম বর্ণ হবে।

তাউজী বললেন: এ আবার কী রকম প্রথা?

গুরুজী বললেন: আমার মনে হয়, এই প্রথার প্রচলন ছিল সামাজিক প্রয়োজনে। কন্যা দান করবার আগে কন্যার পিতা জামাতার সচ্ছলতার প্রমাণ নিতেন। ঋষি দরিদ্র হলে ক্ষতি নেই, তাঁর তপস্যার প্রভাব ও প্রতিপত্তি থাকলেই হল, কন্যা কোন দিন অর্থাভাবে কষ্ট পাবে না। ঋষিরা কখনও রাজার নিকট প্রার্থী হয়ে যেতেন, কখনও তপস্যায় দেবতাকে তুষ্ট করে সম্পদ সংগ্রহ করতেন। ঋচীক বরুণের কাছ থেকে অশ্ব সংগ্রহ করে সত্যবতীকে বিবাহ করলেন।

মহর্ষি ভৃগু একদিন পুত্র ও পুত্রবধূকে দেখতে এলেন। খুশী হয়ে স্নুষাকে বললেন, তুমি বর নাও। সত্যবতী নিজের ও মাতার জন্য পুত্রলাভের বর চাইলেন। ভৃগু বললেন, আমি তোমাদের দুই পাত্র চরু দিচ্ছি। এক পাত্র তোমার জন্য, আর এক পাত্র তোমার মায়ের জন্য। চরু ভক্ষণের আগে তুমি উড়ুম্বর ও তোমার মা অশ্বত্থ বৃক্ষ আলিঙ্গন করবেন। এই বলে ভৃগু নিজের আশ্রমে ফিরে গেলেন।

তারপর একদিন দিব্য জ্ঞানে ভৃগু জানতে পারলেন যে বৃক্ষ আলিঙ্গন ও চরু ভক্ষণে তাঁরা বিপর্যয় করেছেন। ভৃগু এসে সত্যবতীকে এই কথা বললেন, তোমার মাতা তোমাকে বঞ্চনা করেছেন। বিপরীত কর্ম করে তোমার ক্ষত্রিয়াচারী পুত্র হবে, আর তোমার মাতার হবে ব্রাহ্মণধর্মী পুত্র।

সত্যবতী দুঃখিত হয়ে বললেন, আপনি এর একটা বিহিত করুন। আমার পুত্রের বদলে পৌত্র হোক ক্ষত্রিয়াচারী।

ভৃগু 'তথাস্তু' বলে ফিরে গেলেন।

এই আশীর্বাদের ফলে জমদগ্নির জন্ম হল। তিনি সযত্নে সমস্ত ধনুর্বেদ আয়ত্ত করলেন।

ও দিকে গাধির পুত্র হল বিশ্বামিত্র, তাঁর কথা আমি আগেই বলেছি।

গুরুজী বললেন ঃ জমদগ্নির কথা আরম্ভ করবার আগে ঋচীকের কথা শেষ করা দরকার। ঋচীকের আরও দুটি পুত্রের নাম শুনঃশেফ ও শুনঃপুচ্ছ। বিশ্বামিত্রের প্রসঙ্গে আমি শুনঃশেফের কথাও বলেছি। অর্থাভাবে ঋচীক শুনঃশেফকে বলির জন্য রাজার নিকট বিক্রয় করেছিলেন। এ যুগে আমরা এই নিষ্ঠুরতার কথা কল্পনা করতে পারি নে। রাজার ভয়ে হোক বা অর্থের প্রয়োজনেই হোক, একটি পুত্রকে রাজার হাতে সঁপে দিতে হবে। বাপ জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দেবেন না, মা দেবেন না কনিষ্ঠকে। কাজেই শুনঃশেফকে যজ্ঞের বলি হতে হল। শুনঃশেফ মাতুল বিশ্বামিত্রের শরণ নিয়ে আত্মরক্ষা করলেন।

এ গল্প আমরা আগে শুনেছি এবং মনে আছে। আমরা জমদগ্নির গল্প শোনবার জন্য ব্যগ্র হলাম।

গুরুজী বললেন ঃ জমদগ্নিও তাঁর পিতার মতো রাজকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। রাজা প্রসেনজিতের নিকটে গিয়ে তাঁর কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করার প্রস্তাব করেন। প্রসেনজিৎ ঋষির কাছে কোন শুল্ক চান নি। বিনা শুল্কেই কন্যাদান করেছিলেন। তাঁদের পাঁচটি পুত্র হল, সর্বকনিষ্ঠের নাম পরশুরাম।

তাউজী বললেন ঃ আরও একটা জিনিষ জানা যাচ্ছে। ঋষিরা নিজেরাই কন্যার পিতার নিকট গিয়ে পাণি প্রার্থনা করতেন। ঋষির পিতারা পুত্রের বিবাহের সংবাদ পেয়ে পরে আশীর্বাদ করতে আসতেন।

গুরুজী বললেন, পরশুরামের মাতৃহত্যা একটি নিষ্ঠুর ঘটনা।

পিতা জমদগ্নির আদেশেই পরশুরাম এই পাপ করেছিলেন। রেণুকার মতিভ্রম হয়েছিল সত্য, কিন্তু জমদগ্নি তা ক্ষমা করতে পারেন নি। একদিন রেণুকা স্নান করতে বেরিয়ে রাজা চিত্ররথকে দেখলেন পত্নীদের সঙ্গে জলবিহার করতে। তাঁর চিত্তবিকার উপস্থিত হল, এবং তিনি দূষিত ও বিচেতন অবস্থায় আশ্রমে ফিরে এলেন। জমদগ্নি সমস্ত অবস্থা বুঝতে পেরে স্ত্রীকে ধিক্কার দিলেন এবং পুত্রদের বললেন মাতাকে হত্যা করতে। পুত্ররা মাতাকে হত্যা করতে পারলেন না, একে একে চার পুত্র পিতার আদেশ অমান্য করলেন। জমদগ্নি তাঁদের পশুপক্ষীর মতো জড়বুদ্ধি হও বলে শাপ দিলেন।

সকলের শেষে এলেন পরশুরাম। তাঁকে বলা মাত্র তিনি পরশু দিয়ে মাতার শিরশ্ছেদ করলেন। সন্তুষ্ট হয়ে জমদগ্নি বললেন, বৎস, তুমি বর নাও।

পরশুরামও সুখী হয়ে বললেন, যদি প্রসন্ন হয়ে থাকেন তবে আমাকে অনেকগুলি বর দিন। আমার মাতা পুনর্জীবন লাভ করুন, এবং আমি যে তাঁকে হত্যা করেছিলাম এ কথা যেন তাঁর মনে না থাকে। আমার যেন পাপস্পর্শ না হয়, আমার ভ্রাতারা যেন সুস্থ হয়ে ওঠেন। আমি যেন যুদ্ধে অপরাজেয় হই এবং দীর্ঘ জীবন লাভ করি।

জমদগ্নি বললেন, তথাস্তু।

তাউজী বললেন, বুদ্ধিমান লোক।

বুদ্ধিমানই বটে। পিতৃআজ্ঞা পালন করা হল, অথচ মাতৃ-হত্যার পাপ হল না। মাতা বেঁচে উঠলেন, এবং তাঁর স্মৃতিতে সেই বীভৎস ঘটনা জেগে রইল না। পিতৃআজ্ঞা পালন না করার জন্য ভাইদের কোন অভিশাপ লাগল না। উপরি লাভ শুধু দীর্ঘ জীবন নয়, যুদ্ধে তিনি অপরাজেয় হবেন।

তাউজী বললেন : এক ঢিলে আমরা দু পাখি মারার কথা

বলি, এখানে দেখছি পরশুরাম এক ঢিলে অনেক পাখি মারলেন।

গুরুজী বললেনঃ এইখানে একটু ইতিহাসের কথা বলা দরকার। পরশুরাম সাধারণ মানুষ ছিলেন না, তিনি বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার। হৈহয়রাজ কার্তবীর্যকে সংহার করবার জন্য তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কার্তবীর্যের সহস্র বাহু ছিল। মহর্ষি দত্তাত্রেয়র বরে তিনি সকলের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন, এবং সোনার বিমানে চড়তেন। তাঁর নানা রকম উপদ্রবে দেবতা ও ঋষিরা অস্থির হয়ে বিষ্ণুর নিকট নালিশ করেছিলেন। বিষ্ণু তাঁদের রক্ষা করতে সম্মত হয়ে অবতার রূপে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

একদিন পুত্রদের অনুপস্থিতি কালে এই কার্তবীর্য জমদগ্নির আশ্রমে এসে গাছপালা ভেঙ্গে হোমধেনুর বৎস হরণ করে নিয়ে গেলেন। আশ্রমে ফিরে, পরশুরাম পিতার নিকট এই গল্প শুনলেন। তারপরেই কার্তবীর্যকে আক্রমণ করে ভল্ল দিয়ে তাঁর সহস্র বাহু ছেদন করে তাঁকে বধ করলেন। এর প্রতিশোধ নেবার জন্য কার্তবীর্যের পুত্ররা জমদগ্নিকে হত্যা করে গেল। জমদগ্নি বীর ছিলেন, কিন্তু তপোনিষ্ঠার জন্য আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে পারলেন না। আশ্রমে ফিরে পিতাকে নিহত দেখে পরশুরাম উন্মাদের মতো হয়ে গেলেন। প্রথমে বিলাপ করলেন, তারপর সম্পন্ন করলেন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। শেষকালে ক্ষত্রিয় কুল ধ্বংস করবার জন্য বাহির হলেন। যুদ্ধে একাই কার্তবীর্যের পুত্র ও তাদের অনুচরদের শেষ করলেন। আর পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করলেন একুশবার। সমন্ত-পঞ্চক প্রদেশে পাঁচটি হ্রদ তৈরি করে রক্তে পূর্ণ করলেন, সেই রক্তে তর্পণ করলেন পিতৃগণের।

গুরুজী বললেনঃ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বিবাদ চলেছিল দীর্ঘ দিন ধরে। কৃতবীর্যের বংশধরদের সঙ্গে ভার্গবদের বিবাদ। ক্ষত্রিয়রা

ভার্গবকুল নিঃশেষ করেছিল। বোধহয় এই বিবাদের জন্যই এই বংশের ঋষিরা ধনুর্বেদ আয়ত্ত করতেন।

পিতামহ ঋচীক এসে পরশুরামকে বাধা দিলেন, ক্ষত্রিয় হত্যা থেকে তাঁকে নিবৃত্ত করলেন। পরশুরাম এক মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করে গুরু কশ্যপকে একটি সোনার বেদী দান করলেন। তারপর সমগ্র পৃথিবী দিলেন তাঁকে। নিজে মহেন্দ্র পর্বতে গিয়ে বাস করতে লাগলেন।

পরশুরাম দীর্ঘকাল মহাদেবের তপস্যা করেছিলেন। মহাদেব তাঁকে নিজের প্রীতির জন্য ও জগতের কল্যাণের জন্য দেবতার শত্রুদের বধ করতে বলেছিলেন। তাঁরই প্রসাদে তিনি দৈব অস্ত্রে দৈত্যদের বধ করেছিলেন। সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব তাঁকে তেজোময় পরশু দান করেন। পরশু মানে কুঠার। আগে তাঁর নাম ছিল রাম, মহাদেবের নিকট এই পরশু লাভ করে তাঁর নাম হল পরশুরাম।

ত্রেতাযুগে আমরা পরশুরামকে দেখি বিষ্ণুর সপ্তম অবতার রামচন্দ্রের মুখোমুখি দাঁড়াতে। কবি বাল্মীকির সে বর্ণনা বড় অদ্ভুত, অবিশ্বাস্যও বটে। জনকরাজার কন্যাদের সঙ্গে পুত্রদের বিবাহ দিয়ে দশরথ যখন অযোধ্যায় ফিরছিলেন, তখন সহসা পথে তাঁরা দেখলেন যে পাখিরা ভয়ে কলরব করছে, আর মৃগরা দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে। দশরথের প্রশ্নের উত্তরে বশিষ্ঠ বললেন, পাখিদের ব্যাকুল স্বর অমঙ্গলসূচক সন্দেহ নেই, কিন্তু মৃগের দক্ষিণ গতি শান্তির লক্ষণ।

তারপরেই বাতাস প্রবল হল, ভেঙ্গে পড়তে লাগল গাছপালা। অন্ধকারে সূর্য গেল ঢেকে, আর পৃথিবী উঠল কেঁপে, ধূলার ঝড়ে সৈন্যরা সংজ্ঞা হারাল। সবাই আশ্চর্য হয়ে দেখতে পেলেন, জটাজূট-ধারী ভীমদর্শন পরশুরাম এদিকে আসছেন। কৈলাসের মতো দুর্ধর্ষ, কালাগ্নির মতো দুঃসহ, স্কন্ধে কুঠার ও হাতে বিদ্যুৎবর্ণ ধনুর্বাণ নিয়ে

তিনি আসছেন। ঋষিরা ভাবলেন, পরশুরাম কি আবার ক্ষত্রিয় নিধনে বেরিয়েছেন!

তিনি কাছে এলে তাঁকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে পূজা করা হল। তারপর তিনি রামকে বললেন, তোমার হরধনু ভঙ্গের কথা শুনেছি, এবারে তুমি আমার বৈষ্ণব ধনুতে শরযোজন করে তোমার বীরত্ব দেখাও। তারপর তোমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করব।

পরশুরামের এই কথা শুনে দশরথ ভয় পেলেন, বললেন, প্রভু, আপনি ইন্দ্রের নিকট প্রতিজ্ঞা করে যুদ্ধ পরিত্যাগ করেছেন, আর কশ্যপকে সমগ্র পৃথিবী দান করে তপস্যায় রত হয়েছেন। আপনি আমাদের রক্ষা করুন।

পরশুরাম এ কথার উত্তর দিলেন না। রামকে বললেন, বিশ্বকর্মা দুটি ধনু তৈরি করেছিলেন, ত্রিপুরাসুর বধের জন্য একটি মহাদেব নিয়েছিলেন, আর একটি নিয়েছিলেন বিষ্ণু। তুমি যেটি ভেঙ্গেছ সেটি মহাদেবের, আর আমার হাতে বিষ্ণুর ধনু। বিষ্ণু এটি আমার পিতামহ ঋচীককে দিয়েছিলেন, তিনি দিয়েছিলেন আমার পিতা জমদগ্নিকে। এই ধনু হাতে থাকলে কার্তবীর্যার্জুন তাঁকে বধ করতে পারত না। তোমার বীরত্বের বার্তা পেয়ে আমি এসেছি, আমাকে তোমার পরাক্রম দেখাও।

গুরুজী বললেনঃ কবি বাল্মীকির বর্ণনা এই পর্যন্তই ভাল। এর পর দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হলে ভাল হত। কিন্তু তা হল না, দৈববলে পরশুরাম পরাজিত হলেন। পরশুরামের হাত থেকে ধনু নিয়ে রাম জ্যা লাগিয়ে শর সংযোগ করলেন। বললেন, আপনি পূজনীয় ব্রাহ্মণ, আপনিই বলুন আপনার গতি শক্তি রহিত করব, না তপস্যায় অর্জিত লোক নষ্ট করব?

পরশুরাম জড়ের মতো নির্বীর্য হয়ে বললেন, তুমিই যে স্বয়ং বিষ্ণু, তা আমি বুঝতে পেরেছি। তোমার কাছে পরাজয়ে আমার লজ্জা নেই। আমি মহর্ষি কশ্যপকে পৃথিবী দান করে প্রতিজ্ঞা

করেছিলাম যে তাঁর পৃথিবীতে আমি রাত্রিবাস করব না। এখন আমাকে তুমি মহেন্দ্র পর্বতে ফিরে যেতে দাও।

রামকে প্রদক্ষিণ করে পরশুরাম ফিরে গেলেন।

দ্বাপরেও পরশুরামকে আমরা দেখতে পাই। তিনি ভীষ্ম ও দ্রোণের অস্ত্রগুরু ছিলেন। আবার ভীষ্মের সঙ্গেই একবার দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কাশীরাজের প্রথমা কন্যার নাম অম্বা। তিনি ভীষ্মকে বরণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ভীষ্ম তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন। অম্বা পরশুরামের কাছে এসে এর প্রতিকার প্রার্থনা করেন। পরশুরাম তাঁর শিষ্য ভীষ্মকে ডেকে অম্বাকে গ্রহণ করতে আদেশ করলেন। কিন্তু ভীষ্ম তাঁর পূর্ব প্রতিজ্ঞার জন্য গুরুর আদেশ পালনে অক্ষমতা জানালেন। পরশুরাম এই ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়ে ভীষ্মের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করেন। বহু দিনের চেষ্টাতেও ভীষ্মকে পরাজিত করতে না পেরে যুদ্ধ ত্যাগ করে তিনি মহেন্দ্র পর্বতে ফিরে যান।

পরশুরাম কর্ণকেও অস্ত্রশিক্ষা দিয়েছিলেন। আবার অভিশাপও দিয়েছিলেন তাঁকে। দ্রোণাচার্য কর্ণকে নীচ জাতীয় বলে শিষ্য রূপে গ্রহণ করেন নি। কর্ণ তাই ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে পরশুরামের কাছে গিয়েছিলেন এবং গুরুকে সন্তুষ্ট করে ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা করেছিলেন। একদিন কর্ণের উরুতে মাথা রেখে পরশুরাম ঘুমচ্ছিলেন, সেই সময় দেবরাজ ইন্দ্র অর্জুনের মঙ্গলের জন্য কর্ণকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করলেন। তিনি এক বিরাট কীট হয়ে কর্ণের উরু বিদীর্ণ করলেন। কিন্তু কর্ণ স্থির হয়ে সেই অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করলেন। নিদ্রাভঙ্গের পর পরশুরাম এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে বিস্মিত হলেন, বললেন, এমন সহিষ্ণুতা তুমি কোথায় পেলে? তুমি কি ব্রাহ্মণ নও? সত্য বল।

কর্ণ মিথ্যা বলতে পারলেন না, অকপটে নিজের পরিচয় দিলেন গুরুর নিকট। পরশুরাম এই ছলনার জন্য ক্রুদ্ধ হলেন। অভিশাপ দিলেন কর্ণকে, তোমার এই কপটতার জন্য ব্রহ্মাস্ত্র তুমি ব্যবহার

করতে পারবে না, প্রয়োজনের সময়ে তুমি এর প্রয়োগের কথা ভুলে যাবে।

পরশুরাম অমর। কলিতেও তিনি দেখা দেবেন।

গুরুজীর এই কথা শুনে আমরা সকলেই আশ্চর্য হলাম। আমাদের দৃষ্টিতে বিস্ময় দেখে গুরুজী বললেন: এ আমার নিজের কথা নয়। এই কথা আছে কল্কি পুরাণে। কলির শেষে দেশ যখন পাপে পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন জন্ম হবে কল্কির। শিক্ষার জন্য কল্কি যাবেন পরশুরামের কাছে। ধর্ম রক্ষার জন্য বিষ্ণু বারে বারে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন, সাধুদের পরিত্রাণ করেন আর দমন করেন দুষ্কৃতকারীদের। কিন্তু পরশুরাম অমর হয়ে আছেন। সত্যযুগে তিনি ক্ষত্রিয় বিনাশ করেছেন, আর ত্রেতা দ্বাপর ও কলিতে আছেন মহেন্দ্র পর্বতে তপস্যারত। যুধিষ্ঠির মহেন্দ্র পর্বতে গিয়ে তাঁর দর্শন পেয়েছিলেন। প্রতি পক্ষে অষ্টমী ও চতুর্দশীতে তিনি দেখা দিয়ে থাকেন।

তাউজী জিজ্ঞাসা করলেন: এই মহেন্দ্র পর্বত কোথায়?

গুরুজী হেসে বললেন: যুধিষ্ঠিরের মতো কৌশিকী নদীর তট থেকে যাত্রা করে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে যেও, সেখান থেকে কলিঙ্গ দেশের বৈতরণী নদী প্রভৃতি তীর্থ দেখে মহেন্দ্র পর্বত।

তাউজীর দিকে তাকিয়ে গুরুজী হাসতে লাগলেন।

তেইশ

ব্রহ্মার দশম মানস পুত্র হলেন নারদ।

গুরুজী বললেন ঃ নারদের গল্পের পরেই আজকের অধিবেশন আমরা শেষ করব। কিন্তু তার আগে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।

তাউজী বললেন ঃ করুন।

গুরুজী বললেন ঃ সনক সনন্দাদি ঋষির কথা বলেছি কিনা মনে পড়ছে না।

তাউজী অবিলম্বে বললেন ঃ বলেন নি।

গুরুজী বললেন ঃ তাহলে আমার মনে হয় যে নারদের পূর্বে তাঁদের সম্বন্ধেই কিছু বলা প্রয়োজন। কেন না অনেকের মতে ব্রহ্মা তাঁদের আগে সৃষ্টি করেছিলেন, এবং নারদের মতো তাঁরা তাঁকে হতাশ করেছিলেন।

কেন?

সেই কথাই বলছি। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে যে ব্রহ্মার যখন সৃষ্টি করবার বাসনা হয়, তখন প্রথমে অবিদ্যা উৎপন্ন হয়। অবিদ্যা থেকে তামিস্র অন্ধতামিস্র মোহ মহামোহ প্রভৃতির জন্ম। এই সব অসৎ সৃষ্টি দেখে ব্রহ্মা দুঃখিত হলেন, এবং ধ্যানে মগ্ন হয়ে মন থেকে অন্য ধরণের সৃষ্টির চেষ্টা করেন। এই চেষ্টাতেই সনক সনন্দ সনাতন ও সনৎকুমারের জন্ম। এঁরাই ব্রহ্মার প্রথম মানস পুত্র। ব্রহ্মা এবারে খুশী হয়ে তাঁর পুত্রদের বললেন, এবারে তোমরাই সৃষ্টি করতে শুরু কর।

কিন্তু এই পুত্রেরা তাতে রাজী হলেন না, বললেন, মায়াময় এই সংসারে দুঃখের শেষ নেই। কাজেই মায়ায় আবদ্ধ হয়ে দুঃখ ভোগের বাসনা আমাদের নেই।

এই বলে তাঁরা উর্ধ্বরেতাঃ হয়ে ভগবানের চিন্তায় দিন যাপন করতে লাগলেন।

ভেবেছিলাম যে এই ঋষিদের কথা এইখানেই শেষ হয়ে গেল। কিন্তু গুরুজী আরও কয়েকটি কথা বললেনঃ আমাদের ধর্মশাস্ত্রে এই ঋষিদের উদ্দেশ্যে তর্পণের বিধি আছে। দেবতাদের পরেই সনক সনন্দাদি ঋষিদের তর্পণ। ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ। সনৎকুমারের নাম এতে নেই। কিন্তু হরিবংশের মতে সনৎকুমারই ব্রহ্মার মানস পুত্রদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি যে শরীরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই শরীরেই নিত্য বর্তমান। মার্কণ্ডেয় ঋষি যখন কঠোর তপস্যায় রত, তখন সনৎকুমার এসে তাঁর সন্দেহ ভঞ্জন করেন। হরিবংশের সনৎকুমার সংবাদ অধ্যায়ে এঁর অনেক কথা আছে।

বামন পুরাণে ইনি ধর্মের পুত্র, তাঁর মাতার নাম অহিংসা। শুধু সনৎকুমার নন, সনক সনন্দ সনাতন কপিল ও পঞ্চশিখ তাঁদের সন্তান। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে দেখি যে ইনি ব্রহ্মলোকে নগ্নাবস্থায় আছেন এবং ব্রহ্মতেজে উজ্জ্বল হয়ে কৃষ্ণনাম জপ করছেন। ইনি পরম বৈষ্ণব।

মৎস্য পুরাণ মতে সনাতনও বৈষ্ণব রাজা।

আমরা নারদের কথা শোনবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলাম। নারদ একটি অদ্ভুত চরিত্র। এমন অদ্ভুত চরিত্র আমি কোন গল্প উপন্যাসেও দেখি নি। ঋষি হয়েও তিনি দেবতাদের সঙ্গে আছেন, আর মানুষকেও পরিত্যাগ করেন নি তার সুখে দুঃখে। ত্রিলোকের সর্বত্র তিনি আছেন, ভাল মন্দ সব কাজে মাথা গলিয়েছেন, সুনাম দুর্নাম পাপ পুণ্যের প্রশ্ন তাঁর মনে আসে নি। ঢেঁকির মতো একটা কদাকার বাহনে চেপে আকাশ পথে তিনি যথেচ্ছ বিচরণ করতেন।

নারদ নাম করলেই আমাদের চোখের সামনে একজন তপস্বী

ঋষির ছবি ভেসে ওঠে। মুখে দাড়ি, মাথায় জটা, পরনে গেরুয়া কাপড়, আর এক হাতে দণ্ড কমণ্ডলু ও অন্য হাতে একটি কচ্ছপী বীণা। কোথাও ঝগড়ার সূচনা দেখলেই আমরা বলে উঠি, নারদ নারদ। নারদ যেন কলহের দেবতা।

গুরুজী যে কিছুক্ষণ নীরব হয়ে আছেন, তা আমি খেয়াল করি নি। যখন তিনি কথা কইলেন, তখন আমার খেয়াল হল। বললেন: আমি ভেবে দেখেছি, দেবর্ষি নারদের কথা দেবতার কথার চেয়ে ঋষির কথা প্রসঙ্গেই বেশি মানায়।

তাউজী জিজ্ঞাসা করলেন: কেন?

গুরুজী বললেন: ব্রহ্মার পুত্র কন্যারা কেউই দেবতা নন। পুত্ররা ঋষি, এবং কন্যাদের বিবাহ হয়েছে ঋষিদের সঙ্গে। তাঁদের সকলের কথাই আমরা ঋষির কথায় আলোচনা করেছি। নারদও ব্রহ্মার মানস পুত্র, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের মতে তাঁর জন্ম হয়েছে ব্রহ্মার কণ্ঠ দেশ থেকে।

কেন জানি না, ঠিক এই মুহূর্তে আমার একটি অদ্ভুত কথা মনে হয়। নারদ বীণা বাজিয়ে গান করতেন। সৃষ্টিকর্তার কণ্ঠ থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন বলেই বোধ হয় নারদের এই সঙ্গীতানুরাগ। কিংবা নারদের সঙ্গীতে অনুরাগ দেখেই পুরাণকার বলেছেন যে ব্রহ্মার কণ্ঠ থেকে তাঁর জন্ম।

গুরুজী বললেন: নারদের চরিত্র আলোচনা করবার আগে তাঁর জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধেই কিছু বলা দরকার।

বাধা দিয়ে তাউজী বললেন: সে তো পুরাণের গল্প। বেদে নারদের-উল্লেখ নেই?

গুরুজী বললেন: ভাল প্রশ্ন। বেদে নারদ একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ঋক্ সংহিতার যে সূক্তগুলি নারদের রচনা, তার উল্লেখ আছে কাত্যায়নের সর্বানুক্রমণিকায়। নার শব্দের অর্থ জল, যে জল দান করে সেই নারদ। নারদ পিতৃগণের তর্পণের জন্য সর্বদা

জল দান করতেন, কিংবা নারং পরমাত্মবিষয়কং জ্ঞানং দদাতি, মানে পরমাত্ম জ্ঞান বিতরণ করতেন। শ্রীমদ্ভাগবতে নারদ নিজের মুখে যে কাহিনী বলেছেন, তাতে জানা যায় যে পাঁচ বছর বয়সে তিনি যোগীদের সেবা করতেন, হয়তো জলও দিতেন। নারদ নামটি সেই যোগীদের রাখা বললেও আপত্তি ওঠা উচিত নয়।

তাউজী বললেন : প্রথম থেকেই শুরু করুন।

গুরুজী বললেন : প্রথম থেকে বলতে হলে বেদব্যাসের কথা থেকে আরম্ভ করতে হয়।

তাই করুন।

গুরুজী বললেন : একদিন বেদব্যাস মনমরা হয়ে বসে আছেন, এমন সময় নারদ এসে উপস্থিত। বেদব্যাসের মলিন মুখ দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার দুঃখ কিসের ?

বেদব্যাস বললেন, আমার মনে কোন তৃপ্তি নেই।

নারদ বললেন, তুমি মহাভারত লিখেছ, পরব্রহ্মের স্বরূপও অবগত আছ। বোধহয় ভগবানের নির্মল যশ বর্ণনা কর নি বলেই এই মানসিক অবসাদ এসেছে।

নারদ এই প্রসঙ্গেই নিজের পূর্ব জন্মের কাহিনী বিবৃত করলেন।

গত জন্মে তিনি ব্রাহ্মণদের এক দাসীর পুত্র ছিলেন। তাঁর বয়স যখন মাত্র পাঁচ বছর, তখন তাঁর মা তাঁকে যোগীদের সেবায় নিযুক্ত করেন। কয়েকজন যোগী বর্ষার চার মাস এক জায়গায় কাটাতেন। বালক নারদ খেলাধূলো ছেড়ে স্থির চিত্তে যোগীদের সেবা করেছিলেন। তাঁদের হরিনাম শুনে নারদের ধর্মে অনুরাগ জন্মাল এবং তাঁদের আজ্ঞায় একদিন উচ্ছিষ্ট ভোজন করে তাঁর চিত্তশুদ্ধি হল। যোগীরা যাবার সময় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে ধর্মোপদেশ দিয়ে গেলেন।

এর পর একদিন সর্পাঘাতে তাঁর মায়ের মৃত্যু হল। নারদ বন্ধনমুক্ত হয়ে অরণ্যে গিয়ে ধ্যানমগ্ন হলেন। ধ্যানেই একদিন

তিনি হরির দর্শন পেলেন, তারপর অনেক চেষ্টা করেও দ্বিতীয়বার আর তাঁর দেখা পেলেন না। একদিন শুনতে পেলেন যে হরি তাঁকে বলছেন, এ জন্মে তুমি আর আমাকে দেখতে পাবে না। তোমার অনুরাগ বৃদ্ধির জন্যেই আমি তোমাকে একবার দেখা দিয়েছি। সাধু সেবায় তুমি বুদ্ধি দৃঢ় কর, মৃত্যুর পরে আমাকে পাবে।

নারদ হরিনাম গেয়ে পৃথিবী পর্যটন করে জীবন কাটিয়ে দিলেন।

কল্পাবসানে ভগবান যখন সমুদ্রে শয়ন করে আছেন, তখন নারদ তাঁর নিঃশ্বাসের সঙ্গে অন্তরে প্রবেশ করলেন। প্রলয়ের অবসানে ভগবান যখন আবার নূতন সৃষ্টি আরম্ভ করলেন, তখন মরীচি অত্রি প্রভৃতি ঋষির সঙ্গে তিনিও উৎপন্ন হলেন। কিন্তু প্রজাপতি ঋষিদের মতো তিনি বিবাহ করে সংসার করলেন না, ব্রহ্মচারী হয়ে ত্রিলোকে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। নারদ বেদব্যাসকে বললেন, যখন আমি হরিনাম গান করি, তখন হরি আমার হৃদয়ে বিরাজ করেন।

তাউজী বললেন: এই গল্পে কিছু অসঙ্গতি আছে বলে মনে হচ্ছে।

গুরুজী তাঁর মুখের দিকে তাকালেন।

তাউজী বললেন: সৃষ্টির প্রথমেই ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টির জন্য তাঁর মানস পুত্রদের জন্ম দিয়েছিলেন, পুরাণের মতে নারদ এই মানস পুত্রদের একজন। আপনি তাঁর পূর্ব জন্মের বিবরণ বললেন, এই পূর্ব জন্ম কী করে সম্ভব হল?

গুরুজী হেসে বললেন: পিতা ব্রহ্মার শাপে নারদ মানুষ হয়ে জন্মেছিলেন। সে কাহিনী আছে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে। আমার মনে হয়, শ্রীমদ্ভাগবতের এই গল্পও সেই রকমের কোন ব্যাপার।

তাউজী বললেন: ব্রহ্মা শাপ দিলেন কেন?

গুরুজী বললেন: সেই রাগ। সৃষ্টি বিস্তারের জন্যে ব্রহ্মা

নিজে চেষ্টা করছেন কিন্তু মানসপুত্র হয়ে নারদ কথা শুনবেন না। সংসার করতে হলে তাঁর ঈশ্বর চিন্তায় নাকি বিঘ্ন হবে! কাজেই পিতার শাপে পুত্রকে গন্ধমাদন পর্বতে গন্ধর্ব হয়ে জন্মাতে হল, নাম হল উপবর্হন। একটি দুটি নয়, গন্ধর্বরাজ চিত্ররথের পঞ্চাশটি কন্যাকে তাঁর বিবাহ করতে হল। কিন্তু নিশ্চিন্তে তিনি সংসার করতে পারলেন না, ব্রহ্মা তাঁকে আবার অভিশাপ দিলেন।

কেন?

একদিন ব্রহ্মার সভায় রম্ভার নৃত্য হচ্ছে। উপবর্হনও সেই নাচ দেখছিলেন। নাচ দেখবার সময় রম্ভার রূপে উপবর্হনের বিভ্রম ঘটল। ব্রহ্মা এই অপরাধে তাঁকে দ্বিতীয়বার অভিশাপ দিলেন। নারদের জন্ম হল মনুষ্যলোকে।

সেও এক অস্বাভাবিক জন্ম। কান্যকুব্জের গোপরাজ দ্রুমিল নিঃসন্তান। তিনি তাঁর স্ত্রী কলাবতীকে ব্রহ্ম বীর্যে সন্তান ধারণের অনুমতি দিয়েছিলেন। কলাবতী কাশ্যপনারদ নামে এক মুনির নিকট গিয়ে ভৎর্সনা শুনলেন। সৌভাগ্যক্রমে অপ্সরা মেনকা তখন সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁর নগ্ন উরু দেখে মুনির বীর্যপাত হল, সেই বীর্য ভক্ষণ করে কলাবতী গর্ভধারণ করলেন। যথাসময়ে উপবর্হন মনুষ্য রূপে জন্মগ্রহণ করলেন।

গুরুজী বললেন: ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ নারদ নামের সার্থকতা লিখলেন। দেশে তখন অনাবৃষ্টি, শিশুর নাম তাই হল নারদ। বালক জাতিস্মর ছিলেন এবং অন্যান্য বালককে জ্ঞান দান করতেন বলেও নাম নারদ। কাশ্যপনারদের বীর্যে জন্ম বলে নারদ নামে অভিহিত হলেন।

এর পরের ঘটনা কতকটা শ্রীমদ্ভাগবতেরই কাহিনীর মতো। তফাৎ এইটুকু যে প্রতিবেশী ব্রাহ্মণেরা জানতেন যে নারদ ব্রহ্মার শাপগ্রস্ত মানসপুত্র। তিনি ধর্মকর্মেই সময় অতিবাহিত করতে লাগলেন। বিষ্ণুর দর্শনও একবার পেয়েছিলেন, তারপর দৈববাণী

হল যে এ জন্মে আর দেখা হবে না। কাজেই মৃত্যুর পরে আবার মিলন হবে। তারপর সেই কল্পাবসানের গল্প। মৃত্যুর পর নারদ ব্রহ্মে লীন হয়েছিলেন, সৃষ্টির আদিতে আবার তাঁর কণ্ঠ থেকে উৎপন্ন হলেন।

গুরুজী বললেন : বরাহ পুরাণে আমরা আর একটি নাম পাই। সারস্বত নামে এক ব্রাহ্মণের নাম। তপস্যার প্রভাবে নাকি ইনিই ব্রহ্মার পুত্র নারদ রূপে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ভগবানের তৃতীয় অবতার।

তাউজী বললেন : অবতারের কথা আমরা দেবতার কথায় শুনেছি। সেখানে আর নতুন কোন অবতারের স্থান নেই।

গুরুজী হেসে বললেন : না থাকলেই আমার সুবিধা।

এর পরে মায়ার স্বরূপের গল্প। শ্বেত দ্বীপে বিষ্ণুর নিকট গিয়ে নারদ মায়ার স্বরূপ জানতে চাইলেন। বিষ্ণু ঘরে বসে সেই তত্ত্ব না শুনিয়ে বললেন, চল।

নারদকে সঙ্গে নিয়ে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে তিনি বেরলেন। প্রথমে বীরভদ্র নামে এক বৈশ্যের বাড়ি গেলেন বেত্রবতী নদীর তীরে। তার সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু তাকে আশীর্বাদ করলেন, ধনে পুত্রে সমৃদ্ধ হও।

তারপর ভাগীরথীর তীরে এক ব্রাহ্মণের বাড়ি গেলেন। ব্রাহ্মণ ক্ষেতে লাঙ্গল চালাচ্ছিলেন। তিনিও এঁদের যত্ন আদরের ত্রুটি করলেন না। কিন্তু বিষ্ণু তাঁকে শাপ দিলেন, তোমার কৃষিকাজেও উন্নতি হবে না, পুত্র সন্তানও হবে না।

নারদ এতে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। পথ চলতে চলতে এই অদ্ভুত ব্যবহারের কারণ জানতে চাইলেন। বিষ্ণু বললেন, হল কর্ষণ ব্রাহ্মণের কাজ নয়। জেলেরা মাছ ধরে এক বছরে যত পাপ করে, এই ব্রাহ্মণ একদিনে তার চেয়ে বেশি পাপ করছেন। বংশ বৃদ্ধি হলে তার পাপও বৃদ্ধি হবে, এই জন্যেই আমি তার উপকারের চেষ্টা করেছি।

তারপর তাঁরা দুজনে কান্যকুব্জ দেশ পেরিয়ে এক সরোবরের তীরে এসে উপস্থিত হলেন। বিষ্ণু নারদকে বললেন সেই সরোবরের জলে স্নান করতে। নারদ স্নান করে আর পুরুষ রইলেন না, এক সুন্দরী নারীতে পরিণত হলেন। আর বিষ্ণুও হলেন অন্তর্হিত। এদিকে রাজা তালধ্বজ এসে এই সুন্দরী নারীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিবাহ করলেন। বারো বৎসর পরে তাঁদের সন্তান হল একটি অলাবু, তার ভিতর থেকে পঞ্চাশটি পুত্র বেরল। এক সময় তারা বড় হল, তাদেরও পুত্রকন্যা হল। এবং শেষ পর্যন্ত রাজ্য লাভের জন্য মারামারি করে সবাই প্রাণ হারাল। পিতামাতার আর শোকের শেষ নেই, তাঁরা নিরন্তর কাঁদতে লাগলেন। বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবতারা ব্রাহ্মণের বেশে তাঁদের সান্ত্বনা দিতে এলেন। কিছুতেই তাঁদের শোক দূর করতে না পেরে বিষ্ণু রাণীকে সেই পুরনো সরোবরের জলে স্নান করতে বললেন। তাতেই নারদ তাঁর পূর্ব রূপ ফিরে পেলেন।

বিষ্ণু তখন নারদকে জিজ্ঞাসা করলেন, এবারে তুমি আমাকে মায়ার স্বরূপের কথা বলবে?

নারদ সহাস্যে উত্তর দিলেন, বুঝেছি।

গুরুজী বললেন ঃ এই নারদ হরিনাম গান করে সমস্ত ত্রিলোক ঘুরে বেড়াতেন, কোন স্থানে স্থির হয়ে থাকতে পারতেন না। বিষ্ণু পুরাণে আছে যে নারদের এই অবস্থা হয়েছে ব্রহ্মার শাপে। তাঁর প্রজা-সৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটাবার জন্য তিনি শাপ দিয়েছিলেন, তস্মাল্লোকেষু তে মূঢ় ন ভবেদ্ ভ্রমতঃ পদম্। লোক থেকে লোকান্তরে তোমাকে ঘুরে বেড়াতে হবে, এক স্থানে তুমি স্থির হয়ে থাকতে পারবে না।

সত্যিই নারদ অনেক বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিলেন। এক সময় দক্ষ প্রজাপতির সহস্র পুত্রকে তিনি সাংখ্য যোগ শিক্ষা দিয়ে তাঁদের সংসারত্যাগী করেছিলেন।

সহসা আমার একটি হাসির গল্প মনে পড়ল। একটি শিশুপাঠ্য গ্রন্থে আমি এই গল্পটি পড়েছিলাম। অদ্ভুত রামায়ণের গল্প। নারদ নিজে সংসার করেন নি এবং অন্যকেও সংসারত্যাগী করেছিলেন সত্য, কিন্তু এক সময় বিবাহ করে তাঁরও সংসার করবার বাসনা হয়েছিল। বিষ্ণুর নিকটে গিয়ে নিজের মনের কথা স্বীকার করেছিলেন, বলেছিলেন, প্রভু, আপনি একটা ব্যবস্থা করুন।

বিষ্ণু হেসে বলেছিলেন, তোমার মতো ভক্তের জন্য নিশ্চয়ই একটা ভাল ব্যবস্থা করতে হবে।

তারপর পরামর্শ দিয়েছিলেন অযোধ্যার রাজা অম্বরীষের কাছে যেতে। তাঁর কন্যা শ্রীমতীর তুলনা নেই রূপে ও গুণে। তিনিই নারদের যোগ্য পত্নী হবেন।

নারদ বিদায় নিতেই পর্বত ঋষি এসে উপস্থিত। সেই একই প্রস্তাব, পরামর্শও একই। পর্বত ঋষিও চললেন অম্বরীষের কাছে।

আগে নারদ এলেন। রাজা সসম্মানে দেবর্ষিকে অভিবাদন করলেন। তারপর তাঁর প্রস্তাব শুনে বললেন, এ তো আমার সৌভাগ্যের কথা। তবে রাণীর সঙ্গে একবার পরামর্শ করি ও মেয়ের মনের কথাটাও জেনে নিই, তার আবার অন্য কোন পছন্দ আছে কিনা। আপনি দুদিন পরে আবার আসুন।

বেশ কথা, বলে নারদ বিদায় নিলেন। আর পর্বত ঋষিও এসে উপস্থিত হলেন। রাজা এই ঋষিকেও সম্মান করলেন। পর্বত বললেন, বিষ্ণুর কথাতেই আমি আপনার কাছে এলাম, আপনার কন্যাটি আমাকেই দান করুন।

রাজা প্রমাদ গুণলেন। একই কন্যার জন্য দুজন প্রার্থী। যে কোন একজন অসন্তুষ্ট হলেই বিপদ, তিনিই শাপ দেবেন। ভয়ে ভয়ে রাজা সত্য কথা কবুল করলেন, বললেন, আমার তো কোন আপত্তি নেই, কিন্তু নারদ মুনি আগেই এ প্রস্তাব করে গেছেন।

পর্বত ঋষি আশ্চর্য হয়ে বললেন, তাই নাকি!

রাজা বললেন, সেই জন্যেই বলছি, আপনি আগামী পূর্ণিমায় আসুন, দেবর্ষি নারদকেও আমি সেদিন আসতে বলব। তারপর আমার কন্যা আপনাদের দুজনের মধ্যে যাঁকে পছন্দ করবে, তাঁর সঙ্গেই আমি কন্যার বিবাহ দেব।

বেশ কথা, বলে পর্বত প্রস্থান করলেন। নিজেকে তিনি সুপুরুষ ভাবেন, কাজেই তাঁকে দেখলে রাজকন্যা নারদকে কিছুতেই পছন্দ করবেন না।

দুদিন পরে দেবর্ষি নারদ এসে অম্বরীষের কাছে পর্বতের প্রস্তাবের কথা শুনে আশ্চর্য হলেন। ভারি আস্পর্ধা তো পর্বতের! ঐ রূপ নিয়ে সে আমার ওপর টেক্কা দিতে চায়! রাজাকে বললেন, বেশ, আমিও আসব পূর্ণিমায়, স্বয়ম্বরই হোক। আমি থাকতে তার গলায় কী করে মালা পড়ে, তা দেখে নেব।

বলে অযোধ্যা থেকে ফিরলেন বটে, কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। বিষ্ণুর কাছে গিয়ে বললেন, প্রভু, এর একটা বিহিত করতে হবে।

কী বিহিত?

রাজকন্যা যখন স্বয়ম্বর সভায় আসবেন, তখন তাঁর চোখে পর্বতের মুখ যেন বানরের মতো দেখায়।

সহাস্যে বিষ্ণু বললেন, তাই হবে। তোমার মতো ভক্তের কথা আমাকে রাখতেই হবে।

নিশ্চিন্ত মনে নারদ ফিরে গেলেন। এলেন পর্বত। তিনিও একই অনুরোধ করলেন বিষ্ণুকে। বিষ্ণু তাঁকেও বললেন, তথাস্তু।

এদিকে রাজা অম্বরীষ দিবারাত্রি বিষ্ণুকে স্মরণ করতে লাগলেন, হরি আমাকে রক্ষা কর। এই দুই ঋষির শাপে যেন ভস্ম হয়ে না যাই।

তারপর সেই পূর্ণিমা এল। ঋষিরা এলেন। চাঁদও উঠল। কিন্তু অযোধ্যা বিষণ্ণ, প্রজাদের মুখে হাসি নেই, একটা দুর্দৈবের ভয়ে স্বয়ম্বর সভা ম্লান হয়ে রইল।

রাজকন্যা শ্রীমতী এলেন মালা হাতে। সিংহাসনে উপবিষ্ট দুই ঋষিকে দেখে তিনি বোধহয় মূর্ছা যাচ্ছিলেন, বানরের মুখ নিয়ে দুই ঋষি বসে আছেন। এমন সময় তাঁদের মাঝখানে এক অপরূপ পুরুষ দেখে রাজকন্যা তাঁরই গলায় মালা দিলেন আর সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

দুই ঋষিই রাজার উপর চটে উঠলেন, এ কী অন্যায়!

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে রাজা বললেন, আমার কী অপরাধ বলুন। নবদূর্বাদলশ্যাম রঙের একজন সুপুরুষ ধনুর্বাণ হাতে আপনাদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর গলায় মালা দিতেই দুজনে অন্তর্ধান হয়ে গেল।

ঋষিরা আর কী করবেন, দুজনেই বিষ্ণুর কাছে এসে উপস্থিত। নারদ বললেন, এ আপনারই ছলনা।

বিষ্ণু বললেন, আমাকে কেন দোষ দিচ্ছ, ত্রিভুবন খুঁজলেই তোমরা সেই মায়াবী পুরুষকে দেখতে পাবে।

নারদ বললেন, চল পর্বত।

পর্বত হতাশ ভাবে বললেন, তুমি যাও। আমার আর বিবাহে প্রয়োজন নেই, আমি তপস্যা করতে চললাম।

নারদ কিন্তু আশা ছাড়লেন না। ত্রিভুবন ঘুরে ব্যর্থ হয়ে রাজা অম্বরীষের কাছে ফিরে এলেন। বললেন, আপনি আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছেন, আমি আপনাকে শাপ দেব।

রাজা অনেক অনুনয় বিনয় করলেন, কিন্তু নারদের মন তাতে ভুলল না। তিনি শাপ দিলেন, আমাকে যেমন আপনি মোহে মুগ্ধ করে অন্যকে কন্যা দান করেছেন, তেমনি আপনারও জ্ঞান বুদ্ধি মোহের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হবে।

রাজা তখনই দেখলেন যে অন্ধকারের একটি আবর্ত তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। রাজা আত্মরক্ষার জন্য খানিকক্ষণ ছুটাছুটি করে 'নারায়ণ নারায়ন' বলে মূছিত হয়ে পড়লেন। নারদ আশ্চর্য

হয়ে দেখলেন যে সেই আবর্ত আর অগ্রসর হতে পারল না। মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো উজ্জ্বল এক চক্র সেই আবর্তের গতি পরিবর্তিত করে দিল, অন্ধকারের আবর্ত এখন তাঁরই দিকে এগিয়ে আসছে। নারদ আতঙ্কে আকাশ পথে ছুটতে লাগলেন। ইন্দ্র ব্রহ্মা মহেশ্বরের কাছে গিয়ে তিনি রক্ষা পেলেন না, শেষে গেলেন বিষ্ণুর কাছে। ভয়ে ও শ্রান্তিতে তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

সংজ্ঞা লাভের পর দেখলেন যে সেই চক্র নেই, সেই আবর্ত নেই, সব অন্তর্হিত হয়ে গেছে। বিষ্ণু বললেন, নারদ, তোমার মতো রাজা অম্বরীষও আমার ভক্ত। সেই নিরপরাধ রাজাকে শাপ দেবার জন্যই তোমার এই দণ্ড হল। আর তাঁর কন্যা শ্রীমতীর জন্য আপশোষ ক'রোনা। আমার জন্য সে পূর্ব জন্ম থেকেই তপস্যা করেছিল, তাই আমার গলায় মালা দেবার পর আমিই তাকে হরণ করেছি। তোমাকে আমি একশো দেবকন্যা দান করছি, তুমি তাদের বিবাহ করে সুখী হও।

নারদের তখন মোহ ভঙ্গ হয়েছে, বললেন, প্রভু বিবাহে আর আমার প্রয়োজন নেই, আমাকে যথেষ্ট শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু আমার সঙ্গে এই পরিহাসের জন্য আমি আপনাকে শাপ দেব। যে মূর্তিতে আপনি শ্রীমতীকে হরণ করলেন, সেই মূর্তিতেই অযোধ্যায় অম্বরীষের বংশে আপনার জন্ম হবে। রাক্ষসী মায়ায় আপনি শ্রীমতীকে হরণ করেছিলেন বলে রাক্ষস আপনার শ্রীমতীকে হরণ করবে। আমার মতো আপনিও শ্রীমতীর জন্য কেঁদে কেঁদে বেড়াবেন। আর আমাদের বানর সাজিয়ে আপনি যে মজা করেছেন, সেই বানর আপনাকে শ্রীমতী উদ্ধারে সাহায্য করবে। মোহের অন্ধকার আপনার জ্ঞান বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করবে। আপনি সাধারণ মানুষের মতো অসহায় নিরাশ্রয় হয়ে বনে বনে কেঁদে বেড়াবেন।

এই হল অদ্ভুত রামায়ণের গল্প। বিষ্ণুর রাম জন্মের পূর্ব

ইতিহাস। এই গল্প গুরুজী আমাদের সংক্ষেপে বললেন। অদ্ভুত রামায়ণে এই গল্প যেন আমরা নিজেরাই পড়ে নিই। তারপরে বললেন নারদের সঙ্গীত শিক্ষার কথা। নারদ যে গান ভালবাসতেন এবং সঙ্গীত শিক্ষার জন্য নানাজনের কাছে গিয়েছিলেন, সে কাহিনী আমরা প্রায় সকল পুরাণেই পাই।

গুরুজী বললেন : সমস্ত পড়ে মনে হয় যে নারদ ভাল গাইতে পারতেন না, অথচ ভাল গাইতে পারেন বলে গর্ব ছিল। একবার কৌশিকের প্রীতির জন্য বিষ্ণু তুম্বুরু নামে একজন গন্ধর্বকে তাঁর সভায় গান গাইতে বলেন। তুম্বুরু ব্রহ্মার কাছে গান শিখে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। নারদ তাঁর গান শুনে ঈর্ষান্বিত হন এবং স্থির করেন যে তাঁকে পরাজিত করতে হবে। বিষ্ণুর পরামর্শে নারদ উলুকেশ্বর নামে আর একজন গন্ধর্বের নিকট গান শিখতে গেলেন। এক হাজার দিব্য বৎসর গান শেখার পর তাঁর ধারণা হল যে তুম্বুরুকে এবারে সহজেই জয় করতে পারবেন। এই ভেবে তুম্বুরুর বাড়ির দিকে রওনা হলেন।

পথে কয়েকজন বিকলাঙ্গ স্ত্রীপুরুষ দেখে নারদ থমকে দাঁড়ালেন, জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কে ?

তারা উত্তর দিল, আমরা রাগ রাগিণী।

তোমাদের এমন দশা কেন ?

নারদ মুনির জন্যে আজ আমাদের এই দশা। তাঁর গানেই আমরা বিকলাঙ্গ হয়েছি।

নারদ লজ্জিত হলেন, দুঃখিতও হলেন। বললেন, এখন কী উপায় বল, কী করলে তোমরা পূর্ব রূপ ফিরে পাবে ?

রাগরাগিণীরা বলল, মহাদেব যদি গান করেন তাহলেই তা সম্ভব।

নারদ মহাদেবের কাছে গিয়ে সব কথা নিবেদন করলেন। মহাদেব গান গাইতে রাজী হলেন, কিন্তু তাঁর উপযুক্ত শ্রোতা চাই।

নারদ বুঝলেন যে সঙ্গীতের শ্রোতা হবার যোগ্যতাও তাঁর হয় নি। শেষ পর্যন্ত মহাদেবের কথায় তিনি ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে ধরে আনলেন।

মহাদেবের গান ব্রহ্মা বুঝলেন না, বিষ্ণু বুঝলেন অল্প কিছু। তাতেই তিনি দ্রবীভূত হয়ে ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে আশ্রয় নিলেন। গঙ্গার উৎপত্তি হল। নারদ আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে রাগ রাগিণীরা তাদের পূর্ব রূপ ফিরে পেয়েছে।

এই গল্প কোথাও অন্য রকম। রাগ রাগিণীর দুরবস্থার কথা নারদ বিষ্ণুকে জানিয়েছিলেন যে সঙ্গীত শিক্ষা তাঁর সম্পূর্ণ হয় নি, কৃষ্ণ অবতারে নারদ যেন তাঁর কাছে আসেন।

এই উপদেশ অনুসারে নারদ শ্রীকৃষ্ণের কাছে এসেছিলেন। দু বৎসর গান শিখলেন জাম্ববতী ও সত্যভামার কাছে, তার পর রুক্মিণীর নিকট আরও দু বৎসর। এই সময়েই তিনি বীণা বাজানো শিখলেন।

গুরুজী একটু বিশ্রাম নিয়ে বললেন: নারদের মতো বিচিত্র চরিত্র পুরাণে আর আছে বলে আমার মনে হয় না। নিজের জীবনটা তিনি তপস্যাতেই অতিবাহিত করেন নি, সমাজ কল্যাণে তাঁর গভীর অনুরাগের পরিচয় পাই। তিনি ত্রিলোকের জন্য চিন্তা করতেন এবং সকলের সকল কাজে সাহায্য করতে সচেষ্ট থাকতেন। সে যুগে মনে হয় শুধু মানুষ নয় দেবতারাও বিপদে পড়লে নারদকে স্মরণ করতেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে নারদ মুনি এসে পড়লে একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে।

গুরুজী সংক্ষেপে কয়েকটা উদাহরণ দিলেন: শিবের বিবাহে কে ঘটকালি করবেন? নারদ আছেন। বিষ্ণু বামনরূপে জন্ম গ্রহণ করেছেন, তাঁর উপনয়নের ব্যবস্থা কে করবেন? নারদ আছেন। বালক ধ্রুব তপস্যা করছে, তাকে মন্ত্র দেবে কে? নারদ আছেন। বাল্মীকি রামায়ণ লিখবেন, তার জন্যেও আছেন নারদ। আবার দক্ষ প্রজাপতির দর্প বেড়েছে, তাঁকে শিক্ষা দেওয়া দরকার,

নারদ তার ব্যবস্থা করলেন। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুরে অনাচার ঢুকেছে, তাঁর রাণীরা কৃষ্ণের সুপুরুষ পুত্র শাম্বের প্রতি অনুরক্ত হয়েছেন, নারদ এই সংবাদ দিলেন শ্রীকৃষ্ণকে। প্রমাণ পেয়ে শ্রীকৃষ্ণ শাম্বকে অভিশাপ দিলেন। সে স্বতন্ত্র গল্প। নারদকে নিয়ে এই রকমের অসংখ্য গল্প আছে আমাদের পুরাণে।

তাউজী বললেন : শাম্বের গল্প কি আপনি বলবেন না ?

গুরুজী বললেন : ঋষির কথায় শাম্বের গল্পের প্রয়োজন নেই।

তাউজী তবু বললেন : নারদের কথায় যখন এসে পড়েছে, তখন বললে ক্ষতি কী !

গুরুজীর আপত্তি দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে গল্পটি কিছু অশ্লীল, তাই তিনি অন্য প্রসঙ্গে চলে যেতে চাইছেন। কিন্তু তাউজীর আগ্রহ দেখে শেষ পর্যন্ত বললেন : দুই পুরাণে গল্পটি দুই রকম। কিন্তু মূল ঘটনা দু জায়গাতেই এক।

নারদ শ্রীকৃষ্ণকে সংবাদ দিলেন, তাঁর ষোল হাজার রাণীর অনেকেই জাম্ববতীপুত্র শাম্বের প্রতি অনুরক্ত। শ্রীকৃষ্ণ এ কথা বিশ্বাস করতে পারেন নি। তাই দেবর্ষির নিকট প্রমাণ প্রার্থনা করেছিলেন। এক পুরাণে আছে যে নারদ শাম্বকে ডেকে সভায় বসালেন, তারপর ডাকালেন রাণীদের। শাম্বকে সভায় দেখে রাণীরা যে চঞ্চল হয়ে উঠলেন, তাই লক্ষ্য করে শ্রীকৃষ্ণ শাম্বকে শাপ দিলেন।

অন্য পুরাণে প্রমাণের গল্পটা অন্য রকম। রাণীরা স্নান করছিলেন। সেইখানে শাম্বকে দেখতে পেয়ে তাঁরা চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। নারদ এই দৃশ্য দেখালেন শ্রীকৃষ্ণকে। কাজেই শ্রীকৃষ্ণ শাম্বকে শাপ দিলেন—শাম্ব কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হবে। কোনারকে সূর্যের তপস্যা করে শাম্ব শাপমুক্ত হয়েছিল।

গুরুজী বললেন : শাম্ব ও নারদ আর একটি কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত। এক সময় বিশ্বামিত্র কণ্ব ও নারদ এসেছিলেন দ্বারকায়। যদু-বংশের ছেলেরা ঋষিদের সঙ্গে রসিকতা করবার বাসনায় শাম্বকে

মেয়ে সাজিয়ে সামনে আনল। বলল, দেখুন তো, এর পুত্র না কন্যা সন্তান হবে।

ঋষিরা সবই বুঝলেন, বললেন, পুত্র কন্যা নয়, শাম্ব মুষল প্রসব করবে, তাতেই ধ্বংস হবে যদুবংশ।

ঋষিদের এই অভিশাপ মিথ্যা হয় নি। অনেক চেষ্টা করেও যদুবংশ রক্ষা করা সম্ভব হয় নি।

যদুবংশ ধ্বংসের গল্প আমার মনে আছে। মহাভারতে সে গল্প পড়েছি।

গুরুজী একটু থেমে বললেন : এক সময় নারদকে বাদ দিয়ে কাব্য রচনাও অসম্ভব ছিল। মাঘের শিশুপাল বধে নারদ আছেন। শিশুপালের অত্যাচারে সবাই যখন জর্জরিত, নারদ তখন প্রতিকার বিধান করছেন। নৈষধেও নারদ আছেন, দময়ন্তীর বিবাহ ব্যাপারে দেবসভায় তিনি দূত রূপে উপস্থিত।

কিন্তু নারদকে আমরা কলহের দেবতা বলেই জানি। দেবতার কথায় শুনেছি যে তিনি তাঁর পিতামাতার মধ্যেও কলহ বাধিয়েছেন পুষ্করের যজ্ঞানুষ্ঠানে। এ সম্বন্ধে আর একটি গল্প আমি শুনেছি। একবার কৃষ্ণ এক অনুষ্ঠানে ত্রিলোকবাসীকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। নারদের উপর তিনি এই নিমন্ত্রণের ভার দিয়েছিলেন। তাঁর কাজ শেষ করে রাধিকার গৃহে এসে তিনি বিশ্রামের জন্য বসলেন। বললেন, প্রভুর এক একটা কাজের আমি কোন অর্থ খুঁজে পাই নে।

রাধিকা বললেন, কী রকম ?

এই ধরুন, তিনি আমাকে ত্রিলোকবাসী সকলকেই নিমন্ত্রণ করতে বললেন, অথচ আপনার কথা একবারও বললেন না।

নারদের মৎলব রাধিকা বুঝতে পারলেন। হেসে বললেন, আপনার প্রভু কি নিজেকে নিমন্ত্রণ করবার জন্য আপনাকে বলেছেন ?

নারদ বললেন, নিজেকে আবার কেউ নিমন্ত্রণ করে নাকি ?

রাধিকা হেসে বললেন, তবে আমাকে নিমন্ত্রণ করতে কেন বলবেন! আমরা কি ভিন্ন!

নারদের পরাজয় হল রাধিকার কাছে।

শৈশবে আমি ঠাকুমার কাছে নারদ মুনির গল্প শুনতাম। ঢেঁকিতে চড়ে তিনি আকাশ পথে বেড়াতেন, আর গোলমাল দেখলেই নামতেন সেখানে। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের কয়েকটি লাইন আমার শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল।—

কান্দে রাণী মেনকা চক্ষুর জলে ভাসে।
নখে নখ বাজায়ে নারদ মুনি হাসে॥
কোন্দলে পরমানন্দ নারদের ঢেঁকী।
আকশলী পোয়া মোণা পড়ে মেকামেকী॥
পাখা নাহি তবু ঢেঁকী উড়িয়া বেড়ায়।
কোনের বহুড়ী লয়ে কোন্দলে জড়ায়॥
সেই ঢেঁকী চড়ে মুনি কান্ধে বীণাযন্ত্র।
দাড়ী লড়ে ঘন পড়ে কন্দলের মন্ত্র॥

গুরুজী বললেন: শৈশবে নানা কলহের কাহিনী শোনবার পরে দেবর্ষি নারদকে তাঁর স্বমহিমায় আমরা সব সময় দেখি না। ভারতে ঋষি অনেক ছিলেন, কিন্তু নারদ ছিলেন একজনই। অন্য ঋষিরা যখন আপন মোক্ষলাভের চেষ্টায় নিয়োজিত, তখন নারদ পরার্থে জীবন উৎসর্গ করে ত্রিলোকে হরিনাম গান করে ঘুরে বেড়িয়েছেন। সর্বত্যাগী আদর্শ মুক্ত পুরুষ।

চব্বিশ

গুরুজী বললেন: পৃথিবীর আদি কবিকে আবিষ্কার নারদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। রত্নাকর দস্যুর মধ্যে তিনি কবি বাল্মীকিকে দেখেছিলেন। মূল রামায়ণে এই কাহিনী নেই, আছে প্রাদেশিক ভাষায় রচিত রামায়ণে।

আমার মনে পড়ল, আমি কৃত্তিবাসের রামায়ণে রত্নাকর দস্যুর গল্প পড়েছি। কৃত্তিবাস রত্নাকরকে চ্যবন মুনির পুত্র বলেছেন। কিন্তু গুরুজী বললেন: বাল্মীকি কার পুত্র ছিলেন তা সঠিক জানা যায় না। কেউ বরুণের পুত্র বলেছেন, কেউ বলেছেন প্রচেতার বংশধর, আবার ভৃগুর বংশধর বলেছেন অনেকে। প্রাচীন কবির লেখা দু একখানি রামায়ণে দেখেছি যে বাল্মীকি নিজেই তাঁর জন্ম বৃত্তান্ত বলেছেন। তাঁর নিজের মতে তিনি অব্রাহ্মণ ছিলেন, কিরাতের বংশে তাঁর জন্ম। তিনি নিজেও বিবাহ করেছিলেন কিরাত কন্যা এবং তাঁর অনেকগুলি সন্তান হয়েছিল। তাদেরই ভরণ পোষণের জন্য তিনি দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন।

রত্নাকর দস্যুর গল্প আমার মনে আছে। তার এলাকার মধ্য দিয়ে নিশ্চিন্তে যাবার কারও উপায় ছিল না। তার কাছে নির্ধন মুনি ঋষিরও পরিত্রাণ ছিল না। প্রাণে বধ করে গেরুয়া কাপড় চোপড়ই কেড়ে নিত।

একদিন নারদ যাচ্ছিলেন সেই পথ দিয়ে। রত্নাকর তাঁর পথ আটকাল। তার হাতে মুগুর, পিঠে কুঠার। কিন্তু নারদ ভয় পেলেন না, বললেন, আমাকে মেরে কী পাবে? কিন্তু তুমি এই যে পাপ করছ, কেউ কি তোমার পাপের ভাগী হবে?

রত্নাকর বলল, কেন হবে না! যাদের ভরণ পোষণের জন্য আমি এই পাপ করছি, তারা নিশ্চয়ই আমার পাপের ভাগী হবে।

নারদ বললেন, আমি এইখানে অপেক্ষা করছি, তুমি একবার তোমার পরিবারের সকলকে জিজ্ঞাসা করে এস। যদি মনে কর যে আমি এই সুযোগে পালিয়ে যাব তো একটা গাছের সঙ্গে আমাকে বেঁধে রেখে যাও।

রত্নাকর দস্যু বাড়ি গিয়ে তার পিতামাতাকে জিজ্ঞাসা করল, জিজ্ঞাসা করল তার স্ত্রীকে, পুত্র কন্যাকেও বোধহয় করেছিল। কিন্তু কেউই তার পাপের ভাগ নিতে রাজী হল না। কেন নেবে! এদের সকলের ভরণ পোষণের দায়িত্ব যে তারই, জীবিকার্জনের জন্য দস্যুবৃত্তি ছাড়া কি আর কোন পথ নেই!

ক্ষুব্ধ মর্মাহত হয়ে রত্নাকর নারদের নিকট ফিরে এল। বলল, প্রভু আমার কী উপায় হবে, কিসে আমি পাপমুক্ত হব?

নারদ বললেন, রাম নাম কর। রামনামেই তোমার পাপক্ষয় হবে।

কিন্তু রাম নাম রত্নাকরের মুখে এল না। তখন নারদ একটি মৃত গাছ দেখিয়ে প্রশ্ন করলেন, ওটা কী গাছ?

রত্নাকর বলল, মরা গাছ।

নারদ বললেন, বেশ, যতক্ষণ আমি ফিরে না আসি ততক্ষণ তুমি ঐ মরা নামই বারবার উচ্চারণ কর।

গুরুজী বললেন: রত্নাকর দস্যু সহস্র যুগ এক জায়গায় বসে রাম নাম জপ করেছিলেন। তাঁর শরীরের উপর বল্মীকের স্তূপ হয়ে গেল। বল্মীক থেকে বাল্মীকি। বাল্মীকি তাঁর রামায়ণের এক জায়গায় লিখেছিলেন, বল্মীকে ভব। এই উক্তি থেকেই বোধহয় রত্নাকর দস্যুর কাহিনী!

তাউজী জিজ্ঞাসা করলেন: কিন্তু নারদ বাল্মীকিকে কবি করলেন কী করে?

গুরুজী বললেন : সে কথা রামায়ণের গোড়াতেই আছে। নারদকে বাল্মীকি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, পৃথিবীতে এখন সর্বগুণান্বিত পুরুষ কে? এ কথার উত্তরে নারদ বলেছিলেন, রাম। তারপর রামের সম্পূর্ণ কাহিনী বাল্মীকিকে বলেছিলেন। রামায়ণ রচনার প্রেরণা বাল্মীকি নারদের কাছেই পেয়েছিলেন।

বাল্মীকি কবি হলেন কী করে, সে কাহিনীও আছে রামায়ণে। শিষ্য ভরদ্বাজকে সঙ্গে নিয়ে বাল্মীকি তমসার তীরে গিয়েছিলেন স্নানের জন্য। শিষ্যের হাত থেকে বল্কল নিয়ে তিনি নদী তীরের বনের মধ্যে বেড়াতে লাগলেন। সেই সময় তিনি চোখের সামনে একটি মর্মান্তিক ঘটনা দেখলেন। বৃক্ষশাখায় একটি ক্রৌঞ্চ মিথুন ছিল বিহারে রত। এক ব্যাধ শর নিক্ষেপ করে ক্রৌঞ্চটিকে বধ করল। রক্তাক্ত বক মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ছটফট করতে লাগল, আর ক্রৌঞ্চী কাঁদতে লাগল করুণ স্বরে।

ব্যাধকে দেখতে পেয়ে বাল্মীকি অভিশাপ দিলেন।—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥

ওরে নিষাদ, তুই কোন দিন প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবি না। তুই যে কামমোহিত ক্রৌঞ্চ মিথুনের একটিকে বধ করেছিস।

তারপর বাল্মীকি ভাবতে লাগলেন, এ আমি কী বললাম! শিষ্য ভরদ্বাজকে বললেন এই কথা।—

পাদবদ্ধোঽক্ষরসমস্তন্ত্রীলয়সমন্বিতঃ।
শোকার্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্যথা॥

এই যে আমার পাদবদ্ধ সম অক্ষর যুক্ত তন্ত্রীলয়ে গানের যোগ্য কথা আমি শোকের আবেগে বলে ফেলেছি, এ নিশ্চয়ই শ্লোক নামে পরিচিত হবে।

গুরুজী বললেন : কবি আনন্দবর্ধনও তাঁর ধ্বন্যালোকে এই কথা বলেছেন।—

কাব্যস্যাত্মা স এবার্থস্তথা চাদি কবেঃ পুরা।
ক্রৌঞ্চদ্বন্দ্ববিয়োগোত্থঃ শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ॥

বাল্মীকির শোকই শ্লোকে পরিণত হয়েছে।

বাল্মীকি যখন তাঁর আশ্রমে বেদনাহত, তখন ব্রহ্মা এসে উপস্থিত হলেন। মুনি পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে তাঁকে পূজা করলেন, ব্রহ্মাও তাঁকে কুশল প্রশ্ন করলেন। বললেন, আমার ইচ্ছাতেই ঐ ছন্দোবদ্ধ বাণী তোমার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে। তুমি এবারে কাব্য রচনা কর, রাম চরিত। নারদের কাছে যা শুনেছ, তাই লেখ। যত দিন এই পৃথিবী থাকবে, তত দিন তোমার কাব্য সসম্মানে আদৃত হবে।

গুরুজী বললেন ঃ তাই আমি মনে করি যে পৃথিবীর আদি কবি বাল্মীকিকে আবিষ্কার করেছিলেন দেবর্ষি নারদ।

রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকি প্রতিভা নৃত্যনাট্যের কথা আমার মনে পড়ল। তাঁর বাল্মীকিও আদি শ্লোক রচনা করে পুলকে অধীর হয়েছিলেন—

কী বলিনু আমি! এ কী সুললিত বাণীরে!
কিছু না জানি কেমনে যে আমি প্রকাশিনু দেবভাষা।
এমন কথা কেমনে শিখিনুরে!

তার পরেই সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন সরস্বতীর। সরস্বতী তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন—

আমি বীণাপাণি তোরে, এসেছি শিখাতে গান।
তোর গানে গলে যাবে সহস্র পাষাণ প্রাণ।…
…যেথায় হিমাদ্রি আছে সেথা তোর নাম রবে,
যেথায় জাহ্নবী বহে তোর কাব্য স্রোত ববে।

সরস্বতী নিজের বীণা উপহার দিয়েছিলেন পৃথিবীর প্রথম কবিকে।

বাল্মীকির চরিত্র বড় মধুর ছিল। জীবনে তিনি বোধহয় একবারই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, শাপও দিয়েছিলেন একবার। দুর্বাসা

কেন, যে কোন ঋষি এই ক্রোধ ও শাপের কথা শুনে হাসবেন। একটা বকের মৃত্যু দেখে তাঁর দুঃখ হয়েছিল। হত্যাকারী ব্যাধকে রেগে শাপ দিয়েছিলেন, তোমার প্রতিষ্ঠা কোন দিন হবে না। ব্যাধ কি প্রতিষ্ঠালোভী, না এই শাপে তার কোন ক্ষতি হবে! বাল্মীকি যা বলেছিলেন, সে হল একটি সত্য কথা—হিংসায় কোন প্রতিষ্ঠা লাভ হয় না।

সীতার বনবাস কালে এই বাল্মীকিকে আমরা আবার দেখতে পাই। সীতাকে তিনি নিজের আশ্রমে সাদরে আশ্রয় দিয়েছিলেন। কুশ ও লবের জন্ম হয়েছিল তাঁরই আশ্রমে। এই বালক দুজনকে তিনি সম্পূর্ণ রামায়ণ গান শিক্ষা দিয়েছিলেন।

রামের অশ্বমেধ যজ্ঞ কালে তিনি কুশ ও লবকে সঙ্গে নিয়ে অযোধ্যায় এলেন। বোধহয় সীতাও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। ঋষিদের জন্য নির্মিত আশ্রমে তাঁরা ছিলেন। বাল্মীকি কুশ ও লবকে রামায়ণ গান করে বেড়াতে বলেছিলেন। বনের ফলমূল খেয়ে তারা থাকবে, আর ধন কারও কাছে গ্রহণ করবে না। প্রথম দিন রামায়ণ গান শুনে রাম তাদের আঠারো হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কুশ ও লব তা গ্রহণ করে নি। সবাই আশ্চর্য হয়েছিল। তারা বলেছিল, আমরা বাল্মীকির শিষ্য, ধনে আমাদের প্রয়োজন নেই।

রাম সবই জানতেন, সবই বুঝেছিলেন। তাই সীতাকে গ্রহণ করবার প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন বাল্মীকির কাছে। বাল্মীকি উত্তর পাঠিয়েছিলেন, পতিই নারীর দেবতা, সীতা রামের ইচ্ছা পূর্ণ করবেন।

তারপর রামের ইচ্ছায় সীতা এলেন যজ্ঞস্থলে, বাল্মীকি তাঁকে সমবেত জনতার মাঝখানে নিয়ে এলেন। সীতা এলেন অধোবদনে, অশ্রুসজল নয়নে। বাল্মীকি বললেন, রাম, তুমি শুধু লোকাপবাদের ভয়ে এই পতিব্রতা সীতাকে পরিত্যাগ করেছ।

আমি প্রচেতার দশম পুত্র, আমি কখনও মিথ্যা বলি নি। আমি বলছি যে সীতার যদি লেশ মাত্র পাপ থাকে, তবে আমার সহস্র বর্ষের তপস্যা যেন ব্যর্থ হয়ে যায়। আমি বিশ্বাস করি যে তুমি নিজে সীতাকে পবিত্র জেনেও প্রজানুরঞ্জনের জন্য এঁকে ত্যাগ করেছ।

রাম এ কথা স্বীকার করলেন। কিন্তু অপমানে অভিমানে ব্যথিত সীতা মাটির দিকে চেয়ে বললেন,

মনসা কর্মণা বাচা যথা রামং সমর্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥

কায়মনোবাক্যে আমি যদি শুধু রামেরই অর্চনা করে থাকি, তবে মা পৃথিবী, দ্বিধা হয়ে তুমি আমাকে গ্রহণ কর।

সর্ব সমক্ষে পৃথিবী দ্বিধা হলেন। সোনার সিংহাসন উঠল নাগদের মাথায়। কন্যাকে তার উপর বসিয়ে তিনি রসাতলে প্রবেশ করলেন।

গুরুজী বললেন: এটি উত্তর কাণ্ডের কাহিনী। বাল্মীকি এর রচয়িতা নন। রামায়ণের ছটি কাণ্ড বাল্মীকি রচনা করেছিলেন।

গুরুজী নীরব হতেই আমার মনে হল যে বাল্মীকির কাহিনী এইখানে শেষ হল। এর পরে কোন্ ঋষির কথা বলবেন, আমি জানি না। তাউজী তাঁর খাতার পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। কিন্তু কিছু বলবার আগেই গুরুজী বললেন: মনে হচ্ছে, রামায়ণের সমস্ত ঋষির কথাই আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করেছি।

ঋষিদের নাম আমি মনে করবার চেষ্টা করলাম।

তাউজী বললেন: নারদ বাল্মীকি ঋষ্যশৃঙ্গ বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠ পরশুরাম ও ভরদ্বাজ অত্রি-অনসূয়া—

গুরুজী বললেন: গৌতম-অহল্যার কথাও বলেছি।

দণ্ডপাণি বললেন: অগস্ত্য-লোপামুদ্রার কথা কিছু বলেন নি।

গুরুজী বললেনঃ ঠিক কথা। রামায়ণে লোপামুদ্রার কথা নেই, আছে অগস্ত্যের কথা। রামায়ণ ও মহাভারতে অগস্ত্য একজন বলিষ্ঠ ঋষি। ঋষির কথায় তাঁর কথা অপরিহার্য।

তাউজীর দিকে তাকিয়ে আমি দেখলাম যে তিনি লজ্জিত বোধ করছিলেন। তুপুর বেলায় অনেক পরিশ্রমে তিনি ঋষিদের নামের তালিকা তৈরি করেছেন। কিন্তু প্রদীপের স্বল্পালোকে তা পড়তে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। এবারে তিনি তাঁর খাতা বন্ধ করে গুরুজীর মুখের দিকে তাকালেন।

গুরুজী বললেনঃ অগস্ত্যের জন্ম বৃত্তান্ত আমি আগেই বলেছি।

আমি সেই কথা মনে করবার চেষ্টা করলাম। আমার মতো অনেকেই বোধহয় ভাবতে লাগলেন।

গুরুজী বললেনঃ মিত্রাবরুণ তাঁর পিতা, মাতা উর্বশী। তাঁরও জন্ম হয়েছিল বশিষ্ঠের সঙ্গে যজ্ঞের কুম্ভের ভিতর। আদিত্য যজ্ঞে মিত্র ও বরুণের নিকট উর্বশী এসেছিলেন। সে গল্প বলা হয়ে গেছে। ঋগ্বেদের গল্প। অযোনিসম্ভূত এই তুই ঋষি বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা। অনেক ঋক্ তাঁরা রচনা করেছেন।

গুরুজী একটু থেমে বললেনঃ ভাগবতে অন্য কথা আছে। ভাগবতের মতে অগস্ত্য পুলস্ত্যের পুত্র। কিন্তু অন্য পুরাণে এই কথার সমর্থন নেই। তাহলে অগস্ত্যের অসংখ্য নামের মধ্যে মৈত্রাবরুণি উর্বশীয় কুম্ভসম্ভব প্রভৃতি নাম প্রধান হয়ে উঠত না। এই জন্যেই আমি অগস্ত্যকে দশানন রাবণের খুড়ো বলে মনে করি না।

তাউজী বললেনঃ কিন্তু দক্ষিণের সঙ্গে অগস্ত্যের একটা যোগাযোগ ছিল। বিন্ধ্য পর্বত অতিক্রম করে তিনি উত্তরের আর্য সভ্যতা দক্ষিণ দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন।

গুরুজী বললেনঃ তা সত্য। আর একটি কথাও সত্য।

কী?

রামায়ণের উপনায়ক হলেন রাবণ। অগস্ত্যের সঙ্গে তাঁর কোন সম্বন্ধ থাকলে সে কথা আমরা রামায়ণেই পেতাম।

এ যুক্তি না মেনে উপায় নেই। ভাউজী বললেন ঃ তা ঠিক।

গুরুজী বললেন ঃ দুরূহ হলেও একটি বিষয়ের আলোচনা আমাদের সংক্ষেপে করা দরকার। বেদে আমরা যে সব দেবতার উল্লেখ পাই, তাঁরা প্রত্যেকেই এক একটি প্রাকৃতিক শক্তির অধিকারী। তেমনি বৈদিক ঋষিদেরই দেখি নক্ষত্র মণ্ডলীর এক একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র রূপে। বেদের কাহিনীগুলি সবই রূপক। এই কথা সত্য বলে স্বীকার করে নিলে বশিষ্ঠ ও অগস্ত্যের জন্মেরও একটা অর্থ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। সপ্তর্ষি মণ্ডলের বশিষ্ঠের মতো অগস্ত্যও একটি অতি উজ্জ্বল নক্ষত্র। শরৎকালে দক্ষিণ আকাশে এই নক্ষত্র দেখা যায়। অগস্ত্যের পাশে যে ছোট তারা তারই নাম লোপামুদ্রা।

সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় আকাশের বর্ণবিভাকে অনেকে অপ্সরা মনে করেন, আর অপ্সরাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন উর্বশী। বেদের ঋষি বৃষ্টির জন্য বিশ্বদেবগণের স্তব করছেন, গোসমূহের মাতা ইলা ও উর্বশী নদীগণের সহিত আমাদের প্রতি অনুকূল হউন; নিরতিশয় দীপ্তিশালিনী উর্বশী আমাদের যাগাদি ক্রিয়ার প্রশংসা করে এবং যজমানকে দীপ্তি দ্বারা সমাস্থিত করে উপস্থিত হউন।

সে যুগে উর্বশীর প্রকাশ হলে বৃষ্টি আসন্ন বলে মনে করা হত। এই উর্বশী র সঙ্গে মিলন হয়েছিল মিত্রাবরুণের। তারই ফলে অগস্ত্যের জন্ম হল কুম্ভে ও বশিষ্ঠের জন্ম জলাশয়ে। আকাশের অগস্ত্য বোধহয় পশ্চিম ভারতের মরুভূমি অঞ্চল থেকে দৃষ্ট হত। সেখানে বৃষ্টির জল ধরতে হত কুম্ভের মধ্যে। বশিষ্ঠ দেখা যেত আর্যদের বাসস্থান সপ্ত সিন্ধব ও ব্রহ্মাবর্ত থেকেও, যেখানে বৃষ্টির জল জলাশয়ে জমত এবং নদী বইত দেশের উপর দিয়ে। বশিষ্ঠ ও অগস্ত্যের জন্ম বৃত্তান্ত এই ঘটনারই রূপক।

এ কথা আমার কাছে একেবারে নূতন বলে মনে হল, কিন্তু গুরুজী বললেনঃ দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতরা এ নিয়ে প্রচুর আলোচনা করেছেন, কৌতূহল থাকলে তোমরা নিজেরা তা পড়ে নিও।

আমি জানি, এই আশ্রম ছেড়ে গেলে এ সম্বন্ধে আর কিছু জানবার সুযোগ আর আমাদের হবে না। জীবন যুদ্ধে আমাদের ক্ষত বিক্ষত হতে হবে। তবু আমি আমার আগ্রহ প্রকাশ করতে সাহস পেলাম না। আমার মতো আগ্রহ আর কারও হল কিনা জানি নে, কিন্তু কেউ কোন প্রশ্ন করলেন না, আমার মতো সবাই রইলেন নীরব হয়ে।

গুরুজী বললেনঃ অগস্ত্য ভেবেছিলেন, তিনি দার পরিগ্রহ করবেন না, তপস্যাতেই সারা জীবন অতিবাহিত করবেন। কিন্তু এই সংকল্পে স্থির থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। যে কারণে যাযাবর ঋষি জরৎকারুকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করতে হয়েছিল, সেই ঘটনা অগস্ত্যের ভাগ্যেও ঘটল। অগস্ত্য একদিন দেখলেন যে তাঁর পিতৃপুরুষেরা এক গর্তের মধ্যে অধোমুখে ঝুলছেন। অগস্ত্য তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদের এ অবস্থা কেন?

পূর্বপুরুষেরা বললেন, বংশলোপের আশঙ্কায় আমাদের এই অবস্থা। তুমি বিবাহ করে বংশ রক্ষা না করলে আমাদের নরক ভোগ অনিবার্য।

অগস্ত্য কথা দিলেন যে তিনি তাঁদের মনোরথ পূর্ণ করবেন। কিন্তু নিজের যোগ্য কন্যার সন্ধান পেলেন না। শেষে তিনি সমস্ত প্রাণীর শ্রেষ্ঠ অঙ্গের সমন্বয়ে এক অপরূপা নারীর কল্পনা করলেন। সেই সময় বিদর্ভরাজ তপস্যা করছিলেন সন্তান লাভের জন্য। তাঁরই মহিষীর গর্ভে অগস্ত্যের মানসী স্ত্রীর জন্ম হল। তাঁর নাম হল লোপামুদ্রা।

এই কন্যা যখন বিবাহযোগ্যা হলেন, তখন অগস্ত্য এলেন রাজার নিকট। বললেন, আপনার কন্যা আমাকে দান করুন।

এ কী প্রস্তাব! রাজা চমকে উঠলেন। সুখ সমৃদ্ধিতে লালিত একমাত্র কন্যাকে দিতে হবে চীর বল্কলধারী দরিদ্র ঋষির হাতে! কিন্তু প্রত্যাখ্যান করাও যায় না। ঋষি ক্রুদ্ধ হলে তাঁর শাপে সর্বনাশ হয়ে যাবে। রাণীও নীরব হয়ে রইলেন। কিন্তু লোপামুদ্রা নিজে এই সমস্যার সমাধান করে দিলেন। বাপ-মাকে বললেন, ঋষির হাতেই আমাকে সম্প্রদান করুন।

লোপামুদ্রার বিবাহ হল অগস্ত্যের সঙ্গে। তারপর অগস্ত্য বললেন, তুমি তোমার ঐ বসন ভূষণ পরিত্যাগ করে ব্রতচারিণীর বেশ ধারণ কর।

লোপামুদ্রা তাই করলেন, চীর ও বল্কল পরে রাজকন্যা হলেন তপস্বিনী।

দীর্ঘ দিন অগস্ত্য গঙ্গাদ্বারে তপস্যা করলেন, তারপর একদিন তাঁর কামনা জানালেন লোপামুদ্রাকে। সলজ্জে লোপামুদ্রা বললেন, আমার এই তপস্বিনীর বেশ আমি অপবিত্র করতে চাই নে। উপযুক্ত বসন ভূষণ আভরণে সজ্জিত হয়ে মহার্ঘ শয্যায় আমাদের মিলন হোক।

অগস্ত্য বললেন, তাই হোক।

তারপর অর্থের সন্ধানে ঋষি বেরিয়ে পড়লেন। পর পর তিন জন রাজার কাছে তিনি গেলেন। তাঁদের যত আয় তত ব্যয়। এই রাজাদের নিকট অর্থ নিলে কারও কষ্ট হবে বলে অগস্ত্য তাঁদের সঙ্গে ইল্বল নামে এক ধনী দানবের নিকট গেলেন।

ইল্বলের ভ্রাতার নাম বাতাপি। বাতাপিকে মেষে পরিণত করে তার মাংস রেঁধে ইল্বল ব্রাহ্মণ অতিথিদের খাওয়াত। তারপরে ডাকত বাতাপিকে। বাতাপি অমনি সেই ব্রাহ্মণের উদর ভেদ করে বেরিয়ে আসত। এমনি করে অনেক ব্রাহ্মণ তারা হত্যা

করেছিল। অগস্ত্যের বেলাতেও ইল্বল তাই করল। রাজারা ভয়ে তটস্থ হয়ে গেলেন। কিন্তু অগস্ত্য নির্ভীক ভাবে সমস্ত মাংস একাই খেলেন। তারপর ইল্বল যখন বাতাপিকে ডাকতে লাগল, তখন কোন সাড়া এল না। অগস্ত্য বললেন, তাকে আর তুমি ফিরে পাবে না, আমি তাকে জীর্ণ করে ফেলেছি।

ইল্বল এই কথা শুনে বিষণ্ণ হল, বলল, কী চাই আপনাদের বলুন।

অগস্ত্য বললেন, তুমি ধনী বলে শুনেছি। অন্যের ক্ষতি না করে যা দিতে পার, তাই দাও।

ইল্বল বলল, আমি আপনাদের কী দান করতে চাই সে কথা যদি বলতে পারেন, তবেই দেব।

অগস্ত্য বললেন, তুমি এই রাজাদের অযুত ধেনু ও অযুত স্বর্ণ মুদ্রা দিতে চাও। আর আমাকে দিতে চাও দ্বিগুণ। এ ছাড়া দুটি অশ্ব ও একটি সোনার রথ দেবারও ইচ্ছা তোমার হয়েছে।

ইল্বল দুঃখিত মনে তার চেয়েও বেশি ধন দান করলেন।

লোপামুদ্রার জন্য অগস্ত্য আনলেন রাজকন্যার উপযুক্ত শয্যা ও বসন ভূষণ। তারপর মিলিত হলেন তাঁর সঙ্গে। লোপামুদ্রা সহস্র পুত্রের বদলে এক পুত্র চেয়েছিলেন। সেই পুত্রের নাম দৃঢ়স্যু বা ইধ্মবাহ। পরবর্তী কালে ইনি বেদজ্ঞ কবি হয়েছিলেন।

অগস্ত্য একবার দেবতাদের অনুরোধে সমুদ্রের সমস্ত জল পান করে ফেলেন। বৃত্রাসুর বধের পর কালকেয় নামে অসুররা প্রাণরক্ষার জন্য সমুদ্রে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে তারা সমুদ্রের জল থেকে বেরিয়ে সকলের উপর অত্যাচার করত। এদের দমন করতে না পেরে দেবতারা অগস্ত্যের শরণ নেন। অগস্ত্য আর বিলম্ব না করে সমুদ্রটাই শোষণ করে ফেললেন। অসুররা নিরাশ্রয় হল, তারপর দেবতারা তাদের ধ্বংস করলেন।

সমুদ্র শোষণের মতো আর একটা গল্প আমার মনে পড়ল। জহ্নু মুনিও এক গণ্ডূষে গঙ্গাকে পান করে ফেলেছিলেন।

তাউজী বললেন : অদ্ভুত ক্ষমতা।

গুরুজী হেসে বললেন : জহ্নু মুনিরও এই ক্ষমতা ছিল। তিনি গঙ্গাকে পান করেছিলেন। এই মুনির জন্ম কিন্তু রাজা পুরুরবার বংশে। সর্বমেধ নামে এক বিরাট যজ্ঞ করে ইনি রাজর্ষি নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

তাউজী বললেন : তারপর ?

গঙ্গা এঁকে পতি রূপে পেতে চেয়েছিলেন। তাই অভিসারিকার বেশে গিয়েছিলেন মুনির কাছে। মুনি তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন। গঙ্গা রেগে গিয়ে তাঁর যজ্ঞস্থল প্লাবিত করবার চেষ্টা করতেই জহ্নু এক গণ্ডূষে তাঁকে পান করে ফেললেন। অন্য ঋষিরা এসে স্থির করলেন যে গঙ্গা জহ্নুর কন্যা হবে। সেই থেকে তাঁর নাম হল জাহ্নবী। জহ্নু যুবনাশ্বের কন্যা কাবেরীকে বিবাহ করেছিলেন।

গুরুজী এইবারে স্বর্গচ্যুত ইন্দ্রের গল্প বললেন। ইন্দ্রের গল্প ঠিক নয়, সে গল্প আছে দেবতার কথায়। ইন্দ্রাণী শচী কী ভাবে রক্ষা পেলেন সেই গল্প। অগস্ত্যের জন্যই ইন্দ্র তাঁর রাজ্য ফিরে পেলেন।

গুরুজী বললেন : ইন্দ্র ত্বষ্টা নামে এক প্রজাপতির দুই পুত্র ত্রিশিরা ও বৃত্রাসুরকে বধ করেন। তাতে তাঁর শুধু ব্রহ্মহত্যার পাপই হয় নি, মিথ্যাচারের গ্লানিও হয়েছিল। মহাদেবের ভূতরা ইন্দ্রকে ব্রহ্মহত্যাকারী বলে সব সময় লজ্জা দিতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তিনি আত্মগোপন করে বাস করতে বাধ্য হলেন।

দেবরাজের অভাবে রাজ্যের অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে লাগল। একজন রাজার দরকার। দেবতারা কেউ রাজী হলেন না বলে সবাই নহুষকে রাজা করলেন। নহুষ তেজস্বী ও ধার্মিক ছিলেন, কিন্তু স্বর্গের রাজা হয়ে বিলাসী হয়ে উঠলেন। এবং একদিন ইন্দ্রাণী শচী কেন তাঁর সেবা করবেন না, এই কথা সভায় প্রকাশ করলেন।

ভয় পেয়ে শচী দেবগুরু বৃহস্পতির নিকট আশ্রয় নিলেন এবং কী করে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পারেন সেই চিন্তা করতে লাগলেন।

এই পর্যন্ত বলে গুরুজী একটু থামলেন। তারপর বললেন: এক জায়গায় পড়েছি যে সপ্তর্ষি বাহিত রথের কথা বৃহস্পতি বলেছিলেন। আবার মহাভারতে আছে যে শচী রাত্রি দেবীর উপাসনা করে তাঁরই সাহায্যে ইন্দ্রের দর্শন পেয়েছিলেন। ইন্দ্র তাঁকে সপ্তর্ষি বাহিত রথের পরামর্শ দিয়েছিলেন। যেই বলে থাকুন, শচী এসে নহুষকে বললেন, আমি আপনার সেবা করতে রাজী আছি, কিন্তু আপনি আমার কাছে এমন রথে চড়ে আসুন যা পৃথিবীতে আর কারও নেই। ঋষিরা আপনার রথের বাহন হবেন, এই আমার বাসনা।

নহুষ বললেন, অপূর্ব তোমার কল্পনা, তোমার মনোরথ আমি পূর্ণ করব।

এই সপ্তর্ষি বাহিত রথে ইন্দ্রাণী শচীর কাছে আসবার সময়েই নহুষের পতন হল। রথে বসে বাহন ঋষিদের সঙ্গে ধর্ম নিয়ে বিবাদ করতে গিয়ে তাঁর পা অগস্ত্যের মাথায় লাগল। ক্রুদ্ধ হয়ে অগস্ত্য তাঁকে শাপ দিলেন, তোমার এই দম্ভের জন্য তুমি স্বর্গচ্যুত হবে এবং পৃথিবীতে বাস করবে সর্প রূপে।

নহুষের পতন হল, শচী হলেন বিপন্মুক্ত, আর দেবরাজ ইন্দ্রও আবার স্বর্গরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

গুরুজী বললেন: অগস্ত্য যাত্রা এই ঋষির আর একটি মহৎ কাজ। জগতের কল্যাণের জন্য তিনি স্বেচ্ছানির্বাসন বরণ করেছিলেন।

বিন্ধ্য পর্বত ভারতকে দু ভাগে বিভক্ত করেছে। উত্তরে আর্য বসতি, দক্ষিণে অনার্য অধিকার। আর্যরা বিন্ধ্য পেরিয়ে দক্ষিণ ভারতে তখনও যাতায়াত শুরু করে নি, এমনি সময় বিন্ধ্য একদিন

মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। বলল, সুমেরু পর্বতের চেয়ে আমি কম নই। সূর্য যেমন সুমেরুকে প্রদক্ষিণ করে, তেমনি সে আমাকেও প্রদক্ষিণ করবে।

কিন্তু সূর্য তাতে সম্মত হল না। বিন্ধ্য বলল, তবে দাঁড়াও, আমার মাথার উপর দিয়ে তোমাকে যেতে দেব না।

বলে নিজের দেহকে ক্রমেই বড় করতে লাগল। শেষে সূর্যের পথ হল রুদ্ধ। দিবারাত্রি একাকার হয়ে গেল। দেবতারাও ভয় পেলেন। এই বিপদে কে রক্ষা করবে! আছেন অগস্ত্য, বিন্ধ্য পর্বতের গুরু তিনি। দেবতারা এসে অগস্ত্যের শরণ নিলেন। অগস্ত্য সম্মত হয়ে বললেন, আমি এর বিহিত করব।

তারপর এলেন শিষ্যের কাছে। বিন্ধ্য মাথা নত করে গুরুকে প্রণাম করল। গুরু আশীর্বাদ করে বললেন, বৎস, যতদিন না আমি দক্ষিণ থেকে ফিরি, তুমি এমনি মাথা নত করেই থাক।

গুরু চলে গেলেন, আর ফিরলেন না। শিষ্য আজও মাথা নত করে আছে।

পণ্ডিতরা হিসাব করে দেখেছেন যে সেদিন ছিল পয়লা ভাদ্র, এই দিনে অগস্ত্য যাত্রা করে আর ফেরেন নি। পয়লা ভাদ্র তাই যাত্রা নিষিদ্ধ হয়েছিল। এখন সকল মাসের পয়লাই যাত্রার জন্য অশুভ বলা হয়। আমরা বলি 'অগস্ত্য যাত্রা'।

তাউজীর মুখের দিকে তাকিয়ে গুরুজী বললেন: তোমার মনে একটু সংশয় জেগেছে মনে হচ্ছে। কোন প্রশ্ন করবে?

তাউজী বললেন: অগস্ত্য যাত্রা একটি মহৎ কাজ বলে আপনি বলেছিলেন। এই গল্পে আমার সে প্রত্যয় হল না।

গুরুজী বললেন: বিন্ধ্যকে শাসন করাই অগস্ত্যের উদ্দেশ্য মনে করেছ বলে তোমার এই সংশয় উপস্থিত হয়েছে। আমি মনে করি যে সেই ঋষি দক্ষিণে গিয়েছিলেন আর্য সভ্যতা বিস্তারের জন্য। যে সভ্যতা শুধু উত্তর ভারতের সিন্ধু ও সরস্বতী নদীর উপত্যকায়

সীমাবদ্ধ হয়ে ছিল, তাকে তিনি অনার্য ভারতে নিয়ে গেলেন। আর্য সভ্যতার প্রসার হল উত্তর থেকে দক্ষিণে।

একটু থেমে বললেন : গ্রহ নক্ষত্রের হিসাব যাঁরা রাখেন, তাঁরা ঠিক বলতে পারবেন। দক্ষিণ আকাশে অগস্ত্য একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। প্রতি বছর ভাদ্রের মাঝামাঝি নাকি এই নক্ষত্রের উদয় হয়। মধ্যভারত থেকে দক্ষিণে পৌঁছতে পনর কুড়ি দিন সময় লাগে বৈকি!

ঋষির কথা গুরুজী আজ এইখানেই শেষ করলেন।

পঁচিশ

আমি বুঝতে পারছিলাম যে ঋষির কথা শেষ হতে আর বেশি বাকি নেই, দু এক দিনেই এই প্রসঙ্গ শেষ হয়ে যাবে। পরদিন দুপুর বেলায় আমি অনেকখানি লিখে ফেললাম। তারপর যখন ক্লান্তি বোধ হল, তখন মহাভারত খুলে পড়তে লাগলাম।

উদ্যোগ পর্বে একটা অদ্ভুত গল্প আমার চোখে পড়ল। বিশ্বামিত্রের শিষ্য গালবের গল্প। বিশ্বামিত্রের কথায় গুরুজী আমাদের এ গল্প বলেন নি। একদিন বশিষ্ঠের রূপে ধর্ম এসেছিলেন বিশ্বামিত্রের কাছে। বিশ্বামিত্র তাঁর সৎকারের জন্য চরু প্রস্তুত করতে লাগলেন, কিন্তু ধর্ম অন্য ঋষির কাছে ভোজন করলেন। বিশ্বামিত্রের কাছে ফিরে এসে বললেন, তুমি আমার জন্য অপেক্ষা কর, আমি এই চরু পরে খাব।

বিশ্বামিত্র চরুর পাত্র মাথায় নিয়ে এক বৎসর দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ধর্ম এসে সেই চরু খেলেন।

এই সময়ে গালব নামে বিশ্বামিত্রের এক শিষ্য তাঁর সেবা করেছিলেন। গুরুর কাছে বিদায় নেবার সময় তিনি গুরুদক্ষিণা কী দেবেন তা জানতে চাইলেন। বিশ্বামিত্র আটশো সাদা অশ্ব চাইলেন, তাদের একটি কান কালো। এই রকমের এক হাজার অশ্ব শুল্ক দিয়ে ঋচীক মুনি গাধি রাজার কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করেছিলেন। ঋচীক বরুণের কাছ থেকে সেই অশ্ব সংগ্রহ করেছিলেন।

গালব চিন্তান্বিত হয়ে রাজা যযাতির নিকট গেলেন। যযাতি সব শুনে বললেন, আমার অবস্থা এখন তেমন ভাল নয়, অশ্ব আমি

দিতে পারব না। তবে আমার কন্যা মাধবীকে আমি দিচ্ছি, রাজাদের নিকট শুল্ক স্বরূপ আপনি অশ্ব সংগ্রহ করুন।

এর পরের কাহিনী আমার কাছে বড় অদ্ভুত মনে হল। মাধবীকে নিয়ে গালব এক রাজার কাছে গেলেন। তাঁর কাছে দুশো অশ্ব ছিল, তার বিনিময়ে গালব মাধবীকে দিলেন। ঠিক হল যে একটি পুত্র হলেই মাধবীকে তিনি অন্য রাজার কাছে বাকি অশ্ব সংগ্রহের জন্য নিয়ে যাবেন। এমনি করে গালব তিন জন রাজার নিকট ছশো অশ্ব সংগ্রহ করলেন, আর মাধবীর তিন পুত্র হল তিন জন রাজার নিকট। আর দুশো অশ্ব সংগ্রহ করতে না পেরে গালব গুরু বিশ্বামিত্রের নিকট মাধবীকে নিয়ে এলেন। বললেন, এই ছশো অশ্ব ও বাকি দুশোর জন্য মাধবীকে আমি আপনাকে দিলাম।

বিশ্বামিত্র বললেন, মাধবীকে নিয়ে এত ঘোরাঘুরির তোমার দরকার ছিল না। তাকে তুমি আমার কাছেই আনতে পারতে। আমাকেই সে চারটি পুত্র দিতে পারত।

মাধবীর সঙ্গে সংসার করে বিশ্বামিত্রেরও একটি পুত্র হল। তারপর গালব মাধবীকে ফিরিয়ে দিলেন তাঁর পিতার নিকট। যযাতি কন্যার বিবাহের জন্য স্বয়ম্বর সভা ডাকলেন। সেখানে গণ্যমান্য সবাই এসে উপস্থিত হলেন। মাধবীর এই জীবন সমাজে নিন্দনীয় ছিল না, সকলেই মাধবীকে পরম শ্রদ্ধায় গ্রহণ করতে সম্মত ছিলেন।

ঠিক এই সময়ে মিসেস খুরানা এসে আমাকে ডাকলেন, বললেন ঃ আর কতক্ষণ পড়বেন ?

মিসেস খুরানার কণ্ঠস্বর শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম। সামলে নিয়েই বই বন্ধ করলাম।

মিসেস খুরানা বললেন ঃ একটু পরে আবার তো গুরুজীর আসরে গিয়ে বসতে হবে, চলুন একটু বেড়িয়ে আসি। গঙ্গার ধারে গেলে মাথাটাও হাল্কা হবে।

আমি জানি মিসেস খুরানা আমাকে ছেড়ে দেবেন না, আপত্তি করলে আরও বেশি জোর করবেন। কথা না বলে আমি উঠে পড়লাম। বিছানায় শুয়ে চেনেলু ঘুমচ্ছিল, সে ঘুমিয়ে রইল।

ধীরে ধীরে আমরা আশ্রমের কুটীরগুলি ছাড়িয়ে গঙ্গার ধারে এলাম।

মিসেস খুরানা বললেন ঃ সুপ্তির কাণ্ডটা দেখলেন ?

আমি চারি দিকে চেয়ে তাকে দেখতে পেলাম না। বললাম ঃ না তো।

মিসেস খুরানা বললেন ঃ এখানে কী দেখছেন ! আমরা যখন বেরচ্ছিলাম, তখন ঘরের ভেতর থেকে জানালা দিয়ে দেখছিল। ভারি পাকা মেয়ে। নিশ্চয়ই ওর বাপের কাছে লাগাবে।

কী লাগাবে ?

এই যে মাঝে মাঝে আমি আপনাকে সঙ্গে নিয়ে বেরচ্ছি, এরই হয়তো একটা খারাপ মানে করবে।

আমি বললাম ঃ খারাপ মানে কেন করবে ?

করলেই হল। খারাপ জিনিষই তো বেশি মুখরোচক। দেখছেন না কোন গল্প অশ্লীল বলে গুরুজী যখন বলতে চান না, তখনই সকলের কৌতূহল আরও বেড়ে যায় !

এ কথার উত্তর আমি দিলাম না।

মিসেস খুরানা বললেন ঃ চেনেলু ছেলেটাও কম যায় না। ওরও খুব কড়া নজর। ঘুমের ভাণ করে মটকা মেরে পড়ে ছিল। ঘর থেকে আমরা বেরিয়ে আসতেই সে পা দোলাতে লাগল।

আমি হেসে বললাম ঃ আপনার নজরও তো খুব ভাল।

মিসেস খুরানা গর্বিত ভাবে বললেন ঃ আমাদের চৌখস নজরের দরকার আছে। যখন কলেজে পড়তাম, তখন সব ছেলেদের ওপর

নজর রাখতে হত, অথচ একটা ছেলেও তা জানতে পাবে না। তারা ভাববে কারও ওপরেই আমার নজর নেই। তা না হলে কি তাদের সামলানো যায়!

আমি আশ্চর্য হয়েছিলাম, কিন্তু সে ভাব গোপন করে বললাম ঃ ঠিক কথা।

সমর্থন পেয়ে মিসেস খুরানা বললেন ঃ আমি জানি, ওরা আমাকে ছেড়ে কথা কইবে না।

কেন?

কেন আবার, পরনিন্দার মতো মুখরোচক জিনিষ কি ছুনিয়ায় আর আছে?

এ প্রসঙ্গ এড়াবার জন্য আমি বললাম ঃ আজ কোন্ দিকে যাবেন?

মিসেস খুরানা বললেন ঃ আজ গীতাভবনের দিকে চলুন। কিছুদূর গিয়েই না হয় ফিরে আসব।

চলুন।

বলে আমি অগ্রসর হলাম।

চলতে চলতে মিসেস খুরানা বললেন ঃ অমন মনোযোগ দিয়ে আপনি কী পড়ছিলেন?

সংক্ষেপে বললাম ঃ গালব ও মাধবীর গল্প।

সর্বনাশ, এও কি ঋষির কথা নাকি!

বললাম ঃ গালব ঋষি, কিন্তু মাধবী রাজকন্যা।

মিসেস খুরানা সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ বিয়ে হয়ে গেল তো!

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই বললেন ঃ সে যুগের ব্যাপার বড় আশ্চর্যের ছিল দেখছি। ঋষিরাই রাজকন্যাদের বিয়ে করতেন। বেচারি রাজপুত্রের ভাগ্যে কী জুটত জানি নে। আর বলিহারি রাজকন্যাদেরও। রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসে

হাসিমুখে ঢুকতেন বুড়ো বুড়ো ঋষির আশ্রমে। পরনে গাছের বাকল, আর আহার বনের ফলমূল। তাতেই তৃপ্তি।

অসতর্ক ভাবে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল: মাধবীর জীবন ছিল আরও অদ্ভুত।

কী রকম?

আমি ইতস্তত করছিলাম।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মিসেস খুরানা বললেন: লজ্জা কিসের! বলুন না।

আমি জানতাম যে মিসেস খুরানা আর মানবেন না, তাই সংক্ষেপে গল্পটা বললাম।

মিসেস খুরানা বললেন: ভারি মজার গল্প তো। সমাজে তাহলে এ রকমের ঘটনাও ঘটত। একেবারে ভাড়া খাটানো ব্যাপার।

আমার আর একটি গল্প মনে পড়ল। মহাভারতের প্রথম দিকেই তা পড়েছি। বেদের শিষ্য উতঙ্কের গল্প। বেদ ঋষি আশ্রমে নেই, শিষ্য উতঙ্ককে রেখে তিনি প্রবাসে গিয়েছিলেন। সেই সময় উপাধ্যায়ানী ঋতুমতী হয়েছেন। আশ্রমের নারীরা উতঙ্কের নিকট যে প্রস্তাব আনলেন, উতঙ্ক সেই অকার্য পালন করতে পারেন নি। গুরু ফিরে এসে এই কথা শুনে শিষ্যের উপর সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

আমি এই কাহিনী পড়ে খুবই আশ্চর্য হয়েছিলাম। সমাজে প্রচলিত না থাকলে গুরুপত্নীর সঙ্গে সহবাসের প্রস্তাব অন্য স্ত্রীলোকেরা শিষ্যের কাছে আনত না।

এই রকমের আরও একটি গল্প মহাভারতে পড়লাম। ঋষি উদ্দালক ও শ্বেতকেতুর গল্প। শ্বেতকেতু তাঁর পিতামাতার সঙ্গে বসে ছিলেন। এমন সময় একজন ব্রাহ্মণ এসে তাঁর মায়ের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন। এই অনাচার দেখে শ্বেতকেতু ক্ষিপ্ত

নজর রাখতে হত, অথচ একটা ছেলেও তা জানতে পাবে না। তারা ভাববে কারও ওপরেই আমার নজর নেই। তা না হলে কি তাদের সামলানো যায়!

আমি আশ্চর্য হয়েছিলাম, কিন্তু সে ভাব গোপন করে বললাম: ঠিক কথা।

সমর্থন পেয়ে মিসেস খুরানা বললেন: আমি জানি, ওরা আমাকে ছেড়ে কথা কইবে না।

কেন?

কেন আবার, পরনিন্দার মতো মুখরোচক জিনিষ কি তুনিয়ায় আর আছে?

এ প্রসঙ্গ এড়াবার জন্য আমি বললাম: আজ কোন্ দিকে যাবেন?

মিসেস খুরানা বললেন: আজ গীতাভবনের দিকে চলুন। কিছুদূর গিয়েই না হয় ফিরে আসব।

চলুন।

বলে আমি অগ্রসর হলাম।

চলতে চলতে মিসেস খুরানা বললেন: অমন মনোযোগ দিয়ে আপনি কী পড়ছিলেন?

সংক্ষেপে বললাম: গালব ও মাধবীর গল্প।

সর্বনাশ, এও কি ঋষির কথা নাকি!

বললাম: গালব ঋষি, কিন্তু মাধবী রাজকন্যা।

মিসেস খুরানা সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করলেন: বিয়ে হয়ে গেল তো!

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই বললেন: সে যুগের ব্যাপার বড় আশ্চর্যের ছিল দেখছি। ঋষিরাই রাজকন্যাদের বিয়ে করতেন। বেচারি রাজপুত্রের ভাগ্যে কী জুটত জানি নে। আর বলিহারি রাজকন্যাদেরও। রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসে

হাসিমুখে ঢুকতেন বুড়ো বুড়ো ঋষির আশ্রমে। পরনে গাছের বাকল, আর আহার বনের ফলমূল। তাতেই তৃপ্তি।

অসতর্ক ভাবে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল: মাধবীর জীবন ছিল আরও অদ্ভুত।

কী রকম ?

আমি ইতস্তত করছিলাম।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মিসেস খুরানা বললেন: লজ্জা কিসের! বলুন না।

আমি জানতাম যে মিসেস খুরানা আর মানবেন না, তাই সংক্ষেপে গল্পটা বললাম।

মিসেস খুরানা বললেন: ভারি মজার গল্প তো। সমাজে তাহলে এ রকমের ঘটনাও ঘটত। একেবারে ভাড়া খাটানো ব্যাপার।

আমার আর একটি গল্প মনে পড়ল। মহাভারতের প্রথম দিকেই তা পড়েছি। বেদের শিষ্য উতঙ্কের গল্প। বেদ ঋষি আশ্রমে নেই, শিষ্য উতঙ্ককে রেখে তিনি প্রবাসে গিয়েছিলেন। সেই সময় উপাধ্যায়ানী ঋতুমতী হয়েছেন। আশ্রমের নারীরা উতঙ্কের নিকট যে প্রস্তাব আনলেন, উতঙ্ক সেই অকার্য পালন করতে পারেন নি। গুরু ফিরে এসে এই কথা শুনে শিষ্যের উপর সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

আমি এই কাহিনী পড়ে খুবই আশ্চর্য হয়েছিলাম। সমাজে প্রচলিত না থাকলে গুরুপত্নীর সঙ্গে সহবাসের প্রস্তাব অন্য স্ত্রীলোকেরা শিষ্যের কাছে আনত না।

এই রকমের আরও একটি গল্প মহাভারতে পড়লাম। ঋষি উদ্দালক ও শ্বেতকেতুর গল্প। শ্বেতকেতু তাঁর পিতামাতার সঙ্গে বসে ছিলেন। এমন সময় একজন ব্রাহ্মণ এসে তাঁর মায়ের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন। এই অনাচার দেখে শ্বেতকেতু ক্ষিপ্ত

হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু তাঁর পিতা উদ্দালক শান্ত ভাবে বললেন, এ কাজ সনাতন ধর্ম বিরুদ্ধ নয়, এতে আপত্তি করা চলে না। গাভীর মতো নারীরও বহু পুরুষ সংসর্গে অধর্ম হয় না।

কিন্তু শ্বেতকেতু এ কথা মানলেন না। তিনি নূতন সমাজ ব্যবস্থা প্রচার করেছিলেন। সেই নিয়মে নারীর এক পতি ও পুরুষের এক পত্নী হবে, এবং স্বামীর অনুমতিতে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনে স্ত্রীর আপত্তি করা চলবে না।

এই গল্প থেকে দুটি জিনিষ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। সেটি হচ্ছে পুরুষ ও নারীর অবাধ সম্পর্ক, এবং বংশরক্ষার প্রয়োজনীয়তা। সমাজে প্রচলিত যে ব্যবস্থা শ্বেতকেতু ঘৃণায় বন্ধ করলেন, বংশরক্ষার জন্য তার ব্যতিক্রম তিনি অনুমোদন করলেন।

এ সব কথা আমি মিসেস খুরানার সঙ্গে আলোচনা করতে পারলাম না। এ আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব কাজ।

মিসেস খুরানা আমাকে নীরব দেখে বললেন: বড় অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে আপনাকে, কী ভাবছেন বলুন তো!

আমি আত্মরক্ষার জন্য মিথ্যা কথা বললাম: গুরুজী আজ কোন্ ঋষির কথা বলবেন, তাই ভাবছি।

মিসেস খুরানা চটে উঠলেন, বললেন: ছিঃ, আপনার সঙ্গে বেরিয়ে দেখছি নিতান্তই ভুল করেছি।

তবু আমি সত্য কথা বলতে পারলাম না।

ছাব্বিশ

সন্ধ্যাবেলায় যথারীতি আমরা উপাসনার মন্দিরে সমবেত হলাম। তাউজী আজ আমাদের মধ্যে ছিলেন না, গুরুজীরও আসতে দেরি হচ্ছিল। আমি সুপ্তির দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিয়ে তাকালাম।

সুপ্তি আমার প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছিল। বলল: দুজনে এক সঙ্গে আসবেন।

তারপরেও একটা প্রশ্ন থাকে, কেন!

সুপ্তি এই নিঃশব্দ প্রশ্নেরও জবাব দিল: ঋষির কথা আজ শেষ করা যাবে কিনা, সেই আলোচনা হচ্ছে।

সত্যিই তাই। ঋষির কথায় আর কোন বড় ঋষির নাম আমার জানা নেই। এদেশে অসংখ্য ঋষি ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সকলের দান সমান নয়। যাঁরা কিছু দিয়ে গেছেন, তাঁদেরই আমরা মনে রেখেছি। আর মনে রেখেছি তাঁদের, যাঁদের সম্বন্ধে কোন কাহিনী প্রচলিত আছে।

আমরা যখন এই সব কথা ভাবছি, তখন গুরুজী এলেন, পিছনে এলেন তাউজী। দুজনেই বসলেন। গুরুজী বললেন: রামায়ণে যে ঋষিদের উল্লেখ আছে, তাঁদের কথা আমি মোটামুটি বলেছি। আজ মহাভারতের ঋষিদের কথা সংক্ষেপে বলব। অনেক ঋষির কথাই হয়তো বাদ যাবে, তার দুটি কারণ। প্রথমত, আমাদের কাছে ঋষিদের নামের কোন তালিকা নেই। সেই তালিকা তৈরি করতে হলে বেদ ও পুরাণ নূতন করে পড়তে হয়। তার জন্য সময়ের দরকার। দ্বিতীয় কারণ, এমন অনেক ঋষি আছেন, যাঁদের শুধু নাম আমরা জানি, তার বেশি কিছু জানি না।

এই জন্যে আমার মনে হয়, ঋষিদের কথা আমাদের আজই শেষ হতে পারে।

একটু হেসে বললেন: অন্তত আশ্রমের কর্মকর্তার তাই ইচ্ছা।

তাউজী বললেন: আজকের আলোচনার পরেও কারও যদি কিছু জানবার থাকে, তিনি আলাদা ভাবে তা আলোচনা করতে পারেন।

গুরুজী বললেন: তাহলে আমরা আয়োদধৌম্য থেকেই আরম্ভ করতে পারি। মহাভারতের আদি পর্বের কথা, একেবারে প্রথম দিকে আছে।

তাউজী জিজ্ঞাসা করলেন: ধৌম্য ও আয়োদধৌম্য কি দুজন আলাদা ঋষি?

গুরুজী বললেন: আয়োদধৌম্যের বংশ পরিচয় নেই, কিন্তু ধৌম্যের আছে। একজন নয়, দুজন ধৌম্যের পরিচয় আমরা পাই। একজন সত্য যুগের ঋষি। তাঁর পিতার নাম ব্যাঘ্রপদ। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে এঁর সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। একদিন খেলার সময় গাভী দোহন করতে দেখে তাঁর দুগ্ধ পানের বাসনা হয়। মাতার নিকট এই কথা জানালে তিনি বললেন, মহাদেবের উপাসনা করে অভীষ্ট জিনিষ পেতে হয়। এ কথা বলা ছাড়া উপায় ছিল না, ছেলেকে দুধ খাওয়াবার সঙ্গতি তাঁর ছিল না। কিন্তু ধৌম্য এর পরে কঠোর তপস্যা করে মহাদেবের বর লাভ করেন। মহাদেব বলেন যে তাঁর ইচ্ছাতেই ক্ষীর সমুদ্রের আবির্ভাব হবে।

দ্বিতীয় ধৌম্য দ্বাপরের ঋষি। তাঁর পিতার নাম অসিত, এবং দেবল তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি পাণ্ডবদের পুরোহিত ছিলেন এবং তাঁদের সুখে দুঃখে সমান অংশ গ্রহণ করেছেন। বনবাসে তাঁদের সঙ্গে ছিলেন, শুধু অজ্ঞাতবাসের সময় ছিলেন দ্রুপদ রাজার আশ্রয়ে। নারদের নিকট তিনি সূর্যের একটি স্তব পেয়েছিলেন।

সেই স্তবটি তিনি যুধিষ্ঠিরকে শেখান। আর যুধিষ্ঠির এই স্তবের প্রভাবে অক্ষয় স্থালী লাভ করেছিলেন।

আয়োদধৌম্য বা আপোদধৌম্য বিখ্যাত হয়েছিলেন তাঁর তিন শিষ্যের জন্য। সে যুগে পাঠ্যপুস্তক ছিল না, বিদ্যালয় ছিল না। কত নিগ্রহ সহ্য করে বালকদের বিদ্যার্জন করতে হত, তারই এক চিত্র আমরা দেখতে পাই। স্বেচ্ছায় শিষ্যরা গুরুগৃহ ত্যাগ করতে পারত না, গুরু যেদিন শিক্ষা শেষ হয়েছে বলবেন সেদিন শিষ্য মুক্তি লাভ করবে। তারপর গুরু দক্ষিণা।

আয়োদধৌম্যের তিন শিষ্য আরুণি উপমন্যু ও বেদ। পাঞ্চালদেশের বালক আরুণি ক্ষেতের কাজ করে। বর্ষাকালে একদিন জলপ্রবাহে ক্ষেত নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছিল। গুরু তাকে আল বাঁধতে বললেন। অনেক চেষ্টা করেও আল বাঁধতে না পেরে আরুণি নিজে শুয়ে পড়ে জলস্রোত রোধ করল। আশ্রমে আর ফিরতে পারল না।

সন্ধ্যাবেলায় শিষ্যকে দেখতে না পেয়ে গুরু অন্য দুজনকে নিয়ে আরুণিকে খুঁজতে বের হলেন। চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন তাকে। আরুণি এই ডাক শুনে উঠে এল, সকল কথা সবিনয়ে নিবেদন করল। গুরু এই কর্তব্যনিষ্ঠা দেখে সন্তুষ্ট হলেন। আরুণির নাম রাখলেন উদ্দালক, কেদারখণ্ড মানে ক্ষেতের আল বিদারণ করে উঠেছে বলে এই নাম। প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করলেন তাকে।

দ্বিতীয় শিষ্য উপমন্যুকে আরও কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। উপমন্যু গুরুর গরু চরাত। প্রতি দিন সন্ধ্যাবেলায় গরু চরিয়ে ফিরে এসে সে গুরুকে প্রণাম করত, গুরু তাকে হৃষ্টপুষ্ট দেখে একদিন প্রশ্ন করলেন, তুমি কী খাও?

উপমন্যু বলল, আমি ভিক্ষা করে খাই।

গুরু বললেন, গুরুকে নিবেদন না করে ভিক্ষান্ন খেতে নেই।

এর পর উপমন্যু প্রথম বার ভিক্ষা করে গুরুকে নিবেদন করত,

এবং দ্বিতীয় বারের ভিক্ষান্ন নিজে ভোজন করত। গুরু এ কথা জেনে বললেন, এ অন্যায়, এতে অন্য ভিক্ষাজীবীদের অসুবিধা হয়।

এর পর উপমন্যু ভিক্ষান্ন ছেড়ে গরুর দুধ খেতে লাগল। গুরু তা বারণ করলেন। তখন উপমন্যু দুধ ছেড়ে দুধের ফেনা খেতে লাগল, বাছুরেরা দুধ খেয়ে যে ফেনা উদ্গার করে তাই। কিন্তু উপমন্যুর স্বাস্থ্যের অবনতি হচ্ছে না দেখে গুরু আশ্চর্য হয়ে বললেন, এখনও তোমাকে বেশ স্থূল দেখাচ্ছে, এখন তুমি কী খাও?

উপমন্যু ফেনার কথা বললে গুরু বললেন, এও অন্যায়। তোমার জন্য বাছুরেরা বেশি ফেনা উদ্গার করে বলে তাদের পুষ্টি হচ্ছে না।

উপমন্যু এবারে অনাহারে গরু চরাতে লাগল।

একদিন ক্ষুধার জ্বালায় উপমন্যু অর্কপত্র মানে আকন্দ পাতা খেয়ে অন্ধ হয়ে গেল। তারপর পথ চলতে চলতে এক কূপের মধ্যে পড়ে গেল।

সন্ধ্যাবেলায় উপমন্যু ঘরে ফিরল না দেখে গুরু ভাবলেন যে তিনি তার সমস্ত আহার বন্ধ করেছেন বলেই হয়তো উপমন্যু রাগ করে ঘরে ফেরে নি। তাই তিনি অন্য শিষ্যদের নিয়ে তাকে খুঁজতে বের হলেন। ডাকাডাকি করে জানতে পারলেন যে উপমন্যু অন্ধ হয়ে এক কূপের মধ্যে পড়েছে। গুরু তাকে অশ্বিনীকুমারদের স্তব করতে বললেন।

উপমন্যু অশ্বিনীকুমারদের স্তব করতেই তাঁরা সামনে এলেন। বললেন, তোমার স্তবে আমরা সন্তুষ্ট হয়েছি, তুমি এই পূপ বা পিঠে খাও।

উপমন্যু বলল, গুরুকে নিবেদন না করে তো আমি কিছু খেতে পারি না।

অশ্বিনীকুমারেরা বললেন, তোমার গুরুকেও আমরা একবার পূপ দিয়েছিলাম, তিনি তা নিজের গুরুকে না দিয়েই খেয়েছিলেন।

কিন্তু উপমন্যু তার সংকল্পে স্থির ছিল, বলল, এমন অনুরোধ আপনারা আমাকে করবেন না। আমি তাঁকে নিবেদন না করে কিছু খেতে পারব না।

বালকের এই গুরু ভক্তি দেখে অশ্বিনীকুমারেরা মুগ্ধ হলেন, আশীর্বাদ করলেন, তুমি চক্ষুষ্মান হবে, তোমার দাঁত হবে সোনার ও তুমি শ্রেয়োলাভ করবে।

এই সঙ্গে তাঁরা আরও বললেন, তোমার গুরুর দাঁত হবে কৃষ্ণ লৌহময়।

উপমন্যু তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়ে গুরুর কাছে এসে সমস্ত নিবেদন করল। গুরুও প্রসন্ন হয়ে তাকে আশীর্বাদ করলেন।

গুরুজী বললেন: তৃতীয় শিষ্য বেদকে এমন কঠিন পরীক্ষা দিতে হয় নি। এই রকম ঘটনাও অনেক সময়েই ঘটত। পক্ষপাত বশত গুরুরা কোন কোন শিষ্যকে কষ্ট দিতেন না। গুরুপত্নীর প্রিয়পাত্র হয়েও অনেক শিষ্য নিগ্রহ এড়াতে সক্ষম হত। বেদ দীর্ঘ কাল গুরুগৃহে বলদের মতো ভার বহন করেছিল, এবং ক্ষুধা তৃষ্ণা ও শীত গ্রীষ্মের সমস্ত কষ্ট সহ্য করে গুরুকে সন্তুষ্ট করেছিল।

গুরুগৃহে নানা কষ্ট স্বীকার করে শিষ্যরা যখন গৃহে ফিরত, তখন পরবর্তী জীবনে সে সব কষ্টের কথা তাদের মনে থাকত। নিজেরা গুরু হয়ে কেউ নিজের শিষ্যদেরও এই রকম কষ্ট দিতেন, কেউ বা অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ হতেন। বেদ নিজে তিন জন শিষ্য গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু কাউকে কোন কষ্ট দিতে চাইতেন না।

গুরুজী এইবারে শিষ্যদের কথা একে একে বললেন: উপমন্যুর কোন শিষ্য প্রশিষ্যের কথা জানি নে। কিন্তু বেদের শিষ্য উতঙ্কের কথা মহাভারতের পরবর্তী অধ্যায়েই আছে।

আমি ভেবেছিলাম যে গুরুজী হয়তো এবারে সেই অশ্লীল গল্পটি বলবেন। কিন্তু তা বললেন না। সে বিষয়ে কোন উল্লেখই করলেন না। বললেন: গুরু দক্ষিণা দেবার জন্য উতঙ্ক যে অসাধ্য

সাধন করেছিলেন, তার তুলনা নেই। উতঙ্কের তখন বয়স হয়েছে, নিজের বিচার বুদ্ধি হয়েছে। গুরুর অবর্তমানে তিনি এই বিচার বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। গুরু তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়ে আশীর্বাদ করে তাঁকে স্বগৃহে ফিরবার অনুমতি দিয়েছেন।

উতঙ্ক গুরুদক্ষিণা না দিয়ে যাবেন না, আবার গুরু বেদ কোন দক্ষিণার প্রত্যাশা করেন না। কিন্তু বার বার অনুরোধ করাতে গুরু বললেন, তোমার উপাধ্যায়ানীকে প্রশ্ন কর তাঁর কিছু চাই কিনা।

গুরুপত্নী বললেন, চাই। চার দিন পর আমার পুণ্যক ব্রত, সেই ব্রতে একজোড়া কুণ্ডল পরে আমি ব্রাহ্মণদের পরিবেষণ করতে চাই। রাজা পৌষ্যের ক্ষত্রিয়া রাণীর কানের কুণ্ডল তুমি চেয়ে আন।

উতঙ্ক এই কুণ্ডল আনতে পেরেছিলেন। কিন্তু সে দীর্ঘ কাহিনী। পথে নানা বিঘ্ন হয়েছিল। মহাভারতে তোমরা তা পড়ে নিও।

তাউজী বললেন : আপনি খুব সংক্ষেপে গল্পটি বলুন।

গুরুজী বললেন : রাজা পৌষ্যের নিকট যাবার পথে উতঙ্ক ইন্দ্রের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। তিনি বেদের সখা, তাই সাহায্য করেছিলেন উতঙ্ককে। উতঙ্ক চাইতেই রাণী তাঁর কান থেকে কুণ্ডল দুটি খুলে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন যে তক্ষক ও দুটির প্রার্থী, খুব সাবধানে নিয়ে যেতে হবে।

উতঙ্ক যখন স্নানের জন্য কুণ্ডল দুটি মাটিতে রেখেছিলেন, তখন নগ্ন সন্ন্যাসীর বেশে তক্ষক সেই কুণ্ডল হরণ করেন। উতঙ্ক তাঁকে অনুসরণ করে পাতালে যান। তারপর ইন্দ্রের সাহায্যে তা উদ্ধার করে গুরুপত্নীর হাতে দেন।

তক্ষকের শত্রুতার কথা উতঙ্ক ভুলতে পারেন নি। রাজা জনমেজয়ের কাছে গিয়ে তাঁকে উত্তেজিত করেছিলেন। বলেছিলেন যে এই তক্ষকই তাঁর পিতা পরীক্ষিৎকে দংশন করেছিল, জনমেজয়ের প্রতিশোধ নেওয়া উচিত।

গুরুজী বললেন: মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্বেও উতঙ্কের বৃত্তান্ত আছে। কিন্তু তা কিছু অন্য রকম। সেখানে উতঙ্ক গৌতমের শিষ্য, এবং অহল্যার জন্য কুণ্ডল আনতে গিয়েছিলেন সৌদাসের নিকট। এর আগে একটু কাহিনী আছে। বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে উতঙ্কের কাহিনী বলেছিলেন। প্রবল তপোনিষ্ঠা ও গুরুভক্তির জন্য গৌতম উতঙ্ককে খুব স্নেহ করতেন। একদিন উতঙ্ক এক বোঝা কাঠ এনে যখন আশ্রমে রাখলেন, তখন সেই কাঠের গায়ে একটি সাদা চুল দেখে তিনি কেঁদে আকুল হলেন। চিন্তিত হয়ে গৌতম বললেন, তুমি কাঁদছ কেন?

উতঙ্ক বললেন, আমি যে একশো বছর ধরে আপনার সেবা করে বুড়ো হয়ে গেছি, তা এত দিন জানতে পারি নি। আমার চেয়ে যারা বয়সে অনেক ছোট, তারাও এখান থেকে বিদায় নিয়ে গৃহী হয়েছে।

গৌতম স্বীকার করে বললেন, আমিও তোমার সেবায় এমন সন্তুষ্ট ছিলাম যে এ কথা কোন দিনও চিন্তা করি নি। এবার তোমায় গৃহে ফেরার অনুমতি দিচ্ছি।

উতঙ্ক প্রশ্ন করলেন, আমি আপনাকে গুরুদক্ষিণা কী দেব বলুন।

গৌতম বললেন, তুমি তোমার সেবায় আমাকে সন্তুষ্ট করেছ, তাই তোমার গুরুদক্ষিণা। যদি তুমি ষোল বছরের যুবা হতে, তাহলে তোমাকে কন্যা দান করতাম।

উতঙ্ক যুবা হয়ে গুরুকন্যার পাণি গ্রহণ করলেন। তারপরে সেই কুণ্ডলের গল্প। উতঙ্ক গুরুদক্ষিণা না দিয়ে যাবেন না। তাই অহল্যা সেই কুণ্ডল চাইলেন। রাজা সৌদাস তখন বশিষ্ঠের শাপে রাক্ষস হয়ে আছেন। তাঁরই রাণী মদয়ন্তীর কাছ থেকে কুণ্ডল চেয়ে আনতে হবে। অহল্যা উতঙ্ককে এই কাজ দিয়েছেন জেনে গৌতম দুঃখিত হলেন। বললেন, রাক্ষসের নিকট উতঙ্ককে পাঠানো উচিত হয় নি।

অহল্যা বললেন, আমি সে কথা জানতাম না। কিন্তু তোমার আশীর্বাদে তার কোন বিপদ হবে না।

রুধিরাক্ত দেহ ঘোরদর্শন সৌদাস উতঙ্ককে দেখে বললেন, আপনি উপযুক্ত সময়ে এসেছেন ব্রাহ্মণ, আমি আমার আহার অন্বেষণ করছিলাম।

উতঙ্ক এই কথায় ভয় পেলেন না, বললেন, আমার গুরুপত্নীর জন্য আমি আপনার রাণীর কুণ্ডল ভিক্ষা করতে এসেছি। সেটি পেলেই আমি তা পৌঁছে দিয়েই আপনার কাছে ফিরে আসব।

রাজা সম্মত হয়ে বললেন, রাণীর কাছে থেকে কুণ্ডল নিয়ে যান।

উতঙ্ক কুণ্ডল পেয়ে রাজার কাছে যখন ফিরে এলেন, তখন রাজা বললেন, আপনি আর ফিরে আসবেন না। তাহলে আপনাকে মরতে হবে।

গুরুজী বললেন : এর পরের কাহিনী ঠিক আগের মতো। ক্ষুধার্ত হয়ে উতঙ্ক একটি বেল গাছে বেল পাড়তে উঠেছিলেন, এই সুযোগে এক সর্প সেই কুণ্ডল হরণ করল। তারপর মাটির নিচে নাগলোক। ইন্দ্রের সাহায্যে উতঙ্ক সেই কুণ্ডল উদ্ধার করলেন।

অল্পক্ষণ বিরতির পর গুরুজী আবার বললেন : কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে কৃষ্ণের সঙ্গে উতঙ্কের সাক্ষাৎ হয়েছিল মরু প্রদেশে। উতঙ্ক কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোমার চেষ্টায় কুরুপাণ্ডবে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছে তো ?

কৃষ্ণ বললেন, না, আমার সন্ধির চেষ্টা সফল হয় নি।

তারপর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিবরণ দিলেন।

উতঙ্ক ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, কৃষ্ণ, তোমার মিথ্যাচারের জন্যই কুরুকুল ধ্বংস হয়েছে, আমি তোমাকে শাপ দেব।

কৃষ্ণ তাঁকে বিশ্বরূপ দেখিয়ে রক্ষা পেলেন। বললেন, আপনি বর নিন।

উতঙ্ক বললেন, এই মরুভূমিতে চাইলেই জল পেতে পারি, এই বর দাও।

কৃষ্ণ বলে গেলেন, জলের প্রয়োজন হলেই আমাকে স্মরণ করবেন।

তারপর একদিন উতঙ্ক তৃষ্ণার্ত হয়ে কৃষ্ণকে স্মরণ করলেন। কিন্তু কৃষ্ণের বদলে এল এক দিগম্বর চণ্ডাল। হাতে খড়্গ ও ধনুর্বাণ, সঙ্গে একপাল কুকুর। চণ্ডাল বলল, উতঙ্ক, আমার অধোদেশ থেকে যে জল পড়ছে তুমি তাই পান কর।

উতঙ্ক এই ঘৃণ্য প্রস্তাব শুনে তাকে তিরস্কার করলেন। সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডাল অন্তর্হিত হল, আর কৃষ্ণ হলেন আবির্ভূত। বললেন, আপনাকে অমৃত দেবার জন্য আমি ইন্দ্রকে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু মানুষকে অমৃত দেবেন না বলে ইন্দ্র আপনাকে ছলনা করে পালালেন। তবে আমি আপনাকে বর দিচ্ছি যে আপনার তৃষ্ণা হলেই মেঘ থেকে এই মরুভূমিতে বারিবর্ষণ হবে।

আজও সেই উতঙ্ক মেঘ থেকে মরুভূমিতে বারিবর্ষণ হয়।

এই পর্যন্ত বলে গুরুজী একটু থামলেন। তারপর তাউজীর দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ এইবারে কোন্ ঋষির কথা বলতে হবে ?

তাউজী বললেন ঃ আরুণির নাম উদ্দালক হয়েছিল। তাঁর কথা বলেন নি।

বলি নি বুঝি !

বলে গুরুজী খানিক ক্ষণ চিন্তা করলেন।

আমার মনে পড়ল উদ্দালক ও শ্বেতকেতুর গল্প। কিন্তু গুরুজী তার পরিবর্তে অন্য গল্প বললেন, অষ্টাবক্রের গল্প। বললেন ঃ উদ্দালক বিখ্যাত হয়েছেন তাঁর দৌহিত্র অষ্টাবক্রের জন্য। তাঁর পুত্র শ্বেতকেতু ও অষ্টাবক্র সমবয়সী ছিলেন। ত্রেতা যুগে তাঁরা ছিলেন শ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ। উদ্দালক তাঁর কন্যা সুজাতার বিবাহ দিয়েছিলেন শিষ্য কহোড়ের সঙ্গে। অষ্টাবক্র যখন মাতা সুজাতার

গর্ভে, তখনই তিনি সর্ব শাস্ত্র অধ্যয়ন করে ফেলেছিলেন এবং একদিন পিতা কহোড়কে বলেছিলেন যে আপনার বেদ পাঠ ঠিক হচ্ছে না। কহোড় ক্রুদ্ধ হয়ে গর্ভস্থ শিশুকে অভিশাপ দেন। সেই অভিশাপে অষ্টাবক্র আট স্থানে বক্র দেহ নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন।

কিন্তু জন্মের পরে তিনি আর পিতাকে দেখতে পান নি। তার আগেই সুজাতা একদিন স্বামীকে বলেছিলেন যে তিনি নিঃস্ব, সন্তান পালনের জন্য তাঁর অর্থের প্রয়োজন। অর্থ সংগ্রহের জন্য কহোড় জনক রাজার কাছে গিয়েছিলেন। সেখানে বরুণের পুত্র বন্দী তাঁকে তর্কে পরাস্ত করে জলে নিমজ্জিত করেন।

সুজাতা ও উদ্দালক তাঁদের আশ্রমে এই সংবাদ পেয়েছিলেন। অষ্টাবক্রের তখনও জন্ম হয় নি, উদ্দালক কন্যাকে বললেন, পুত্রকে এ সংবাদ দিও না।

এই ঘটনার কিছু পরেই অষ্টাবক্রের জন্ম হল। উদ্দালককে পিতা ও শ্বেতকেতুকে ভ্রাতা বলে তিনি জানলেন।

কেন জানি না ঠিক এই সময় আমার উদ্দালকের পত্নীর কথা মনে পড়ল। তিনি কি এই সময় আশ্রমে ছিলেন না? শ্বেতকেতু যদি অষ্টাবক্রের সমবয়সী হন তো তাঁর মাতারও থাকবার কথা। আশ্রমে যখন তাঁকে দেখা যাচ্ছে না, তখন মনে করতে হয় যে শ্বেতকেতুর জন্মের পরেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। কিংবা সেই ব্রাহ্মণ যিনি শ্বেতকেতুর সামনেই তাঁর মাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনিই তাঁকে আর ফিরিয়ে দেন নি।

এই গল্পটি আমি মহাভারতে ভাল করে পড়েছিলাম। তাতে আমার মনে হয়েছিল যে সুজাতা পুত্র অষ্টাবক্রকে নিয়ে পিতা উদ্দালকের আশ্রয়েই ছিলেন। শ্বেতকেতু তাঁর শৈশবে মাকে দেখেছেন। এক ব্রাহ্মণ যখন বলপূর্বক তাঁর মায়ের হাত ধরে টেনে নিয়ে যান, তখন শ্বেতকেতু এই সামাজিক প্রশ্রয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। তখন কি অষ্টাবক্র এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন নি? না,

যে নারীর কথা বলা হয়েছে, তিনি উদ্দালকের স্ত্রী নন, তাঁর কন্যা সুজাতা! কিন্তু গুরুজীকে এ সব প্রশ্ন করার দুঃসাহস আমার হল না।

এই কাহিনী পড়বার সময় আমার আর একটি সন্দেহ উপস্থিত হয়েছিল। শ্বেতকেতু বোধহয় উদ্দালকের ক্ষেত্রজ পুত্র, তাঁর জনক একজন শিষ্য। সে যুগে এই ক্ষেত্রজ পুত্রের বহুল প্রচলন ছিল। স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র হলেই সে যোগ্য বংশধর, পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধতর্পণের অধিকারী। রাজারাও পুত্রলাভের জন্য ঋষি ও ব্রাহ্মণদের আহ্বান করতেন। শ্বেতকেতু যে সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন করেন, তাতে তিনি ক্ষেত্রজ পুত্র সমর্থন করেছেন। অনেকের ধারণা যে তিনি নিজে ক্ষেত্রজ পুত্র ছিলেন বলেই এই মত প্রচার করেছিলেন।

সকাল বেলায় বাগানে কাজ করতে করতে পাধ্যের সঙ্গে আমার এই আলোচনা হয়েছিল। তিনি আরও একটি কথা বলেছিলেন। উতঙ্কের গল্পটি শ্বেতকেতুর গল্পে সমর্থিত হয়েছে। ধর্ম রক্ষার জন্য সে যুগে গুরুপত্নীর সঙ্গে শিষ্যদের মিলনে কোন সামাজিক বাধা ছিল না। গুরুপত্নীকে মাতৃসমা বলা হয়েছে পরবর্তী কালে। সামান্য অসংযমের জন্যও কঠিন প্রায়শ্চিত্তের বিধান করা হয়েছে।

গুরুজী বলছিলেনঃ বারো বৎসর বয়সে অষ্টাবক্র প্রথম জানলেন যে উদ্দালক তাঁর পিতা নন, তিনি মাতামহ। শ্বেতকেতু তাঁকে নিজের পিতার কোলে বসে থাকতে দেখে বললেন যে উনি তোমার পিতা নন। তারপর অষ্টাবক্র তাঁর মায়ের কাছে সব কথা শুনলেন। শুনেই বেরিয়ে পড়লেন জনক রাজার সাক্ষাতের জন্য। শ্বেতকেতুও সঙ্গে চললেন, দুজনেই সমবয়সী বালক।

জনক রাজা তখন যজ্ঞ করছিলেন। যজ্ঞসভার দ্বারে দ্বারপাল তাঁদের বাধা দিল, বলল, বন্দীর আজ্ঞায় বালকদের এই সভায় প্রবেশের অধিকার নেই।

অষ্টাবক্র বললেন, আমরা বেদজ্ঞ ব্রতচারী ও জিতেন্দ্রিয়, আমরা জ্ঞানবৃদ্ধ।

দ্বারপাল তাঁদের প্রশ্ন করে পরীক্ষা করলেন। তারপর অষ্টাবক্র জনক রাজাকে বললেন, মহারাজ, শুনেছি পণ্ডিতদের তর্কে পরাস্ত করে বন্দী তাঁদের জলে ডোবান। আমরা এসেছি তাঁকে পরাস্ত করে জলে ডোবাতে। কোথায় তিনি?

জনক বললেন, বন্দীকে জান না বলেই তুমি এই কথা বলছ। এমনি করে অনেক পণ্ডিত এসে পরাস্ত হয়েছেন।

অষ্টাবক্র বললেন, বন্দীও আমার মতো প্রতিপক্ষ পান নি, তাই বিচার সভায় এখনো সিংহের মতো আস্ফালন করেন। আমার সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হলেই তিনি চাকাভাঙ্গা গাড়ির মতো পথে পড়ে গড়াগড়ি যাবেন।

এই কথা শুনে জনক নিজে অষ্টাবক্রকে কয়েকটি দুরূহ প্রশ্ন করলেন। তার সদুত্তর পেয়ে বললেন, তুমি বয়সে বালক হলেও জ্ঞানে স্থবির। আমি তোমাকে দ্বার ছেড়ে দিচ্ছি।

তারপর অষ্টাবক্র সভায় প্রবেশ করে বন্দীর সঙ্গে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। অনেক প্রশ্ন হল, অনেক উত্তর ও প্রত্যুত্তর। একসময় বন্দী নীরব হয়ে মাথা নত করতেই সমবেত ব্রাহ্মণেরা অষ্টাবক্রের জয়-ঘোষণা করলেন। অষ্টাবক্র বললেন, এই বন্দী সবাইকে জলে ডুবিয়েছেন, এবারে এঁকে জলে ডোবান।

বন্দী বললেন, আমার পিতা বরুণও এক যজ্ঞ করছেন। ব্রাহ্মণদের আমি সেই যজ্ঞ দেখতে পাঠিয়েছি। তাঁরা এবারে ফিরে আসছেন।

বলে সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে বরুণের নিকট ফিরে গেলেন। আর অন্যান্য ব্রাহ্মণদের সঙ্গে কহোড় ফিরে এসে পুত্রকে আশীর্বাদ করলেন। তারপর তিনজনে উদ্দালকের আশ্রমে ফিরলেন। কহোড় পুত্রকে বললেন, এবারে তুমি এই নদীতে প্রবেশ কর।

নদীতে স্নান করেই অষ্টাবক্রের অঙ্গ সমান হয়ে গেল। আর নদীর নাম হল সমঙ্গা।

গুরুজী একটু ভেবে বললেন ঃ অষ্টাবক্রের পরীক্ষা নামে আর একটি কাহিনী আছে। বদান্য ঋষির কন্যা সুপ্রভাকে দেখে অষ্টাবক্র মুগ্ধ হয়েছিলেন, এবং কন্যার পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন। বদান্য বললেন, বেশ কথা। আগে তুমি হিমালয়ে কুবেরালয় ও কৈলাসে মহাদেবের আবাস দেখে আরও উত্তরে রমণীয় বনে যাও। সেখানে যে বৃদ্ধা তপস্বিনী আছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করে ফিরে এস। তখন তোমাকে কন্যাদান করব।

অষ্টাবক্র তাই করলেন। কৈলাসে হরপার্বতীর পূজা করলেন, এক দৈব বৎসর কাটালেন কুবেরের সঙ্গে।

তাউজী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এক দৈব বৎসরের পরিমাণ কত ?

গুরুজী হেসে বললেন ঃ আমাদের তিনশো ষাট বৎসর। তারপর অষ্টাবক্র মন্দর ও সুমেরু পর্বত অতিক্রম করে রমণীয় বনে উপস্থিত হলেন। তার ভিতর একটি সুন্দর সোনার ভবন। সাতজন রূপবতী কন্যা এসে তাঁকে এক বৃদ্ধার নিকট নিয়ে গেলেন। তাঁর শুভ্র বেশ, অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে তিনি পর্যঙ্কে বসে আছেন। এই বৃদ্ধার সঙ্গে অষ্টাবক্র ছুটি রাত কাটিয়েছিলেন। প্রথম রাতে তাঁরা পৃথক শয্যায় শুয়েছিলেন, কিন্তু মধ্য রাতে শীতে কাঁপতে কাঁপতে বৃদ্ধা অষ্টাবক্রের কাছে চলে আসেন। বৃদ্ধার আলিঙ্গনে ঋষি কাঠের প্রাচীরের মতো নির্বিকার হয়ে রইলেন। তুঃখিত হয়ে বৃদ্ধা বললেন, একি !

ভোগে অনভিজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় ঋষি বৃদ্ধাকে ধর্মের কথা শোনালেন।

পরদিন বৃদ্ধা অষ্টাবক্রের সারা দেহে তেল মালিশ করলেন, অমৃতের মতো অন্ন খাওয়ালেন। তারপর রাতে শয্যায় এসে ঋষিকে বিবাহের প্রস্তাব করলেন। অষ্টাবক্র বলেছিলেন যে

পরদারে তাঁর আসক্তি নেই। তার উত্তরে বৃদ্ধা বলেছিলেন যে তিনি কারও পত্নী নন, তিনি স্বতন্ত্রা। অষ্টাবক্র এ কথা মানলেন না, বললেন, নারীর স্বাতন্ত্র্য নেই কোন কালে। কুমারী অবস্থায় সে পিতার, যৌবনে পতির ও বার্ধক্যে পুত্রের রক্ষণাধীন।

বৃদ্ধা বললেন, আমি কন্যা, আমাকে তুমি প্রত্যাখ্যান ক'রোনা।

বলেই এক পরম রূপবতী কন্যায় রূপান্তরিত হলেন। অষ্টাবক্র আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন যে বদান্য ঋষি নিশ্চয়ই তাঁকে পরীক্ষার জন্য এইখানে পাঠিয়েছেন। তিনি আরও সাবধান হলেন।

সেই মায়াবিনী নারী তখন নিজের পরিচয় দিলেন, আমি উত্তর দিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। মহর্ষি বদান্যকে ব'লো যে পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হয়েছ। কিন্তু জেনে রাখ যে নারী চপলা, স্থবিরারও কামনা আছে। এবারে তুমি গৃহে ফিরে তোমার বাঞ্ছিতাকে বিবাহ কর।

অষ্টাবক্র দেশে ফিরে এলেন। বদান্য ঋষি সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে সুখী হলেন। নিজের কন্যা সুপ্রভাকে অষ্টাবক্রের হাতে সম্প্রদান করলেন।

এই পর্যন্ত বলে গুরুজী তাউজীর মুখের দিকে তাকালেন। মনে হল, এর পরে কী বলতে হবে সেই কথা তিনি নিঃশব্দে জিজ্ঞাসা করছেন।

তাউজী বললেন: এখনও অনেক ঋষির কথা বাকি আছে। মতঙ্গ শৌনক।

গুরুজী হাসলেন।

তাউজী বললেন: হাসলেন যে!

গুরুজী বললেন: দুজনে প্রায় সমবয়সী। মতঙ্গ রামায়ণের ঋষি, ত্রেতাযুগের মানুষ। আর শৌনক দ্বাপরের শেষের ঋষি, কলির প্রথমে তিনি বিদ্যমান।

গুরুজী তারপরে দুজনের কথাই বললেন: কিষ্কিন্ধ্যায় পম্পা নদীর তীরে একটি ছোট পাহাড়ের উপর মতঙ্গ ঋষি তপস্যা

করতেন। সেই পাহাড়ের নাম হয়েছে মতঙ্গ পর্বত। এই মতঙ্গ বনে শবরীও বাস করতেন। রাম যখন সীতার অন্বেষণে এখানে আসেন, তখন সুগ্রাব ও হনুমানরা এইখানে বাস করছিলেন। বালির এখানে আসবার উপায় ছিল না। তার একটু কাহিনী আছে। বালি যখন দুন্দুভি নামে এক অসুরকে বধ করে তখন তার রক্ত মতঙ্গের আশ্রমে এসে পড়ে। ঋষি তাই শাপ দিয়েছিলেন যে বালি এখানে এলেই মরবে। তাই বালি যখন সুগ্রীবকে শাস্তি দেবার জন্য বদ্ধপরিকর, তখন সুগ্রীব এসে এই পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

পক্ষান্তরে শৌনককে আমরা পাই মহাভারতে। তাঁর আশ্রম ছিল নৈমিষারণ্যে। প্রতি বৎসর তিনি যজ্ঞ করতেন। তাঁর দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞে বেদব্যাসের শিষ্য সূত জাতীয় পণ্ডিত রোমহর্ষণ সমস্ত পুরাণ ও মহাভারত কথা সমবেত ঋষি ও ব্রাহ্মণদের শুনিয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গেই গুরুজী দীর্ঘায়ু বক ঋষির কথা শোনালেন, বললেন: সত্য যুগের অনেক ঋষিকে আমরা ত্রেতা ও দ্বাপরে দেখতে পাই। মহাভারতে মার্কণ্ডেয় ঋষি বকের কথা বলেছিলেন, ইন্দ্র একবার পূর্ব সমুদ্রের নিকটে বক ঋষির আশ্রমে গিয়ে বলেছিলেন, আপনার লক্ষ বৎসর বয়স হয়েছে, আপনি চিরজীবীদের সুখ দুঃখের কথা আমাকে বলুন।

মার্কণ্ডেয় নিজে স্বল্পায়ু হয়ে জন্মেছিলেন। তাঁর পিতার নাম মৃকণ্ডু। পুত্রের জন্মের পরে মৃকণ্ডু জানতে পারেন যে এই শিশু মাত্র চার বছর বাঁচবে। তাই তিনি অল্প বয়সেই তাঁর উপনয়ন দিয়ে ঋষিদের প্রণাম করতে বলেন। সপ্তর্ষিরা তাঁকে 'চিরায়ু হও' বলে আশীর্বাদ করবার পরে যখন সব জানতে পারলেন, তখন তাঁকে তাঁরা ব্রহ্মার কাছে নিয়ে গেলেন। ব্রহ্মার বরে মার্কণ্ডেয় দীর্ঘ জীবন লাভ করেন।

নৃসিংহ পুরাণে ঘটনাটি একটু অন্য রকম। মার্কণ্ডেয় পিতা-মাতাকে তাঁর স্বল্পায়ুর জন্য শোক করতে দেখে তাঁদের শান্ত হতে বলেন। তারপরে বনে গিয়ে বিষ্ণু মূর্তি স্থাপন করে কঠোর তপস্যা করেন। তপোবলেই তিনি মৃত্যুকে জয় করেন।

মার্কণ্ডেয় ঋষির স্ত্রীর নাম ধূমাবতী, বেদশিরা তাঁদের পুত্র।

গুরুজী বললেন: দীর্ঘায়ুর জন্য খ্যাতি ছিল লোমশ মুনির। পৃথিবীর প্রান্ত সীমা ধরে অনেকবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। পৃথিবীর সমস্ত তীর্থ তাঁর পরিচিত ছিল বলে ব্যাসদেব তাঁকে বনবাসী পাণ্ডবদের সঙ্গী হবার জন্য বলেছিলেন। লোমশ মুনি পাণ্ডবদের অনেক তীর্থ দর্শন করিয়ে সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন।

শৈশবে শোনা লোমশ মুনির গল্প আমার মনে পড়ল। বিশ্বকর্মা একবার ইন্দ্রের জন্য অমরাবতীতে নূতন প্রাসাদ নির্মাণ করছিলেন। কিন্তু ইন্দ্রের কিছুতেই পছন্দ হচ্ছিল না। শেষে বিশ্বকর্মা ইন্দ্রকে লোমশ মুনির নিকট নিয়ে আসেন। লোমশ মুনির দেহ লোমে ভর্তি, কিন্তু মাথায় চুল কম। ইন্দ্র তার কারণ জিজ্ঞাসা করতে মুনি বললেন যে এক একজন ইন্দ্রের পতন হলে তাঁর এক একটি চুল পড়ে। যতগুলি চুল তাঁর কম, ততগুলি ইন্দ্রের পতন তিনি দেখেছেন। এ কথা শুনে ইন্দ্রের চৈতন্য হল। যাঁর জীবন এমন দীর্ঘ, তিনি আছেন পর্ণকুটীরের আশ্রমে। বিশ্বকর্মাকে আর তিনি কোন কথা বললেন না।

গুরুজী বললেন: এক এক কল্পে একটি করে লোম পড়ত বলে এই ঋষির নাম হয়েছিল লোমশ মুনি।

তাউজী তাঁর খাতার পাতা ওল্টাতে লাগলেন। আর আমরা তাকালাম গুরুজীর দিকে। দু একজন ঋষির নাম যে মনে পড়ছে না তা নয়। কিন্তু তাঁদের কোন কাহিনীর কথা মনে পড়ছে না। বামদেব অরিষ্টনেমা বসুমনা। চেষ্টা করলে আরও হয়তো কত

নাম মনে পড়বে। কিন্তু আমরা তো নামের অভিধান রচনা করছি না যে সব নাম আমাদের জানত হবে।

ওধার থেকে দণ্ডপাণি বললেন : ঋষির কথা শেষ করবার আগে দধীচির কাহিনীটি শুধু বলুন।

গুরুজী বললেন : ঠিক, দধীচির কথা আমরা বলি নি। তাঁর ত্যাগের কথা দিয়েই ঋষির কথা শেষ হোক। ত্যাগই তো জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

গুরুজী একটু থেমে বললেন : ঋগ্বেদে আমরা দধীচির উল্লেখ পাই। তাঁর পিতার নাম অথর্বা ঋষি, মায়ের নাম শান্তি। তিনি কঠোর তপস্যায় সারা ক্ষণ নিমগ্ন থাকতেন। দক্ষ যখন শিবহীন যজ্ঞ করবার আয়োজন করেন তখন দধীচি তাঁকে বাধা দিয়েছিলেন। তিনি নিজে শিবভক্ত, এবং শিবহীন যজ্ঞ সমর্থন করতে পারেন নি। প্রতিবাদ স্বরূপ সে যজ্ঞে তিনি যোগদান করেন নি।

দধীচির সঙ্গে ইন্দ্র অনেক শত্রুতা করেছিলেন। তাঁর তপোভঙ্গ করেছেন, অলম্বুষা নামে এক অপ্সরাকে পাঠিয়ে তাঁর তপস্যায় বিঘ্ন ঘটিয়েছেন। ইন্দ্র এই রকমই করতেন। কোন ঋষিকে কঠোর তপস্যা করতে দেখলেই নানা ভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করতেন। তাঁর ধারণা যে এই ঋষিরা তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করে ইন্দ্রত্ব লাভ করবেন।

তারপর পট পরিবর্তিত হল। ভিক্ষার্থী হয়ে ইন্দ্রকে আসতে হল দধীচির কাছে। বৃত্রাসুরের আক্রমণে স্বর্গ তখন নিপীড়িত। নিরাশ্রয় দেবতারা পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। তাঁরা জানতে পারলেন যে দধীচির অস্থিতে নির্মিত অস্ত্রে বৃত্রবধ হবে। দেবরাজ ইন্দ্র এসে ঋষির কাছে হাত পাতলেন।

ইন্দ্রের উৎপাতের কথা দধীচির মনে ছিল, তাঁর গভীর বিরাগের কথা। কিন্তু এখন তার প্রতিশোধ নেওয়া চলে না, এখন সমস্ত দেবতাদের কল্যাণ তাঁর হাতে। ক্ষমা ও ত্যাগ—এই তো

ব্রাহ্মণের ধর্ম। ইন্দ্রকে দধীচি ক্ষমা করলেন। আর প্রাণ বিসর্জন দিলেন দেবতাদের কল্যাণের জন্য।

বৃত্রাসুর বধ হল দধীচির অস্থিনির্মিত বজ্রে। এখনও ইন্দ্র তাঁর বজ্র দিয়ে স্বর্গরাজ্য রক্ষা করছেন।

সাতাশ

ঋষির কথা এইখানেই শেষ হয়ে গেল। উপাসনার মন্দির ত্যাগ করবার আগে গুরুজী আমাদের বলেছিলেনঃ অনেক ঋষির কথাই বাকি রইল। কারও যদি কিছু জানবার থাকে আমার কাছে জেনে নিও।

তাউজী বলেছিলেনঃ সেই ভাল।

রাতে আমি যখন শুতে এলাম, তখন কৌতুকের চিহ্ন দেখলাম চেনেলুর মুখে। সে বোধহয় কিছু বলবার জন্য ছটফট করছিল। প্রশ্ন করলামঃ কিছু বলবে নাকি?

সহাস্যে চেনেলু বললঃ ফুল কোথায়?

কিসের ফুল?

কেন, মিসেস খুরানা তোমায় ফুল দেয় নি?

আমি তার কথা শুনে হাসলাম।

চেনেলু বললঃ বিকেল বেলায় বর্গিটার হাতে দিয়েছিল। ফুলের মর্ম সে কী বুঝবে! টান মেরে ফেলে দিয়েছিল দূরে। তারপরে শুনলাম—

ফুলের উপর পাধ্যের বিরাগের কথা আমি জানি। কিন্তু সে বিরাগ যে এমন কঠিন, তা জানতাম না। জিজ্ঞাসা করলামঃ কার কাছে শুনলে এ কথা? তুমি তো তখন ঘুমচ্ছিলে।

চেনেলু বললঃ সব খবর যে রাখে তারই কাছে শুনেছি। বর্গিটার মাথাতেও বোধহয় ছিট আছে। দুবারে দু রকম কথা বলেছিল তাউজীকে। একবার বলেছিল সে বিবাহিত, আর একবার নাকি বলেছে যে তার বউ নেই।

বললাম ঃ দুটো কথাই ঠিক হতে পারে।

কী রকম ?

বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু এখন আর বউ নেই। হয় মারা গেছেন, কিংবা—

সহসা আমার অন্য কথা মনে পড়ে গেল। বাগানে কাজ করতে করতে পাধ্যে আমাকে বলেছিলেন যে ফুল তাঁর ভাল লাগে না। বাগানে ভাল ফুল দেখলেই চোরে চুরি করে নিয়ে যায়। শুধু পূজোর জন্যেই নেয় না, নেয় ফুলদানি সাজাবার জন্যেও। পাধ্যের বাগানের ফুল কি কেউ ফুলদানি সাজাতে নিয়ে গেছে !

কথাটা আমি সম্পূর্ণ করলাম না দেখে চেনেলু বলল ঃ কিংবা কী ?

গভীর ভাবে বললাম ঃ উদ্দালক ঋষির স্ত্রীকে যেমন এক ব্রাহ্মণ এসে টেনে নিয়ে গেছে, তেমনি কোন বিপর্যয়।

চেনেলু হেসে উঠল। কিন্তু আমি হাসতে পারলাম না। গভীর বেদনায় আমার মন আচ্ছন্ন হল। ঋষিরা অনেক সংহিতা রচনা করে সমাজের উন্নতি করবার চেষ্টা করে গেছেন। কিন্তু আমাদের সমাজের কি আজও উন্নতি হয়েছে ! কোন দিন কি হবে ! কে জানে !

বাহিরে রাত্রির তপস্যা আরও গভীর হল।

॥ **ঋষির কথা সমাপ্ত** ॥



শাশ্বত ভারত



শ্রীসুবোধবসু